সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নবম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩২।

সবুজ পত্র

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ।

——:০:——

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উদ্দেশ্যে সবুজ পত্র আবার বার করতে উদ্যত হয়েছি, তাহলে সে প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারব না।

সবুজ পত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনও এ প্রশ্ন ওঠে, এবং তার উত্তরে সেকালে বলি যে,—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, তবে কি উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য, কি অভাব পূরণ করবার জন্য, এত কাগজ থাকতে আবার একটি নতুন কাগজ বার করছি, তাহলেও আমাদের নিরুত্তর থাকতে হবে"।

কেন যে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, সে বিষয়ে সেকালে অনেক কারণ দেখিয়েছিলুম, সে সব কথার পুনরুল্লেখ করা অসঙ্গত; কেননা রসিকতার পুনরাবৃত্তি করা চলেনা, বিশেষত সে রসিকতা যদি স্বকৃত হয়।

সবুজপত্রে পূর্ব্বে যে-সকল কথা বলা হয়েছে সে-সকল কথা আমি রসিকতা বলে মেনে নিচ্ছি এই জন্য যে, বহু গুরুগম্ভীর ক্রিটিকের মতে সে সব কথার ভিতর কোনরূপ গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য

ছিল না। আমাদের কাগজের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সম্ভবত মিথ্যা নয়। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছিলুম যে "দুখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণচিত হয়"। ও-জাতীয় প্রবীণচিত্তত্তা যে অতীতে সবুজ পত্রের অন্তরে ছিল না, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই, এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও থাক্‌বে না। সুতরাং শ্রীমান ধূর্জ্জটীপ্রসাদকে অভয় দিতে পারি যে, সবুজ পত্র কোনরূপ propagandaর মুখপত্র হবে না। আমাদের হাতে মর্ত্ত্যকে রাতারাতি স্বর্গ করে তোল্‌বার এমন কোনও কাটাছাঁটা programme নেই, যা আমরা বে-পরোয়া হয়ে প্রচার কর্‌তে পারি। আর যদি থাক্‌ত তাহলেও আমরা সে propaganda চালাতে তাদৃশ উৎসাহী হতুম না। মানুষকে কথার তাড়নায় অতিমানুষ বানাতে গিয়ে যে শুধু তাদের অমানুষ করে ফেলা হয়, এর প্রমাণ ইতিহাসে দেদার পাওয়া যায়। Propaganda যে advertisement-এরই একটা বিশেষ ধারা, এ জ্ঞান আমাদের আছে। সবুজ পত্র যে কতটা বিজ্ঞাপনগত প্রাণ, সে সত্য সাহিত্যসমাজে অবিদিত নয়।

মানুষের মতিগতি অনেক পরিমাণে বাহ্য ঘটনার অধীন। অবস্থার ফেরে সে মতি সে গতি মোড় ফেরে। লোকে যাকে "আমি" বলে, সে বস্তু কোনরূপ নির্ব্বিকার পদার্থ নয়। তার অবিচলিত স্থৈর্য্যের উপর নির্ভর করে কোনও কাজে হাত দেওয়া নিরাপদ নয়। বাঁধা প্রোগ্রাম মানুষে তৈরী করে পরের জন্য, নিজের জন্য নয়। তার কারণ প্রত্যেকে সহজেই অপরকে অনাত্ম পদার্থ বলে ধরে নেয়, এবং জড় পদার্থ হিসেবেই গড়তে ও চালাতে চায়। অধিকাংশ লোকও অবশ্য পরের দ্বারা এই ভাবেই চালিত হতে ভালবাসে। তাই তাদের

চালকেরও কখনো অভাব ঘটে না। ভাব্বার চিন্তবার বরাত পরের উপর দেওয়াটা অধিকাংশ লোকের পক্ষে বিশেষ আরামজনক। এ সব তর্কের কথা ছেড়ে দিয়েও নির্ভয়ে বলা যায় যে, যিনি একটি মাসিক পত্রিকা চালাতে চান, তিনি এ কথা কখনই জোর করে বলতে পারেন না যে, তিনি এ বিষয়ে লিখবেন আর ও বিষয়ে লিখবেন না। একটা টাট্কা উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা যখন সবুজ পত্র প্রথম প্রকাশ করি, তখন ও পত্র ভাষার তর্কে ভরে দেবার আমাদের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না। কারণ সেকালে আমাদের ধারণা ছিল যে, ভাষা যে লিখতে পারে সে লেখে, আর যে পারেনা সে তা নিয়ে তর্ক করে। কিন্তু ফলে কি দাঁড়িয়েছে? বছরের পর বছর ধরে সবুজ পত্রকে ভাষা সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডায় অনবরত যোগ দিতে হয়েছে। এবার কিন্তু এ কথা ভরসা করে বলতে পারি যে, ও তর্ক সবুজ পত্রে আর স্থান পাবে না, কারণ সাধুভাষা-বনাম-চল্‌তি বাঙলার মামলায় সবুজ পত্রের জিত হয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ একটি উচ্চ আদালতের রায় নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপাল পণ্ডিতপ্রবর শ্রী মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, মহাশয় তাঁর সঙ্কলিত "সাহিত্য প্রবেশ" নামক স্কুলপাঠ্য পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছেন যে,—

"লিখিত ও কথিত বাঙলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলি যেন দুই ভিন্ন যুগের বলিয়া মনে হয়। ইহার অর্থ এই যে, লিখিত ভাষার ক্রিয়ার বিভক্তিগুলি এখন এত অপ্রচলিত হইয়াছে যে, সে ভাষায় কথা কহিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কোন জীবিত ভাষার এরূপ বৈষম্য থাকিতে পারে না। সেইজন্য অনেক প্রতিভাশালী লেখক এই অসামঞ্জস্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রবীন্দ্র নাথ স্বয়ং

এই পথের প্রদর্শক। তাহার পর প্রমথ চৌধুরী বীরবলী ভাষায় সাহিত্য মধ্যে চলিত ক্রিয়ার রূপ ব্যবহার করিয়া এক নূতন আদর্শের বাঙলা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনায় ভাষার মধ্যে আর একটি বৈষম্য আসিয়া পড়িয়াছে। প্রচলিত ক্রিয়াপদের সহিত সংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করাতে তাঁহার রচনা কিরূপ বেথাপ বলিয়া মনে হয়। বিজলী প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকার ভাষায় এই বৈষম্য দূর হইয়াছে। এই ভাষার নমুনা স্বরূপ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি রচনা উদ্ধৃত করা গেল। হয়ত কালে এইরূপ ভাষাই বাঙলা সাহিত্যে স্থান পাইবে।"

পণ্ডিত মশায় বীরবলী ভাষার যে বৈষম্য লক্ষ্য করেছেন, সে দোষকে পণ্ডিতী ভাষায় গুরু-চণ্ডালী দোষ বলা হয়। এ দোষ যে পাণ্ডিত্যের কাছে কত দূর অসহ্য, তা উক্ত দোষের নামকরণেই বোঝা যায়। তদ্ভব ক্রিয়াপদের সঙ্গে তৎসম বিশেষ্য বিশেষণ যোগ করলে রচনা যে কতদূর বিষম ও বিকট হয়, তার একটি জবর উদাহরণ দিচ্ছি।

"কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে, ধরা তিতে নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কন হানে, অধীর রুধির বাণে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে॥"

গুরু-চণ্ডালী দোষের এর চাইতে বিষম উদাহরণ আমার আর জানা নেই। এই কটি শ্রুতিকটু ছত্র যে কোনও শব্দালঙ্কারসিদ্ধ পণ্ডিত মশায়ের কলম থেকে ভুলেও বেরত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। যে দোষ থেকে স্বয়ং ভারতচন্দ্রের রচনা মুক্ত নয়, সে দোষ থেকে আমাদের লেখা যে মুক্ত হবে, এ দুরাশা আমরা কখনো

মনে পোষণ করিনি। এখন শুনছি যে, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকার ভাষা, উক্ত সমাসের সন্ধি বিচ্ছেদ করে, সমতা প্রাপ্ত হয়েছে—অর্থাৎ গুরু-চণ্ডালীর গুরুত্ব পরিহার করে তার অবশিষ্ট গুণে গুণান্বিত হয়েছে। এ মত সম্পূর্ণ সত্য কিনা বলতে পারিনে। যদি হয়, তাহলে এ কথা শুনে আর কেউ না হোক্, বীরবল মহা আনন্দিত হবেন। কারণ বিজলী প্রভৃতি পত্রিকার ভিতর বীরবলেরও হাত যথেষ্ট দেখা দিয়েছে।

সে যাই হোক্, অধ্যাপক মহাশয়ের শেষ বাক্যের নীচে আমিও নিঃসঙ্কোচে সই করতে পারি, শুধু তার একটি পদ বাদ দিয়ে। মুরলী বাবু বলেছেন যে,—

"হয়ত কালে এইরূপ ভাষাই বাঙলা সাহিত্যে স্থান পাইবে"। হয়ত কেন?—নিশ্চয়ই স্থান পাবে। স্কুলবুক নামক উচ্চ সাহিত্যে যখন সে ভাষা স্থান পেয়েছে, তখন বাজে সাহিত্যে যে পাবে, এ ত ধরা কথা। এই কারণেই ভরসা করে বলতে পারি যে, ভাষার তর্ক সবুজ পত্রকে আর করতে হবে না। কেননা আমাদের ভাষা সাহিত্যে প্রমোশন পেয়েছে।

আমাদের লেখায় যে শুধু তৎসম শব্দ আছে তাই নয়, খুব সম্ভবত তৎসম মনোভাবও আছে। শুধু সংস্কৃত বিশেষ্য ও বিশেষণ নয়, সংস্কৃত মনোভাবের সঙ্গেও যাঁদের সম্যক পরিচয় আছে, তাঁরা আমাদের লেখা একটু মন দিয়ে পড়লেই দেখতে পাবেন যে, তার ভিতর পূর্ব্বোক্তজাতীয় মনোভাবও এখানে ওখানে ঠেলে বেরিয়েছে। তদ্ভব ও দেশী মনোভাবের সঙ্গে তৎসম মনোভাবের সমাবেশ যাঁদের কাছে বেখাপ্পা লাগে, তাঁদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করছি যে,

এ ক্ষেত্রে বৈষম্যের ধাতুসাম্য আমরা হাজার চেষ্টাতেও কর্‌তে কৃতকার্য্য হব না। বর্ত্তমান যুগের হিন্দুসন্তান মাত্রেই তাদের দেহের কাঠামের ন্যায় মনের কাঠামও উত্তরাধিকারী স্বত্বে লাভ করেছে। যে মন নিয়ে আমরা পৃথিবীতে আসি, তার উপর অতীতের হাতের অনেক লেখা অমর হয়ে রয়েছে, যা আমাদের মনের শ্লেটের নতুন লেখার সবর্ণ নয়। সময়ে সময়ে আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, এই সব নতুন লেখার চাইতে সেই পুরোনো লেখার অক্ষরগুলি মনের ভিতর বেশী জ্বল্‌জ্বল্‌ কর্‌ছে। নব শিক্ষার ঘস্‌ড়ানিতে সে লেখা আমরা মন থেকে একেবারে মুছে ফেল্‌তে পারিনে। আজকালকার অনেক নতুন ভাব যে আমরা গ্রাহ্য ও আত্মসাৎ করতে পারিনে, তার মূলে রয়েছে ঐ প্রাচীন লেখার বাধা। আর সত্য কথা বলতে হলে, প্রাচীন কথা মাত্রই অগ্রাহ্য আর নবীন কথাই গ্রাহ্য, এ মত, যা নবীন তাই অগ্রাহ্য আর যা প্রাচীন তাই গ্রাহ্য, এ মতের মতই সমান বাজে ও সমান মিছে। এ সব কথা পরিষ্কার করে বলে রাখছি এই জন্যে যে, সবুজ পত্রের কপালে ভবিষ্যতে যদি এই অপবাদ জোটে যে, সে পত্র re-actionary, সে অপবাদের ভয়ে আমরা ত্রস্ত হব না। কারণ নূতন ও পুরাতনের মধ্যে কোনও পূর্ণ ছেদ আমরা দেখতে পাই নে। অতীত যেমন অনেকাংশে বর্ত্তমান হয়ে উঠেছে, বর্ত্তমানও তেমনি অনেকাংশে চোখের সুমুখে অতীত হয়ে যাচ্ছে। যে সকল মতামত সেকেলে, তার বেশীর ভাগ অবশ্য নৈসর্গিক নিয়মে বুড়ো হয়ে মারা যায়। অপরপক্ষে একেলে মতামতের মধ্যে infant mortality কিছু কম নয়। এমন কি একালে যে সব মতামত, মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই, যুদ্ধং

দেহি বলে চীৎকার করে ওঠে ও বেজায় হাত পা ছোঁড়ে—তারাও দেখতে পাই অচিরে রণলীলা সম্বরণ করে।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গুরুরা একটা মহাসত্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন পুরোনো মনোভাবকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে renovate করা—অর্থাৎ তাকে নব কলেবর দান করা। আজকের দিনে দেশের যত ভাবুক লোক, জ্ঞাতসারে হোক্, অজ্ঞাতসারে হোক্ - সেই কাজই করছেন। অর্থাৎ যে সকল তৎসম-ভাবের অন্তরে প্রাণ আছে, দেশের মন থেকে সে সব ঝরে যায় নি; শুধু রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের নব শিক্ষাদীক্ষা যে সকল নতুন ভাব আমাদের মনের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেই সকল ভাবের সঙ্গে মিলে মিশে আমাদের পুরোনো মনোভাব সব নব রূপ ধারণ করেছে। এর কারণ আমাদের মনের বাক্সে এমন পৃথক পৃথক খোপ নেই, যার ভিতর দেশী বিদেশী ভাব সব পরস্পর নিঃসম্পর্কিত ও অস্পৃশ্য ভাবে বাস করতে পারে। মানুষের মন হিন্দু-সমাজের ছাঁচে গড়া নয়। ফলে, নূতন পুরাতন, দেশী বিলেতি, সবরকম ভাবেরই আমাদের মনের ভিতর ছোঁয়াছুঁয়ি হয়—সুতরাং তাদের ভিতর দ্বন্দ্ব ও মিলন দুই ঘটে। যেখানে দ্বন্দ্ব কেশি, সেখানেই আমাদের দুর্ব্বলতা; আর যেখানে মিলন বেশি, সেখানেই আমাদের শক্তি। সুতরাং সবুজপত্রে যদি বর্ত্তমান ইউরোপীয় মনোভাবের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন মনোভাবের entente-এর পরিচয় কেউ পান, তাহলে আমরা তার জন্য লজ্জিত হব না।

বিলেতি সাহিত্যের প্রভাব যে আমাদের মনের উপর যথেষ্ট আছে, সে কথা অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই, কারণ আমাদের লেখার

ভিতরই সকলে সে সত্যের পরিচয় পাবেন। এ সত্য গোপন করবার কোনও প্রয়োজনও নেই, যেহেতু আহেল-বিলাতি মনোভাবকে সংস্কৃতের বেনামিতে চালাবার প্রবৃত্তি আমাদের ধাতে নেই। মনোজগতের অসংখ্য জর্ম্মাণ মাল যে আমাদের ভাবের হাটে মুনিঋষিদের নামে চালানো হচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে, তার কারণ আর্য্যাবর্ত্ত ও বর্ত্তমান জর্ম্মানী যে এক দেশ নয়, এ ধারণা অনেকের নেই; যেহেতু জিওগ্রাফির চর্চ্চা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হয় না। ইউরোপে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন আমার জনৈক বন্ধু আমাকে বলেন যে, poison-gas তৈরী করবার প্রকরণ পদ্ধতি সব "ধনুর্ব্বেদে" আছে। ও শাস্ত্রের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় পর্য্যন্ত নেই, সুতরাং তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতিবাদ আমি করতে পারলুম না, তাই উত্তরে বললুম I hope not। বর্ত্তমান ইউরোপে অনেকরকম মানসিক poison-gasও তৈরী হচ্ছে, আশা করি বেদ উপনিষদে সে সবের গন্ধমাত্রও নেই; কেননা এ সব gas জড় মস্তিষ্ক হতে প্রসূত, বড় মন থেকে নয়। অনেক ক্ষেত্রে তৎসম মনোভাব এই সব বিষাক্ত বাষ্পের আক্রমণ থেকে আমাদের মনকে বাঁচাবার সনাতন রক্ষা-কবচ। সম্প্রতি সবুজপত্রের পরম হিতৈষী ধীমান শ্রীমান ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "সবুজ পত্র" যেন mass-mind-এর উপাসক না হয়ে ওঠে। নিজ মনকে হট্টমনে লীন করে দেবার নামই যে মুক্তি, এ অধ্যাত্ম-দর্শনের প্রচারক আমরা যে হয়ে উঠব, এ ভয় পাবার তাঁর কোন সঙ্গত কারণ নেই। যে কথা জাহাজ চড়ে আসে, তারই অন্তরে যে এক জাহাজ অর্থ আছে, এ বিশ্বাস আমাদের পূর্ব্বেও ছিল না, আশা করি পরেও জন্মাবে না। এ আশার

কারণ এই যে, দু-একটি তৎসম বাক্য এ ক্ষেত্রে আমাদের মনের রক্ষা-কবচ হয়ে রয়েছে। মহাভারতে আছে যে,—

পুরুষে পুরুষে বুদ্ধির্যা যা ভবতি শোভনা।
তুষ্যন্তি চ পৃথক সর্বে প্রজ্ঞয়া তে স্বয়া স্বয়া॥
কারণান্তর যোগেন যোগে যেষাং সমা মতিঃ।
অন্যোন্যেন চ তুষ্যন্তি বহু মন্যন্তি চাসকৃত॥
তস্যৈব তু মনুষ্যস্য সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা।
কালযোগে বিপর্য্যাসং প্রাপ্যোন্যোন্যং বিপদ্যতে॥

অস্যার্থ :—

পুরুষে পুরুষে যে পৃথক পৃথক শোভনা বুদ্ধি আছে, সকলেই সেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে। কারণান্তর সমুদয় দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি সমতা ধারণ করে এবং যাহারা পরস্পর সন্তুষ্ট হয় এবং পরস্পরকে বহুমান করে, সেই সেই মনুষ্যের তৎ তৎকালের সেই সেই বুদ্ধি কাল সহকারে বিপর্য্যস্ত হইয়া তাহাদের বিপন্ন করে।

পূর্ব্বোক্ত কথা-কটির বক্তা হচ্ছেন—অশ্বত্থমা। অশ্বত্থমা মহাভারতে দুরাচার বলে প্রসিদ্ধ, কিন্তু মহাভারতের কোন মহাপুরুষই অশ্বত্থমার চরিত্রমনের অসাধারণ তীক্ষ্ণতা তেজস্বিতার কথা বলতে ভোলেন নি। অপর যে ক্ষেত্রে উক্ত মতের সার্থকতা থাক্ আর না থাক্, সাহিত্যক্ষেত্রে ওর সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। যিনি নিজের বুদ্ধিকে শোভনা না মনে করেন, যিনি নিজের প্রজ্ঞায় সন্তুষ্ট নন, যিনি মতামতের জন্য নিত্য পরমুখাপেক্ষী, যিনি হয় গুরু-গঞ্জনা নয় লোক-লাঞ্ছনার ভয়ে অতি কাতর,—তাঁর আসন সাহিত্যে নয়, তাঁর সিংহাসন সংবাদপত্রে।

সবুজ পত্র যখন সাহিত্যের অথবা সাহিত্যিকের পত্র, তখন তা হট্ট-বুদ্ধির শরণাপন্ন হবে না, আর যদি হয়, তখনই ধরে নিতে হবে যে, তা মাসিক হলেও দৈনিকে পরিণত হয়েছে। ভাল কথা, সাহিত্য জিনিষটে কি? এই পৃথিবীতে গত তিন হাজার বৎসর ধরে নানা দেশে নানা লোক এ প্রশ্নের নানা উত্তর দিয়েছেন। এর মধ্যে কোন উত্তরই অদ্যাবধি চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য হয়নি। আমরা বলি সাহিত্য হচ্ছে সেই জিনিষ, যার কোনও utility নেই। যিনি ঐ utility শব্দের বিলেতি অর্থ জানেন, তিনিই আমাদের definition-এর মর্ম্ম বুঝবেন। আমার শেষ কথা এই যে, সবুজ পত্র কারও উনুনে হাঁড়ি চড়াবার সাহায্য করবে না, বড় জোর উনুন ধরাবার কাজে লাগতে পারে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

চরকা।

—:※:—

চরকা চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করিনি অপবাদ দিয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালীতে লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু দণ্ড দেবার বেলাতেও আমার পরে সম্পূর্ণ নির্ম্মম হতে পারেন না বলেই আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও আমার সঙ্গে এক কলঙ্কের রসায়নে মিল করিয়েছেন।

এ'তে আমার ব্যথা দূর হ'ল, তাছাড়া একটা অত্যন্ত পুরোনো কথার নতুন প্রমাণ জুটুল এই যে, কারো সঙ্গে কারো বা মতের মিল হয়, কারো সঙ্গে বা হয় না। অর্থাৎ সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধ্‌বে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ বিধাতারা কখনো কখনো সেইরকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই কাঠি বের করে আনেন। বন্য দ্রব্যকে এরকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চুপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মৌমাছির বুদ্ধি করে তুল্‌লে নারায়ণের দরবারে হিসাব নিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে। ছোটো বয়সে জগন্নাথের ঘাটে জলযাত্রার প্রয়োজনে যখন যেতেম, নানা পান্সীর মাঝি হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু

কোনো একটার পরে যখন অতিরুচির পক্ষপাত প্রকাশ করা যেত, তখন সে জন্যে কারো কাছ থেকে শাসনভয় ছিল না। কেননা পান্সী ছিল অনেক, যাত্রী ছিল অনেক, তাদের গম্যস্থানও ছিল অনেক। কিন্তু যদি দেশের উপর তারকেশ্বরের এমন একটা স্বপ্ন থাকৃত যে, তারণের জন্যে শুধু একটিমাত্র পান্সীই পবিত্র, তবে তাঁর প্রবল পাণ্ডাদের জবরদস্তি ঠেকাত কে?—এদিকে মানবচরিত্র ঘাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে মরত, "ওরে পালোয়ান, কূল যদি বা একই হয়, ঘাট যে নানা,—কোনোটা উত্তরে কোনটা দক্ষিণে।"

শাস্ত্রে বলেন, ঈশ্বরের শক্তি বহুধা। তাই সৃষ্টিব্যাপারে পাঁচ ভূতে মিলে কাজ করে। মৃত্যুতেই বিচিত্র ভূত দৌড় মারে; প্রলয়ে সব একাকার। মানুষকে ঈশ্বর সেই বহুধা শক্তি দিয়েছেন, তাই মানবসভ্যতার এত ঐশ্বর্য্য। বিধাতা চান মানবসমাজে সেই বহুকে গেঁথে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের; বিশেষ ফললুব্ধ শাসনকর্ত্তারা চান, সেই বহুকে দ'লে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের। তাই সংসারে এত অসংখ্য এক-কলের মজুর, এক উর্দ্দিপরা সেপাই, এক দলের দড়িতে বাঁধা কলের পুতুল। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব জুড়িয়ে হিম হয়ে যায়নি, সেখানেই এই হামানদিস্তায়-কোটা সমীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছেই। কোথাও যদি সেই বিদ্রোহের লক্ষণ না থাকে, যদি দেখি সেখানে হয় প্রভুর চাবুকে নয় গুরুর অনুশাসনে মানুষকে অনায়াসেই একই ধূলিশয়নে অতি ভালোমানুষের মতো নিশ্চল শায়িত রাখতে পারে, তাহলে সেই "দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিম-কলেবর" দেশের জন্যে শোকের দিন এসেছে বলেই জান্‌ব।

আমাদের দেশে অনেক দিন থেকেই সমীকরণের অলক্ষণ

বলবান। এই মরণের ধর্ম্মই আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতের প্রত্যেক মানুষের পরেই এক একটি বিশেষ কাজের বরাৎ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এই মন্ত্র যে, সৃষ্টির প্রথম দরবারে তাদের আদিপুরুষ একটিমাত্র বিশেষ মজুরীর বায়না নিয়ে তাদের চিরকালকে বাঁধা দিয়ে বসে আছে। সুতরাং কাজে ইস্তফা দিতে গেলেই সেটা হবে অধর্ম্ম। এইরকমে পিঁপ্‌ড়ে-সমাজের নকলে খুচরো কাজ চালাবার খুব সুবিধে, কিন্তু মানুষ হবার বিশেষ বাধা। যে মানুষ কর্ত্তা, যে সৃষ্টি করে, এ'তে তার মন যায় মারা; যে মানুষ দাস, যে মজুরী করে, তারই দেহের নৈপুণ্য পাকা হয়। তাই বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এবং সেই পুনরাবৃত্তির জাঁতা চালিয়ে চালিয়েই অস্তিত্বের প্রতি ভারতের এত বিতৃষ্ণা। তাই সে জন্মজন্মান্তরের পুনরাবর্ত্তন-কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মের মূল মেরে দেবার জন্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার কথা ভাব্‌ছে। এই পুনরাবৃত্তির বিভীষিকা সে আপন প্রতিদিনের অভ্যাস-জড় কর্ম্মচক্রের ঘুরপাকের মধ্যেই দেখেছে। লোকসান্ শুধু এইটুকু নয়, এম্‌নি করে যারা কল ব'নে গেল তারা বীর্য্য হারালো, কোন আপদকে ঠেকাবার শক্তিই তাদের রইল না। যুগ যুগ ধ'রে চতুর তাদের ঠকাচ্চে, গুরু তাদের ভোলাচ্চে, প্রবল তাদের কানমলা দিচ্চে। তারা এর কোনো অন্যথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, কারণ তারা জানে মেরে রেখেছেন বিধাতা; সৃষ্টির আদিকালে চতুর্ম্মুখ তাদের চাকায় দম দিয়ে বসে' আছেন, সে দম সৃষ্টির শেষকাল পর্য্যন্ত ফুরোবে না। একঘেয়ে কাজের জীবন্মৃত্যুর ভেলার মধ্যে কালস্রোতে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র যাই বলুন না, সৃষ্টির গোড়ায় ব্রহ্মা

মানুষকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন, এর সঙ্গে তার সম্পূর্ণই তফাৎ। মানুষের খোলের মধ্যে ঘূর্ণিচাকার মোটর-কল না বসিয়ে মন বলে' অত্যন্ত ছট্‌ফটে একটা পদার্থ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বালাইটাকে বিদায় করতে না পারলে মানুষকে কল ক'রে তোলা দুঃসাধ্য। ঐহিক বা পারত্রিক ভয়ে বা লোভে বা মোহমন্ত্রে এই মনটাকে আধমরা ক'রে তবে কর্ত্তারা একদলের কাছে কেবলি আদায় করছেন তাঁতের কাপড়, আরেক দলের কাছে কেবলি ঘানির তেল, এক দল কেবলি জোগাচ্চে তাঁদের ফরমাসের হাঁড়ি, আর এক দল বানাচ্চে লাঙলের ফাল। তারপরে যদি দরকার হয় মনুষ্যোচিত কোনো বড় কাজে তাদের মন পেতে, তারা বলে বসে, "মন ? সেটা আবার কোন্ আপদ ? হুকুম করো না কেন ? মন্ত্র আওড়াও।"

গাছ বসিয়ে বেড়া তৈরী করতে গেলে, সব গাছকেই সমান খাটো করে ছাঁট্‌তে হয়। তেমনি ক'রে আমাদের এই ছাঁটা মনের মুল্লুকে মানুষের চিত্তধর্ম্মকে যুগে যুগে দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকেকার অবাধ্যতার যুগে এদিকে ওদিকে তার গোটাকতক ডাল-পালা বিদ্রোহী হয়ে সাম্যসৌষম্যকে অতিক্রম ক'রে যদি বেরিয়ে পড়বার দুষ্টলক্ষণ দেখায়, যদি সকলেরই মন আজ আঁধার রাতের ঝিল্লিধ্বনির মত মৃদু গুঞ্জনে একটিমাত্র উপদেশমন্ত্রের সমতান-অনুকরণ না করে, তাহলে কেউ যেন উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত না হন; কেননা স্বরাজের জন্যে আশা করা তখনই হবে খাঁটি।

এই জন্যেই কবুল করতে লজ্জা হচ্চে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্য্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায়নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্দ্ধা বলে মনে করবেন,

বিশেষ রাগ করবেন, কেননা বেড়জালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে-মাছটা ফস্‌কে যায়, তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না। তথাপি আশা করি আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাঁদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত, কেননা চরকা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।

যে-কোনো সমাজেই কর্ম্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেইখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।

বুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতের মধ্যযুগের সাধু সাধক যাঁদেরই দেখি, যাঁরাই এসেছেন পৃথিবীতে কোনো মহাবার্ত্তা বহন ক'রে, তাঁরা সকলেই অমনস্ক যান্ত্রিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী। তাঁরা সব বাধা ভেদ ক'রে কথা কয়েছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। তাঁরা কৃপণের মতো, হিসাবী বিজ্ঞলোকের মতো এমন কথা বলেননি যে, আগে বাহ্যিক তারপরে আন্তরিক, আগে অন্নবস্ত্র তারপরে আত্মশক্তির পূর্ণতা। তাঁরা মানুষের কাছে বড় দাবী ক'রে তাকে বড় সম্মান দিয়েছিলেন, আর সেই বড় সম্মানের বলেই তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হ'য়ে সাহিত্যে, গানে, নানা কারুকলায় সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। তাঁরা মানুষকে দিয়েছিলেন আলো, দিয়েছিলেন জাগরণ, অর্থাৎ তাকে দিয়েছিলেন তার আপন আত্মারই উপলব্ধি—তাতেই সব দেওয়া পূর্ণ হয়।

আজ সমস্ত দেশজুড়ে আমাদের যদি দৈন্য এসে থাকে, তাহলে জানা চাই, তার মূল আছে আমাদের ভিতরের দিকে। সেই মূল দুর্গতির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ বেছে নিয়ে দেশশুদ্ধ সকলে মিলে তার উপরে একটিমাত্র বাহ্যিক প্রক্রিয়া নিয়ে পড়লে শনিগ্রহ ভয়

পান না। মানুষ পাথরের মতো জড় পদার্থ হ'লে বাইরে হাতুড়ি ঠুকে তার মূর্ত্তি বদল করা যেত,—কিন্তু মানুষের মূর্ত্তিতে বাহির থেকে দৈন্য দেখা দিলে ভিতরে প্রাণশক্তির দিকে মন দেওয়া চাই—হাতুড়ি চালাতে গেলে সেই প্রাণটার উপরেই ঘা পড়বে।

একদিন মোগল পাঠানের ধাক্কা যেই লাগ্‌ল, হিন্দু-রাজত্বের ছোটো ছোটো আল্‌গা পাট্‌কেলের কাঁচা ইমারৎ চারদিক থেকে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল। দেশে তখন সুতোর অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সুতো দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ভাঙন বন্ধ করা যায়নি। রাজার সঙ্গে তখন আর্থিক বিরোধ ছিল না, কেননা তাঁর সিংহাসন ছিল দেশেরই মাটিতে। যেখানে ছিল গাছ, তার পাকা ফল পড়ত সেইখানেই গাছতলায়। আজ আমাদের দেশে রাজা এক-আধজন নয়, একেবারে রাজার বন্যা ভারতের মাটী ধুয়ে তার ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রপারে। জমি তাতে ফলও হারায়, উর্ব্বরতাও হারায়। এবারকার এ আঘাতও যে ঠেকাতে পারিনি তার কারণ এ নয় যে আমাদের যথেষ্ট সুতো নেই,—কারণ এই যে, আমাদের মিল নেই, প্রাণ নেই।

কেউ কেউ বলেন মোগল পাঠানের আমলে আমাদের নিঃশক্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্নবস্ত্রও ত ছিল। নদীতে জলধারা যখন কম, তখনো বাঁধ দিয়ে ছোটো ছোটো কুণ্ডে হাতের কাছে দিনের কাজ চালাবার মত জল ধরে রাখা যায়। এদিকে বাঁধ ভেঙেছে যে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে দেনা পাওনা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকি, এমন দিন আর নেই, কখনো আসবেও না। তা ছাড়া সেরকম অবরোধই সব চেয়ে বড় দৈন্য। এমন অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে ব্যাপারের যোগ্য

মনের শক্তি যদি না জাগাতে পারি, তাহলে ফসল খেয়ে যাবে অন্যে, তুঁষ পড়ে থাকবে আমাদের ভাগে। ছেলে-ভোলানো ছড়ায় বাংলা দেশে শিশুদেরই লোভ দেখানো হয় যে, হাত ঘুরোলে লাড়ু পাবার আশা আছে—কিন্তু কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্য দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না। বাইরের দারিদ্র্য যদি তাড়াতে চাই, তাহলে অন্তরেরই শক্তি জাগাতে হবে বুদ্ধির মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সহযোগিতা-প্রবর্ত্তক হৃদ্যতার মধ্যে।

তর্ক উঠবে, কাজ বাইরের থেকেও মনকে তো নাড়া দেয়। দেয় বটে, কাজের মধ্যেই যদি মনের অভিমুখে কোনো একটা চিন্তার ব্যঞ্জনা থাকে। কেরাণীর কাজে এটা থাকে না, এ কথা আমাদের কেরাণীগিরির দেশে সকলেই জানে। সঙ্কীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মত অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই জন্যেই, যে সব কাজ মুখ্যতঃ কোনো একটা বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি, সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of labour প্রচার করেছেন, কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশী চড়া গলায় indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। যারা মজুরী করে, তারা নিতান্ত দায়ে পড়েই সমাজের বা প্রভুর, প্রবলের বা বুদ্ধিমানের লোভে বা শাসনে নিজেদের যন্ত্র বানিয়ে তোলে। তাদেরই মন্ত্র, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—অর্থাৎ না খেয়ে যখন মরতেই বসেছে, তখন মনটাকে বাদ দিয়েই হাত চালিয়ে পেট চালানো। তাই ব'লে মানুষের প্রধান-

ভর অর্দ্ধেকটা বাদ দেওয়াতেই তার dignity, এমন কথা ব'লে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাকে বিদ্রূপ করা। বস্তুত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই এই যন্ত্রীভবনের পঙ্গুতা থেকে বাঁচাবে কিসে, এইটেই হয়েছে মস্ত সমস্যা। আমার বিশ্বাস সব বড় সভ্যতাই, হয় মরেছে নয় জীবন্মৃত হয়েচে, অল্প লোকের চাপে বহু লোককে মন-মরা করে দেওয়াতেই। কেননা মনই মানুষের সম্পদ। মনোবিহীন মজুরীর আন্তরিক অগৌরব থেকে মানুষকে কোনো বাহ্য সমাদরে বাঁচাতে পারা যায় না। যারা নিজের কাছেই নিজে ভিতর থেকে খাটো হয়ে গেছে, অন্যেরা তাদেরই খাটো করতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চ্চার সামনে যদি কোনো বড় নৈতিক সাধনা থাকে, সে হচ্চে বাহ্য প্রকৃতির হাতের সবরকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্চে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এত বড় কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই।
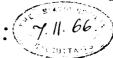
একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল, সেদিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র, যে-বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই, মানুষের আছে,—তাই মানুষ

মাত্রই দ্বিজ। তার বাহিরের প্রাণ অন্তরের প্রাণ উভয়কেই রক্ষা করতে হবে। তাই জড়ের উপর তার বাহ্য কর্ম্মভার যতটাই সে না চাপাতে পারবে, ততটাই চাপাতে হবে মানুষের উপর। সুতরাং ততটা পরিমাণেই মানুষকে জড় করে শূদ্র করে তুলতেই হবে, নইলে সমাজ চলবে না। এই সব মানুষকে মুখে dignity দিয়ে কেউ কখনই dignity দিতে পারবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায় স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভার-লাঘবতার মত ঐশ্বর্য্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহুযুগ পূর্ব্বে প্রথম বুঝতে পারলে, যেদিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন উৎপাদনের কাজে লাগল, ধন তখন থেকে চক্রবর্ত্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই? বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম, তেমনি আরেকটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে, অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈবশক্তিই অসীম, এই জন্য চলনশীল চক্রের এখনো আমরা সীমায় এসে ঠেকিনি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিমকালের চরকাই শেষ, তাহলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাবো না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্ত্ত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্চে এ কথা যদি ভুলি, তাহলে পৃথিবীতে অন্য যে সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে, তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাচক্রের যে বিরাট শক্তিরূপ দেখা যায়, সেটাকে যখন ভুলি, যখন কোনো এক বিশেষ কালের বিশেষ চরকাকেই সুতো কাটবার চরম উপাদান রূপে দেখি ও অত্যন্তভাবে ব্যবহার করি, তবে চরকা ভিতরের দিক থেকে আমাদের কাছে বোবা হয়ে থাকে। তখন যে চরকা মানুষকে একদিন শক্তির পথে ধনের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে, সে আর এগোবার কথা বলে না। কানের কাছে আওয়াজ করে না তা নয়, কিন্তু মনের সঙ্গে কথা কয় না।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, চরকা ছাড়া আর কোন কাজ করো না, এমন কথা তো আমরা বলি নে। তা হতে পারে, কিন্তু আর কোনো কাজ করো, এ কথাও তো বলা হয় না। সেই না বলাটাই কি প্রবল একটা বলা নয়? স্বরাজ সাধনায় একটিমাত্র কাজের হুকুম অতি নির্দ্দিষ্ট, আর তার চারদিকেই নিঃশব্দতা। এই নিঃশব্দতার পটভূমিকার উপরে চরকা কি অত্যন্ত মস্ত হয়ে দেখা দিচ্চে না? বস্তুত সে কি এতই মস্ত? ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক স্বভাবস্বাতন্ত্র্য নির্ব্বিচারে এই ঘূর্ণ্যমান চরকার কাছে যে যতটা পারে আপন সময় ও শক্তির নৈবেদ্য সমর্পণ করবে,—চরকার কি প্রকৃতই সেই মহিমা আছে? একই পূজাবিধিতে একই দেবতার কাছে সকল মানুষকে মেলবার জন্যে আজ পর্য্যন্ত নানা দেশে বারে বারে ডাক পড়ল। কিন্তু তাও কি সম্ভব হয়েছে? পূজাবিধিই কি এক হল, না দেবতাই হল একটি? দেবতাকে আর দেবার্চ্চনাকে সব মানুষের পক্ষে এক করবার জন্য কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুর অত্যাচার পৃথিবীতে চলে আসচে। কিছুতেই কিছু হল না, শুধু কি স্বরাজ-তীর্থের সাধন-মন্দিরে একমাত্র চরকা দেবীর কাছেই সকলের

অর্ঘ্য এসে মিলবে? মানবধর্ম্মের প্রতি এত অবিশ্বাস? দেশের লোকের পরে এত অশ্রদ্ধা?

গুপী ব'লে আমাদের এক পশ্চিমদেশী বেহারা ছিল। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, যখন সে পুরীতীর্থে গিয়েছিল, জগন্নাথের কাছে কোন্ খাদ্য ফল উৎসর্গ করে দেবে, এই নিয়ে তার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হ'ল। সে বার বার মনে মনে সকল রকম খাবার যোগ্য ফলের ফর্দ্দ আউড়িয়ে যেতে লাগল। কোনটাতেই তার মন সায় দিলে না। অবশেষে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল বিলিতি বেগুন। তখনি তার দ্বিধা গেল ঘুচে, জগন্নাথকে দিয়ে এল বিলিতি বেগুন, শেষ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে তার পরিতাপ রইল না।

সব চেয়ে সহজ দেবতার কাছে সব চেয়ে কম দেওয়ার দাবী মানুষের প্রতি সব চেয়ে অন্যায় দাবী। স্বরাজ সাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া। আশা করি ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি গুপী নেই। বড় যখন ডাক দেন তখন বড় দাবী করেন, তখন মানুষ ধন্য হয়। কেন না, মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চম্‌কে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে সে বড়।

আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ ব'লেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পূজোর পরে আমাদের ভরসা বেশী। বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবী থেকে বঞ্চিত কর্‌তে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি; তাহলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্মকর্ত্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার

এমন সাধনা আর নেই। এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম ক'রে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি, আর মনে মনে বল্‌ছি স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চল্‌ছে।

ঘোর পুরাতন কথাটাকে আজ নতুন ক'রে বল্‌তে হচ্চে যে, স্বরাজের ভিৎ বাহ্য সাম্যের উপর নয়, অন্তরের ঐক্যের উপর। জীবিকার ক্ষেত্রে এই আন্তরিক ঐক্যের মস্ত একটা জায়গা আছে। বস্তুত ঐক্যটা বড় হ'তে গেলে জায়গাটা মস্ত হওয়াই চাই। কিন্তু মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সুতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে, কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষ্যের বাইরে পড়ে থাক্‌বে।

ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয়; আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলেই মিল্‌বে এমন চর্চ্চা এখানে কোনো দিন ছিল না, সবে এর আরম্ভ হয়েছে, সাধারণের মনকে সত্য ভাবে অধিকার করতে অনেক দেরি হবে। এই জন্যেই জীবিকার ভিতের উপরে একটা বড় মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সব চেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোট বড়, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে—মরণেরই ডাকের মত এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয়, যদি প্রমাণ করতে পারি এখানেও প্রতিযোগিতাই মানব-শক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য,—তাহলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার ক'রে নিতে পারি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে গ্রাম-সমাজে এই

ক্ষেত্রে মেলবার চর্চ্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদিবা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের স্বভাবটা অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।

ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকের বা দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের বিষয়-বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়-বুদ্ধি হচ্চে ভেদবুদ্ধি। এ পর্য্যন্ত এমনিই চল্‌চে। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্ত ভাবে স্বকীয় স্বার্থ সাধনের যে আয়োজনে ব্যাপৃত, সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্ত্রের বোঝা কেবলি ভারি হয়ে উঠ্‌চে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে, এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যেদিন মানুষ স্পষ্ট ক'রে বুঝবে যে, সর্ব্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পরনির্ভরতাই মানুষের ধর্ম্ম, সেই দিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেই দিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্ম্মনীতিকে সত্য ব'লে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চ্চা, এগুলোকে কেবল পরার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় ব'লে জানবে। League of Nations-এর প্রতিষ্ঠা হয়ত রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ।

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু মানুষ যখন মানুষ, তখন তার

জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয়, আপন সত্য পাবে, এই ত চাই। কয়েক বছর পূর্ব্বে যেদিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এতদিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানব সভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য—মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করিনে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে, কোনো একটা বাহ্য কর্ম্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়-তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয়, এই জন্য বহু কর্ম্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজী ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকা সাধনার পক্ষে এ সে রকম পথ নয়। বুঝেছিলুম এই পথ দিয়ে কোনো একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন, যাঁর মধ্যে অন্নের সকলপ্রকার রূপ এক সত্যে মিলেচে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্লণ্ডের কবি ও কর্ম্মবীর A. E. রচিত National Being বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়

জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড় সিদ্ধি পায়, অর্থাৎ কর্ম্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি, এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এ সব শক্ত কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শক্ত বই কি। কোনো বড় সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিষের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকায় স্বরাজ পাওয়া যায়, এ কথা অনেকে বল্‌চেন, অনেকে বিশ্বাসও করচেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেচেন, এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চল্‌চেও না, রাগারাগি চল্‌চে। যাঁরা তর্কে নামেন, তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকায় কত পরিমাণ সুতো হয়, আর কত সুতোয় কতটা পরিমাণ খদ্দর হতে পারে। অর্থাৎ তাঁদের হিসাব মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তাহলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু দৈন্য জিনিষটা জটিল মিশ্র জিনিষ। আর এ জিনিষটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ত্রুটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্ব্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে

এক করে ধ'রে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে, তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না? দেশশুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে, তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমানী যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও না হয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারী থুৎকার-প্লাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেল্‌বেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সেঁচে ফেলবার উদ্দেশে চরকা চালনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

আয়র্লণ্ডে সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায়-জীবিকা প্রবর্ত্তনে প্রথম লেগেছিলেন, তখন কত বাধা কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কিরকম সুরু হয়েছে, National Being বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেরি হয়, কিন্তু যখন ধরে, তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে-দেশের যে-কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন আয়র্লণ্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন, তখন তিনি

একই কালে ভারতবর্ষের জন্যেও সিদ্ধিকে আবাহন ক'রে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তাহলে তিনি তেত্রিশকোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন পরিমাপ ক'রে যারা সত্যের যাথার্থ্য বিচার করে, তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের সামিল ক'রে দেখে, তারা জানেনা যে অতি ছোটো বীজের মধ্যেও যে প্রাণটুকু থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে।

এইমাত্র আমার একজন বন্ধু বল্‌লেন যে, দেশের সাধারণ দৈন্য দূর বা স্বরাজ লাভ বল্‌লে যতখানি বোঝায়, তোমার মতে চরকায় সুতো কাটার লক্ষ্য ততদূর পর্য্যন্ত নাও যদি পৌঁছয়, তাতেই বা দোষ কি? চাষের কাজ যখন বন্ধ থাকে, তখন চাষীর, এবং গৃহকাজ প্রভৃতি সেরেও গৃহস্থর হাতে যে উপরি সময় বাকি থাকে, তাকে সকলে মিলে কোনো সর্ব্বজনসাধ্য লাভবান কাজে লাগালে সাধারণের অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে, দেশে চরকা চলিত করার এই শুভ ফলটুকুই ধরে নাওনা কেন। মনে আছে এই জাতীয় আর একটা কথা পূর্ব্বে শুনেছিলুম। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে থাকে। তার দ্বারা সমস্ত ভারত জুড়ে যে পুষ্টিকর খাদ্য নষ্ট হয়, তা সকলে মিলেই যদি রক্ষা করি, তাহলে মোটের উপরে অনেকটা অন্নকষ্ট দূর হতে পারে। কথাটার মধ্যে সত্য আছে। ফেন সমেত ভাত খেতে গেলে অভ্যস্ত রুচির কিছু বদল করা চাই, কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ্য ক'রে দেখলে সেটা দুঃসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এইরকম এমন আরো অনেক জিনিষ আছে, যাকে

আমাদের দৈন্যলাঘব-উপায়ের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে যাঁরা যেটা ভালো বোঝেন চালাতে চেষ্টা করুন না; তার কোনোটাতে ধন বাড়বে, কোনটাতে তার সঙ্গে পুষ্টিও বাড়বে, কোনোটাতে কিছু পরিমাণে আলস্য দোষ কেটে যাবে। কিন্তু দেশে স্বরাজ লাভের যে একটা বিশেষ উদ্যোগ চল্‌চে, দেশশুদ্ধ সকলে মিলে ভাতের ফেন না ফেলাকে তার একটা সর্ব্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ করার কথা কারো তো মনেও হয় না। তার কি কোন কারণ নেই? এ সম্বন্ধে আমার কথাটা পরিষ্কার করবার জন্যে ধর্ম্মসাধনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষ্যেই যদি বিশেষ জোর দিয়ে হাজারবার ক'রে বলা হয় যে, যার-তার কুয়ো থেকে জল খেলে ধর্ম্মভ্রষ্টতা ঘটে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এমন উপদেশে ধর্ম্মসাধনার নৈতিক পন্থার মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। যার-তার কুয়োতে মলিনতা থাকার আশঙ্কা আছে, সেই মলিনতায় স্বাস্থ্য ক্লিষ্ট হয়, স্বাস্থ্যের বিকারে চিত্তের বিকার ঘটে, সেই বিকারে ধর্ম্মহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে, এ সব কথাই সত্য ব'লে মানলেও তবু বল্‌তেই হবে, অপ্রধানকে পরিমাণ-অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাতে প্রধানের মূল্য কমে যায়। সেই জন্যেই আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুল্‌তে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না। ছোটকে বড়োর সমান আসন দিলে সে সমান থাকে না, সে বড়োকে ছাড়িয়ে যায়। এই জন্যেই জলের শুচিতা রক্ষার ধর্ম্মবিধি মানুষের প্রাণহিংসা না করার ধর্ম্মবিধিকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে নিত্যধর্ম্মের সঙ্গে আচার ধর্ম্মকে মিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা এরকম

দুর্গতি যে কত ঘটুচে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই মজ্জাগত সনাতন অভ্যাসেরই জোরে আজ চরকা খদ্দর সর্ব্বপ্রধান স্বারাজিক ধর্ম্মকর্ম্মের বেশে গদাহাতে বেড়াতে পারল, কেউ তাতে বিশেষ বিস্মিত হল না। এই প্রাধান্যের দ্বারাতেই সে অনিষ্ট করচে, আমাদের দেশের বহুযুগসঞ্চারী দুর্ব্বলতার আর একটা নতুন খাদ্য জুগিয়ে দিচ্ছে। এর পরে আর একদিন আর কোনো বলশালী ব্যক্তি হয়ত স্বারাজ্য সিংহাসন থেকে প্রচার করবেন যে, ভাতের ফেন যে ফেলে দেয়, সেই অন্নঘাতীকে মন্ত্রণা-সভায় ঢুকতে দেব না। তাঁর যদি যথেষ্ট জোর থাকে এবং তাঁর শাসন যদি বেশী দিন চলে, তবে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে একদিন সাধুলোকে নিজেদের শুচিতারক্ষার জন্যে ভাতের ফেনপাত উপলক্ষ্যে মানুষের রক্তপাত করতে থাক্‌বে। বিদেশী কাপড় পরায় অশুচিতা ঘটে, এই নিষেধ যদি দেশের অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করে, এবং অন্ন জল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অশুচিতা বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত হয়ে ওঠে, তাহলে সেদিন ইদের দিনে কলকাতায় যেরকম মাথা ফাটাফাটি হয়েছে, এ নিয়েও একদিন ম্লেচ্ছ ও অম্লেচ্ছদের মধ্যে তেমনি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যে আচার পরায়ণ সংস্কারের অন্ধতা থেকে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতারীতির উৎপত্তি, সেই অন্ধতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকা-খাদ্দরিক অস্পৃশ্যতা-তত্ত্ব জাগিয়ে তুলচে।

কেউ কেউ বলবেন তুমি যে সমবায়-জীবিকার কথা বলচ, সকলে মিলে চরকা কাটাই ত তাই। আমি তা মানি না। সমস্ত হিন্দু-সমাজে মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাণুতত্ত্ব-মূলক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান হয়ে ওঠে না। ওটা একটা কর্ম্ম, ওটা একটা

সত্য নয়। এই জন্যেই কুয়োর জল যখন শুচি থাকচে, পুকুরের জল তখন মলিন হচ্চে, ঘরের কানাচের কাছে গর্ত্তয় ডোবায় তখন রোগের বীজাণু অপ্রতিহতপ্রভাবে যমরাজের শাসন প্রচার করচে। আমাদের দেশে কাসুন্দি তৈরি করবার সময় আমরা অত্যন্ত সাবধান হই—এই সাবধানতার মূলে প্যাষ্ট্যর-আবিষ্কৃত তত্ত্ব আছে, কিন্তু যেহেতু তত্ত্বটা রোগের বীজাণুর মতই অদৃশ্য আর বাহ্য কর্ম্মটা পরিস্ফীত পিলেটারই মত প্রকাণ্ড; সেই জন্যেই এই কর্ম্মপ্রণালীতে কেবলমাত্র কাসুন্দিই বাঁচ্চে, মানুষ বাঁচ্চে না। একমাত্র কাসুন্দি তৈরি করবার বেলাতেই বিশ্বশুদ্ধ লোকে মিলে নিয়ম মানার মতই, একমাত্র সুতো তৈরির বেলাতেই তেত্রিশ কোটি লোকে মিলে বিশেষ আচার রক্ষা। তাতে সুতো অনেক জমবে, কিন্তু যুগে যুগে যে-অন্ধতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গড়বন্দী করে রেখেচে, তার গায়ে হাত পড়বে না।

মহাত্মাজির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্য্যপ্রণালীর ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড় ক'রে দেখ্‌লে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা, যাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কি হতে পারে? তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্য-বিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জ্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক্, বলশালী করুক্, তাকে নিজের মন দিয়ে চিন্তা করতে, সঙ্কল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক্—এই আমার কামনা। যে কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন

রায়ের মত অত বড় মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বল্‌তে কুণ্ঠিত হন নি, অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি,—সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণই মহাত্মাজির কর্ম্ম-বিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে, যাকে আমার স্বধর্ম্ম আপন ব'লে গ্রহণ করতে পারচে না। সে জন্যে আমার খেদ রয়ে গেল। কিন্তু সাধনার বিচিত্র পথই বিধাতার অভিপ্রেত, নইলে প্রকৃতিভেদ জগতে কেন থাকবে? ব্যক্তিগত অনুরাগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু আমার বুদ্ধি বিচারে চরকার যতটুকু মর্য্যাদা, তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক দ্বিধা ক'রে নিরস্ত হয়েছি। মহাত্মাজি আমাকে ঠিক বুঝবেন জানি, এবং পূর্ব্বেও বারবার আমার প্রতি যেমন ধৈর্য্য রক্ষা করেছেন, আজও করবেন; আচার্য্য রায় মশায়ও জনাদর-নিরপেক্ষ মত-স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, অতএব মাঝে মাঝে বক্তৃতা সভায় যদিচ মুখে তিনি আমাকে অকস্মাৎ তাড়না ক'রে উঠবেন, তবু অন্তরে আমার প্রতি নিষ্করুণ হবেন না। আর যাঁরা আমার দেশের লোক, যাদের চিত্তস্রোত বেয়ে উপকার আর অপকার উভয়েরই কত স্মৃতি অতলের মধ্যে তলিয়ে গেল, তাঁরা আজ আমাকে যদি ক্ষমা না করেন, কাল সমস্তই ভুলে যাবেন। আর যদিবা না ভোলেন, আমার কপালে তাঁদের হাতের লাঞ্ছনা যদি কোনোদিন নাও ঘোচে, তবে আজ যেমন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথকে লাঞ্ছনার সঙ্গী পেয়েছি, কালও তেমনি হয়ত এমন কোনো কোনো স্বদেশের অনাদৃত লোককে পাব, যাঁদের দীপ্তি দ্বারা লোকনিন্দা নিন্দিত হয়।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

অন্ধকার

—ঃ০ঃ—

অন্ধকার—ওগো অন্ধকার!
অসীমের রাজপাটে একেশ্বরী অয়ি বন্ধ-দ্বার,
নিবিড় নিকষ তব ঘনকৃষ্ণ চিকুরের তলে
নিখিল পাগল-করা কালো চোখে যে মাণিক জ্বলে,
নিশীথ বিরলে;
কোনো দিন কারো কাছে মিলিল না সন্ধান তাহার
ব্যর্থ বসুধার,
অয়ি অন্ধকার!

বিদেশিকা হে অন্তঃপুরিকা,
চিরদিন উপেক্ষিছ আলোকের অন্ধ অহমিকা;
দর্শন হয়েছে অন্ধ, বিজ্ঞানের হ'ল জ্ঞান হারা,
ধ্যানের স্তিমিত নেত্রে অঝোরে ঝরিল বারিধারা
খুঁজিয়া কিনারা;
ভাষার আভাষ পাতে আঁকিবারে তব রূপচ্ছবি
চাহে মুগ্ধ কবি!

বিশ্বজয়ি অয়ি একেশ্বরি,
তোমার তিমির-দুর্গে জাগে ভয় সতর্ক প্রহরী;

দ্বারে দ্বারে অজানার আতঙ্কেতে ত্রস্ত যাত্রী সব,
পথে পথে অচেনার আশঙ্কার আর্ত্ত কলরব
ভীষণ ভৈরব;
কুহূনিশীথিনী তার কাকপক্ষ অন্ধ পাখা দিয়া
রাখে আগলিয়া!

হে অজানা ওগো অন্ধকার,
যা-কিছু জানি বা চিনি, তারো মর্ম্মে তব অধিকার!
খনিগর্ভে গিরিগর্ত্তে বনমধ্যে সমুদ্রের জলে
তোমার বিজয়-চিহ্ন প্রতি ছত্রে আঁকা ধরাতলে
সর্ব্ব জলস্থলে;
সীমা নাই শেষ নাই বাধা নাই—বসুন্ধরা কাঁপে
তোমার প্রতাপে।

হে অচেনা, হে চির অজানা!
মানবের মনোমাঝে কে খুঁজিবে তোমার ঠিকানা?
কোথা ফুটে প্রেমপুষ্প কোন্ সে নিভৃত অন্তরালে,
কোথা ছুটে গন্ধ তাঁর কোন্ রস-রহস্য-পাতালে,
কোন্ সন্ধ্যাকালে;
চিত্তকুহরের ফাঁকে পাকে পাকে কত হিংসাবিষ
ফুঁসে অহর্নিশ!

তমোময় তোমার আলয়ে
সূর্য্য চন্দ্র কোনোদিন দৃষ্টি তার হানেনাক ভয়ে;

প্রগল্‌ভের অন্তরালে রচিয়াছ তব রাজধানী,
ত্রিলোক যোগায় নিত্য নিদ্রারূপে পরাভব মানি'
রাজকর খানি;
মরণ-তোরণ-দ্বারে ডাক যারে, সেই শুধু যায়
তব পদচ্ছায়!

রঙ্গময়ি হে অবগুণ্ঠিতা!
তুমি কিন্তু ত্রিভুবনে হের নিত্য চির অকুণ্ঠিতা;
বন্ধ বাতায়নপথে অপরূপ কালো ভুরু হানি'
বাসনার হাত হ'তে খসাও উদ্ধত অসিখানি,
ওগো মহারাণি;
লালসার বক্রদৃষ্টি নিবে তব সংক্ষুব্ধ নিঃশ্বাসে
মৌন অট্টহাসে!

হে নিঃসঙ্গ, তবু ভাবি মনে—
তোমারও ঈপ্সিত বুঝি আছে কেহ সুদূর ভুবনে!
বিরহ বেদনা যার ধূমাঙ্কিত বাসনার ধূপে
ছাপিয়া হৃদয় তব চিররাত্রি জ্বলে কালোরূপে
তমিস্রার স্তূপে;
একবেণীধরা তুমি জাগ নিত্য নিশীথ শয়নে
বিনিদ্র নয়নে!

হে ব্যথিতা, হে অপরিচিতা,
তব রুক্ষ কটাক্ষেতে নিবে' যায় দিবসের চিতা;

সখী রাত্রি একা যাত্রী তোমার গহন কুঞ্জবনে,
অপরাজিতায় ঘেরা ; কোকিলের মৌন আলাপনে
জাগে তব সনে ;
তোমার বাঞ্ছিত সঙ্গী মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বভয়হারা
যোগে আত্মহারা !

হে শঙ্করি, হে প্রলয়ঙ্করি,
তবু বর দেহ দেবি, এ জীবনে তোমারেই বরি।
জীবনের পূর্ব্বপারে তুমি ছাড়া কে ছিল মা আর,
মাঝে দুদিনের সেতু, আছ তুমি ঘেরি' পরপার,
হে চির আঁধার ;
তোমার অনন্ত রূপ চিনিবারে এ মর জীবনে
দীপ্তি এ নয়নে !

ওগো মাতা, ওগো অন্ধকার !
আলোকের অন্ধ শিশু—অক্ষমের লহ নমস্কার ;
কি ভাবে তোমারে ডাকি, শ্যাম শ্যামা তাই গড়ি' মনে,
তোমার অরূপ রূপ বাঁধিবারে সীমার বন্ধনে
চাহি প্রাণপণে।
অতুল সে কালো রূপে, ছায়া ছবি তব প্রতিমার,
নমি বারম্বার,
অয়ি অন্ধকার !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সবুজের হিন্দুয়ানী।

—:*:—

সম্পাদক মহাশয় শুনেছেন অনেকের আশঙ্কা, নবপর্য্যায়ের 'সবুজ পত্র' নাকি হবে জীর্ণ হিন্দুয়ানীর আতপত্র। কথা কি করে রট্‌লো বলা যায় না, তবে এ কথা বলা যায় যে, ভয় একেবারে অমূলক নয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বয়স হয়ে আস্‌ছে; আর প্রথম বয়সের ইংরাজী-পড়া তার্কিক যে শেষ বয়সের শাস্ত্রভক্ত গোঁড়াহিন্দু,—এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। কাজেই যাদের ভাবনা হয়েছে পুনরুদ্গত 'সবুজ পত্র' আধুনিকতার প্রখর রশ্মি থেকে প্রাচীন হিন্দুত্বকে ঢেকে রাখ্‌বে, তাদের ভয়কে অহেতুক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মটা খাটে না। কারণ তিনি কেবল ইংরাজীনবীশ নন, ইউরোপের আরও দু একটা আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যনবীশ; যার ফলে ইংরেজী মদের নেশা কোনও দিনই তাঁকে বেসামাল করতে পারে নি। আর হিন্দুশাস্ত্রচর্চ্চাও তিনি শেষ বয়সে 'বঙ্গবাসীর' অনুবাদ মারফত আরম্ভ করেন নি, তরুণ বয়স থেকেই শাস্ত্রকারদের নিজ হাতের তৈরী খাঁটি জিনিষে নিজেকে অভ্যস্ত করে এসেছেন। এখন আর ওর প্রভাবে ঝিমিয়ে পড়বার তাঁর কোনও সম্ভাবনা নেই।

এ কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু হিন্দুত্ব ও হিন্দুশাস্ত্রের

উপর চৌধুরী মহাশয়ের ভক্তি যে, গোঁড়া গদ্গদ ভক্তি নয়, তার যথার্থ কারণ এ দুয়ের উপর তাঁর অসীম প্রীতি, কেননা ওখানে তাঁর নিগূঢ় মমত্ববোধ রয়েছে। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও চৌধুরী মহাশয়ের শরীরে প্রাচীন শাস্ত্রকারদের রক্তের ধারা কতটা অক্ষুণ্ণ আছে, এ নিয়ে হয়ত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তর্ক তুল্‌তে পারেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও মনোভাব যে, প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রকারদের বুদ্ধি ও মনোভাবের অক্ষুণ্ণ ধারা, এতে আর তর্ক চলে না। শাস্ত্রকার মনু কি ভাষ্যকার মেধাতিথি, এঁদের সঙ্গে আজ মুখোমুখী সাক্ষাৎ হলে তাঁরা অবশ্য চৌধুরী মহাশয়কে নিজেদের বংশধর বলে চিনতে পারতেন না; বরং পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলনে প্রত্যন্তবাসী কশ্চিৎ ম্লেচ্ছ বলেই মনে করতেন। কিন্তু দু'চার কথার আদানপ্রদানে টপ্‌হ্যাট ও ফ্রক্ কোটের নীচে যে মগজ ও মন রয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয় হবামাত্র তাঁরা নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয়কে এই বলে আশীর্ব্বাদ করতেন :—

"আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদাং শতম্।"

'হে পুত্র! আমাদের আত্মাই তোমাতে জন্ম পরিগ্রহ করেছে। তুমি শতবৎসর পরমায়ু নিয়ে অযজ্ঞিয় ম্লেচ্ছপ্রায় বঙ্গদেশে ইস্পাতের লেখনীমুখে আর্য্যমনোভাব প্রচার ও তার গুণ কীর্ত্তন কর।'

এই আর্য্যমনোভাব বস্তুটি কি, একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক। কারণ প্রমথবাবু যদি 'সবুজপত্রে' হিন্দুয়ানী প্রচার করেন, তবে এই মনোভাবেরই প্রচার করবেন।

যে প্রাচীন আর্য্যেরা হিন্দুসভ্যতা গড়েছে, তাদের সকলের মনোভাব কিছু একরকম ছিল না। হিন্দুসভ্যতার জটিল বৈচিত্র্য

দেখ্‌লেই তা বোঝা যায়। যারা উপনিষদ রচেছে ও যারা ভক্তিশাস্ত্র লিখেছে; পুরুষার্থ সাধন ব'লে যারা যাগ যজ্ঞ-বিধির সূক্ষ্ম বিচার ও বিচারপ্রণালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছে; ও যারা চতুরার্য্য সত্য ও অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ করেছে; যারা শ্রুতিকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদের পরম প্রমাণ বলেছে, ও যারা বলেছে বেদ লোকযাত্রা-বিদ্‌দের লোক-নিন্দা থেকে রক্ষার আবরণ মাত্র (১); ন্যায়-দর্শন যাদের তত্ত্বপিপাসার নিবৃত্তি করেছে, ও যারা অখণ্ড অদ্বয় বাদে না পৌঁছে থামতে পারে নি—তারা সবাই ছিল আর্য্য, এবং হিন্দুসভ্যতা গড়ার কাজে সবারই হাত আছে। এক দল অনুশাসন দিয়েছে গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবঋণ ও প্রজোৎপাদনে পিতৃঋণ শোধ দিয়ে তবে বানপ্রস্থী হয়ে মোক্ষ চিন্তা করবে, নইলে অধোগতি হবে; অন্য দল উপদেশ করেছে যেদিন মনে বৈরাগ্য জাগবে সেইদিনই প্রব্রজ্যা নেবে। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যবৃদ্ধির উপায় রাজাকে শেখাবার জন্য এক দল 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেছে; অপর দল 'ধর্ম্মশাস্ত্র' লিখে সে পথ দিয়ে হাঁটতে রাজাকে মানা করেছে। কেউ বলেছে পুত্রের জন্মমাত্র সে পৈতৃক ধনে পিতার মতই স্বত্ব লাভ করে, কেউ বিধান দিয়েছে পিতা যতদিন বেঁচে আছে পুত্রের ততদিন কোনও স্বত্ব নেই। যে লৌকিক প্রবচন বলে এমন মুনি নেই যাঁর ভিন্ন মত নেই, তার লক্ষ্য হিন্দু সভ্যতাস্রষ্টাদের এই মতবিরোধের বৈচিত্র্য।

---

(১) "বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ, সংবরণ মাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদ ইতি।

(কৌটিল্য ১২)

এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই, বিশেষত্বও কিছু নেই। যে-কোনও বড় সভ্যতার মধ্যেই এই বিরোধ ও ভেদ দেখতে পাওয়া যাবে। সভ্যতা হ'ল মনের স্বচ্ছন্দ লীলার সৃষ্টি। বহু মনের লীলাভঙ্গী বিচিত্র না হয়ে যদি সৈন্যের কুচের মত একেবারে একতন্ত্র হ'ত, তবে সেইটেই হ'ত অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু তবুও যখন জাতি-বিশেষের নামে কোনও সভ্যতার নামকরণ করি, যেমন হিন্দুসভ্যতা কি গ্রীকসভ্যতা,—তখন যে কেবল এই খবর জানাতে চাই যে, কতকগুলি বস্তুজগতের ও মনোরাজ্যের সৃষ্টি বংশপরম্পরাক্রমে মোটামুটি এক জাতির লোকের কাজ, তা নয়। প্রকাশ্য বা নিগূঢ় ভাবে এ ইঙ্গিত প্রায় সকল সময়ে থাকে যে, ঐ সব বিচিত্র, বিভিন্ন, এমন কি বিরোধী সৃষ্টিগুলির মধ্যে একটা ঐক্যের বাঁধন আছে, যে ঐক্য কেবল জন্মস্থান-সমতার ঐক্য নয়, কিন্তু ভাবগত ও রুচিগত ঐক্য। খুব সম্ভব এ ঐক্যের মূল ঐ জন্মগত ঐক্য। কারণ ঐ সৃষ্টিগুলির যারা কর্ত্তা, তাদের শিরার রক্ত ও মাথার মগজের এক মূল জীব থেকে উৎপত্তি, এবং তাদের প্রাকৃতিক ও মানসিক পারিপার্শ্বিকও অনেক অংশে এক। অতি বড় প্রতিভাশালী স্রষ্টাও এর প্রভাব এড়াতে পারে না, ও এড়াতে চায় না। ফলে তাদের সৃষ্ট সভ্যতা তার বহুমুখী বৈচিত্র্য ও নানা পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের মধ্যেও ভিতরের কাঠামো খানি প্রায় বাহাল রাখে। ঘরের চাল বদ্‌লে যায়, দরজা জানালার পরিবর্ত্তন হয়, পুরানো বেড়া তুলে ফেলে নতুন বেড়া বসান হয়, কিন্তু মাঝের 'ফ্রেম্'টি বজায় থাকে। আর্য্যমনোভাব হিন্দু-সভ্যতার এই "ষ্টীলফ্রেম"।

বলা বাহুল্য এ 'ষ্টীলফ্রেমের' শলাকা চোখে দেখা যায় না।

চুম্বকের 'লাইন্‌স্‌ অব্‌ ফোর্সেস্‌' শক্তিসঞ্চার পথের মত সেগুলি অদৃশ্য। তাদের উপাদান কোনও বস্তুসমষ্টি নয়, এমন কি রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানও নয়। চিন্তা বা মননের কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গী, ভাব ও অনুভূতির কয়েকটি বিশেষমুখী প্রবণতা দিয়ে এ 'ফ্রেম' তৈরী। সুতরাং আর্য্যমনোভাব জিনিষটিকে রূপরেখায় চোখের সুমুখে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কিঞ্চিৎমাত্রও প্রত্যক্ষ পরিচয় হলে এ মনোভাবের যে সুস্পষ্ট ছবি মনে এঁকে যায়, ভাষায় তার মূর্ত্তি গড়া সুদক্ষ শিল্পীর কাজ। সে অনধিকার চেষ্টায় উদ্বাহু না হয়ে শাদা কথায় তার দু' একটা লক্ষণের কিছু আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা মাত্র করবো।

ইংরেজীতে যাকে 'সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্‌' বলে, আমরা তার বাঙ্গলা নাম দিয়েছি ভাবালুতা। ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বিগত শতাব্দীর শেষ ত্রিশ চল্লিশ বছর ছিল এই ভাবালুতার পুরো জোয়ারের সময়। উনবিংশ শতাব্দীর যে ইংরেজী কাব্য ও সাহিত্যে তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মন পুষ্ট হচ্ছিল, সে কাব্য ও সাহিত্য 'সেণ্টি-মেণ্টালিজ্‌ম্‌' এর রসে ভরা; সুতরাং তার প্রেরণায় বাঙ্গালী যে সাহিত্য সৃষ্টি কর্‌ছিল, তা ভাবালুতায় ভরপুর। এবং প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের মাত্র যে অংশের তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর প্রভাব ছিল, সেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যও এই ভাবালুতার অনুকূল। এই মানসিক আবেষ্টনের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়ে প্রাচীন আর্য্যমনোভাবের যে লক্ষণ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের চোখ ও মন সব চেয়ে সহজে ও সবলে আকর্ষণ করেছে, সে হচ্ছে 'সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্‌' বা ভাবালুতার অভাব; এবং কেবল অভাব নয়, বিরোধী ভাবের আধিপত্য। কারণ

প্রাচীন হিন্দুর মনোভাবে এমন একটা ঋজু কাঠিন্য ছিল, যা কি শরীর কি মনের সমস্তরকম নুইয়ে পড়া ও লতিয়ে চলার বিরুদ্ধ। কালিদাস আর্য্যরাজার মৃগয়াকর্ষিত শরীরের যে ছবি এঁকেছেন, সেটা প্রাচীন আর্য্যমনেরও ছবি।

"অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি।"

"মেদহীন কৃশতা ঋজু দীর্ঘতায় কৃশ বলে' লক্ষ্য হয় না। পর্ব্বত-চারী গজের মত দেহ যেন কেবল প্রাণের উপাদানেই গড়া।" অথচ এই মেদশূন্য কৃশতা কল্পনা-অকুশল মনের বস্তুতান্ত্রিক রিক্ততা নয়। হিন্দুর বিরাট পুরাণ ও কথাসাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন গাথার বিপুলতা ভারতীয় আর্য্যমনের অফুরন্ত কল্পনালীলার পরিচয় দিচ্ছে। এ কাঠিন্যও শুষ্কপেশী কঙ্কালসার কাঠিন্য নয়। ভাবের দীনতা, রসবোধ ও রসসৃষ্টির অক্ষমতা, জাতির মনকে বিধিনিষেধ-সর্ব্বস্ব যে শুষ্ক কঠিনতা দেয়, সে কাঠিন্য হিন্দুর কখনও ছিল না। বেদসূক্তের উষার বন্দনা থেকে ভর্তৃহরির শতকত্রয় পর্য্যন্ত ভাব ও রসের সহস্র ধারা তাকে পাকে পাকে ঘিরেছে, তার ভোগকে শোভন ও জীবনযাত্রাকে মণ্ডনের জন্য চৌষট্টি কলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমস্ত ভাব ও কল্পনা, রস ও কলাবিলাসের মধ্যে একটা সরল, কঠিন মেরুদণ্ড সব সময়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। প্রাচীন আর্য্যমনে ভাবের অভাব ছিল না। কিন্তু আমরা যাকে বলি "ভাবে গলে' যাওয়া", তার মাধুর্য্য সে মনের রসনা আস্বাদ করে নি। ভগবান বুদ্ধ লোকের জন্মজরামরণের দুঃখে স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, সম্পদ ছেড়েছিলেন, কিন্তু চোখের জল ছাড়েন নি।

পণ্ডিত লোকে এমনও বলেছে যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি মূলে ছিল যাযাবর লুণ্ঠতরাজের দল—'প্রিডেটারি নোমাড্‌স্'। অন্য ধ্রুবশীল সভ্যজাতির ঘাড়ে চেপে তাদের পরিশ্রমের অন্ন খেতে খেতে তাদেরি সংস্পর্শে তারা ক্রমে সভ্য হয়েছে। এই ধার-করা সভ্যতার বীজ উর্ব্বরা জমীতে খুবই ফলেছে বটে, কিন্তু তার শিকড় আদিম যাযাবরত্বের প্রস্তরকঠিন অন্তর ভেঙ্গে মাটি কর্‌তে পারে নি, ফুলপাতায় ঢেকে রেখেছে মাত্র। এ মতের ঐতিহাসিক মূল্য যতটা থাক না থাক, এটি স্পষ্টই প্রাচীন আর্য্যমনোভাবের একটা পৌরাণিক অর্থাৎ 'ইভলিউশনারি' ব্যাখ্যা। একটি ছোট উদাহরণ দিই। নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রাচীন হিন্দুর প্রিয়বস্তু ছিল। হিন্দু আলঙ্কারিকেরা কাব্যের মধ্যে নাটককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। তাঁদের শিল্পকলার সংখ্যাও গণনায় চৌষট্টি পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র একযোগে বিধান দিয়েছে—কারুকর্ম্ম ও কুশীলবের কর্ম্ম শূদ্রের কাজ, আর্য্যের নয়। (১)

উদাহরণে পুঁথি বেড়ে যায়। কিন্তু আর্য্যমনের এই কাঠিন্য যে কত কঠোর, তা তাঁরা নিজেদের জীবনের অপরাহ্নকালের জন্য যে দুটি আশ্রমের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার কথা একটু কল্পনা কর্‌লেই উপলব্ধি হয়।

"গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥" (মনুঃ ৬।২)

"গৃহস্থ যখন দেখ্‌বে গায়ের চামড়া শিথিল হয়ে আস্‌ছে, চুলে পাক ধরেছে, ও পুত্রের পুত্র জন্মেছে", অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের অপটু শরীরে

(১) "শূদ্রস্য দ্বিজাতি শুশ্রূষা বার্ত্তা কারুকুশীলবকর্ম্ম চ।" (কৌটিল্য ১।৩)

গৃহের ছোটখাটো সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পুত্র পৌত্রের সেবা ও শ্রদ্ধা সব চেয়ে কাম্য হয়ে এসেছে, তখন ঘর ছেড়ে বনে প্রস্থান করবে।” হ’তে পারে সে বন খুব বন্য ছিল না। কিন্তু পুরাতন প্রিয় গৃহ ও সমাজের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্বন্ধচ্ছেদের নির্ম্মমতাতেই তা ভীষণ।

“ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোঽপি মূলানি চ ফলানি চ॥” (মনুঃ ৬।১৬)

‘ভূমিকর্ষণে যা জন্মেছে, পড়ে পেলেও তা আহার করবে না। আর্ত্ত হলেও গ্রামজাত ফলমূল গ্রহণ করবে না।’ এই বনবাসে উগ্র তপস্যায় নিজের দেহ শোষণ করাই ছিল বিধি।

“তপশ্চরং শ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ।” (মনুঃ ৬।২৪)

কিন্তু মৃত্যুকে অভিনন্দন ক’রে এ জীবনেরও সংক্ষেপ কামনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

“নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥” (মনুঃ ৬।৪৫)

“মরণকেও কামনা করবে না, জীবনকেও কামনা করবে না। ভৃত্য যেমন ভৃতিপরিশোধের অপেক্ষা করে, তেমনি কালের অপেক্ষা করবে।”

বানপ্রস্থের উপর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কতটা অনুরাগ আছে জানিনে, কিন্তু মনের যে বীর্য্য নিজের বার্দ্ধক্যদশার জন্য এই বানপ্রস্থের বিধান করেছিল, সেই বীর্য্য তাঁর মনকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আধুনিক হিন্দুর মনে প্রাচীন আর্য্যমনের এই বীর্য্য ফিরিয়ে আনতে চান। এবং বর্ত্তমানের মধ্যে অতীতকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

যদি re-actionary হয়, তবে চৌধুরী মহাশয়কেও re-actionary বল্‌তে হবে।

হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্য্য কালবশে কমে আস্‌ছিল, এবং মুসলমান-বিজয়ের পর থেকে কমার বেগ ক্রমে দ্রুত হয়ে এখন প্রায় লোপের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মনের একটা কোমলতা, গুটি কয়েক রসে আবিষ্টতা ও ভাবে বিহ্বলতা, তার খালি জায়গা অনেকটা জুড়ে বসেছে। হিন্দুর সচল মন নিশ্চেষ্ট থাকে নি। এই নূতন মনোভাবের উপযোগী ধর্ম্মসাধনা, কাব্য ও দর্শন গড়ে উঠেছে। বাঙ্গলা দেশে এর সাধক শ্রীচৈতন্য, কবি চণ্ডীদাস; দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী। প্রমথ বাবু যদি 'সবুজপত্রে' প্রাচীন হিন্দুয়ানী প্রচার কর্‌তে চান, তবে এই নবীন হিন্দুয়ানীর সঙ্গে তাঁকে লড়্‌তে হবে। কারণ 'পুরুষ ব্যাঘ্র বনাম মানুষ মেষ'-এর মামলায় তিনি যে বেদখল বাদীর পক্ষে সরাসরি একতর্ফা ডিক্রী পাবেন, এমন মনে হয় না। প্রথম ত তামাদি দোষ কাটাতে বেগ পেতে হবে। তারপর সভ্যতার ইতিহাসে বাঘের চেয়ে মেষ হয়ত সভ্যতর জীব। এবং 'দাসমনোভাবের' চেয়ে যে, 'প্রভুমনোভাব' শ্রেষ্ঠ, তাও বিচার সাপেক্ষ। যাহোক, এ তর্ক যদি প্রমথ বাবু সত্য সত্যই তুল্‌তে পারেন, তবে বাঙ্গলা সাহিত্যে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের একটা নতুন সংস্করণ অভিনয় হবে। কারণ অসম্ভব নয় যে, বাঙ্গলার তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে প্রাচীন হিন্দুর কতকটা কাঠিন্য ও বীর্য্য বিকট ছদ্মবেশে লুকান আছে।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বই প্রমথ বাবুর একমাত্র প্রতিমল্ল হবে না। বাঙ্গালীর ইংরাজী-শিক্ষিত মন আজকার দিনে অনেক রকম 'সমন্বয়'

সাধন করেছে। বৈষ্ণব আচার্য্যেরা যে রসতত্ব প্রচার করেছিলেন, সে রস ইক্ষুরস। সাংসারিক ভোগসুখ, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সমস্ত পিষে ফেলে তবে সে রস নিঙ্‌ড়ে নিতে হয়। ক্রমোন্নতির বিধানে আজ আমরা ঠিক সেখানে বসে নেই। আমাদের ইংরেজী শিক্ষায় 'এক্‌লেক্‌টিক্‌' মন ইউরোপীয় বৈশ্যত্বের সঙ্গেও রসতত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছে। আফিস, আদালত, সেয়ার মার্কেট, খবরের কাগজ, এ সব বাহাল রেখেই আমরা ও-রস ভোগ কর্‌ছি। অর্থাৎ ও-রস এখন আর ইক্ষুদণ্ডে বদ্ধ নেই, পেটেণ্ট করে' বোতলে পোরা হয়েছে। দিনের কাজের শেষে, কি ছুটির দিনে, খুব সুখে ও সহজে ওকে ঢেলে সম্ভোগ করা চলে। প্রাচীন হিন্দুর পক্ষ নিলে এ 'সমন্বয়ের' সঙ্গে প্রমথ বাবুকে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বর্ণসঙ্করের বিরুদ্ধ হলেও আধুনিক বিজ্ঞান নাকি তার সপক্ষ। সুতরাং এ যুদ্ধ জেতাও সহজ হবে না। মোট কথা প্রাচীন হিন্দুয়ানীর যুদ্ধ লড়্‌তে হলে, প্রাচীন হিন্দুমনের কাঠিন্য ও বীর্য্যের প্রয়োজন হবে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর মনে ও গুণ আছে বলেই জানি। সুতরাং তিনি এতে সাহসী হলেও হতে পারেন।

আমার কথা ফুরোয় নি, কিন্তু 'সবুজ পত্রের' পাতা ফুরিয়েছে। পাঠকদের যদি ধৈর্য্য থাকে, আর্য্যমনোভাবের আর দু'-একটা দিক বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

চিত্তরঞ্জন।

——:০:——

চিত্তরঞ্জন দাসের পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই আমাকে তাঁর সম্বন্ধে আমার মতামত নানা ইংরাজী ও বাঙলা কাগজে অল্পবিস্তর প্রকাশ করতে হয়েছে। এখন সেই সব লেখা পড়ে দেখছি যে, আত্মশক্তিতে তাঁর বিষয় যে দু-কথা বলি, সেই কথাই আমার মনের খাঁটি কথা। আর আমার বিশ্বাস সে দু-কথা সত্য কথা এবং চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে সার কথা। এই বিশ্বাসের বলেই আমি সবুজ পত্রে সে দু-কথা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"আত্মশক্তি সম্পাদকের অনুরোধ,—দেশবন্ধুর বিষয়ে আমাকে দু'কথা বলতে হবে।

সে অনুরোধ শিরোধার্য্য করে আমি তাঁর বিষয়ে শুধু দু কথাই বলব।

উপনিষদের ঋষিরা বলে গেছেন "অল্পে সুখ নেই"। আমরা বেশির ভাগ লোক কিন্তু অল্পেতেই সন্তুষ্ট থাকি।

অপরপক্ষে চিত্তরঞ্জনের কখনই অল্পে মনস্তুষ্টি হত না। অল্পেতে সন্তুষ্ট হওয়া ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন উপনিষদ্‌কারদের সহজ শিষ্য। কি-ধন, কি-মান, কি-পদ, কি-সম্পদ, কি-ক্ষমতা, কি-প্রভুত্ব, কি-ভোগ, কি-ত্যাগ, কোন বিষয়ে তিনি

স্বল্পের সাধনা কখনই করেন নি,—নিজের জন্যও নয়, দেশের জন্যও নয়।

মহাভারতের একটি শ্লোকে বলে :—

স্বপূরা-বৈ কুনদিকা স্বপুরো মুষিকাঞ্জলিঃ।
স্বসন্তোষঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনৈব তুষ্যতি॥

অর্থাৎ কাপুরুষেরাই স্বল্পে সন্তুষ্ট হয়, যেমন অল্পজলে কুনদী পূর্ণ হয়—অল্পেতেই মুষিকাঞ্জলি ভরে ওঠে।

এ সব শাস্ত্রীয় নিন্দাবাদ সত্ত্বেও আমরা অধিকাংশ লোক যে মুষিকাঞ্জলিতেই সন্তুষ্ট থাকি তার কারণ, আমরা আমাদের অঞ্জলীর মাপ জানি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের শক্তিরও সীমা জানি। সাধারণ লোকের অন্তরে আর যে শক্তিই থাক্, আত্মশক্তি নেই। চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে যে শক্তির পরিচয় পেয়ে বাঙ্গালী জাতি মুগ্ধ হয়েছে, সেই অনন্যসাধারণ শক্তির নাম আত্মশক্তি। আত্মশক্তি জিনিষটে কি?—বুদ্ধিবলও নয়, হৃদয়বলও নয়, মনোবলও নয়, এমন কি এ তিনের সন্নিপাতজ শক্তিও নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, হৃদয়বল বুদ্ধিবলকে খর্ব্ব করে,—বুদ্ধিবল ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে। মানুষের আত্মশক্তি হচ্ছে সেই জাতীয় শক্তি, যার দেখা পেলে আমরা চিনতে পারি, যদিচ মুখে তার পরিচয় দিতে পারিনে। দেশের লোক একমনে চিত্তরঞ্জনকে যে অসাধারণ লোক বলে মেনে নিয়েছেন, তার কারণ দেশের লোক অন্তরের অন্তরে অনুভব করছেন যে তাঁর সকল কাজ সকল কথার মূলে ছিল আত্মশক্তি। অর্থাৎ সেই শক্তি, যা দেশকাল অবস্থার দ্বারা সৃষ্টও নয়, সম্পূর্ণ নিয়মিতও নয়, কিন্তু

সকল প্রকার বাহ্য কারণের অতিরিক্ত। পুরাকালে সংস্কৃত ভাষায় এ শক্তির নাম ছিল ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানতেন যে এ হচ্ছে একপ্রকার লোকোত্তর শক্তি।”

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্ব্বের ১৩৩শ অধ্যায় হতে উদ্ধৃত। এ হচ্ছে সৌবীররাজ মহিষী বিদুলার কথা। উক্ত অধ্যায়ে বিদুলার আরও অনেক কথা আছে, যা চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাটে। যশস্বিনী ও দীর্ঘদর্শিনী বিদুলা বলেছেন যে,—

যস্য বৃত্তং ন জল্পন্তি মানবা মহদদ্ভুতম।
রাশিবর্দ্ধণ মাত্রং স নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান॥

অর্থাৎ,

লোকে যার মহদদ্ভুত চরিত্রের জল্পনা না করে, সে ব্যক্তি স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়, তার অস্তিত্ব সুধু লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য।— চিত্তরঞ্জন যে এ শ্রেণীর লোক ছিলেন না, তার প্রমাণ দেশসুদ্ধ লোক আজ তাঁর মহদদ্ভুত চরিত্রের বিষয় জল্পনা করছে। বিদুলা আরও বলেন যে—

“মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয় ন তু ধূমায়িতং চিরম”

অধিকাংশ লোকের মন যেখানে ধোঁয়ায়, চিত্তরঞ্জনের মন সেখানে জ্বলে উঠ্‌ত। এই কারণেই তিনি দেশে বিদেশে লোকচক্ষু আকর্ষণ করেছেন। সুধু তাই নয়, লোকসমাজ যে সমস্বরে চিত্তরঞ্জনের গুণগান করছে, তার কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে, তাঁর প্রকৃতির লোক এ যুগে একান্ত দুর্ল্লভ। বিদুলার আর একটি কথা উদ্ধৃত করছি। তিনি বলছেন যে—

শ্রুতেন তপসা বাপি শ্রীয়া বা বিক্রমেন বা।
জনান্ যোঽভিভবত্যন্যান্ কর্ম্মনা হি স বৈ পুমান্॥

অর্থাৎ,

"যে মানব বিদ্যা, তপস্যা, ধনসম্পত্তি, অথবা বিক্রমের দ্বারা সকলকে অতিক্রম করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ।"

দেশের লোক চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে এই অসামান্য পৌরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করেই এত চমৎকৃত হয়েছে, কারণ আমরা জানি যে, বেশির ভাগ মানব শুধু রাশিবর্দ্ধক মাত্র।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অতীত।

সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না নিঃশেষ অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান;—
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি,
কোন্ সুদূরের বাণী
তার মাঝে গুপ্ত থাকে, কি বলে সে কে বুঝিতে পারে।
যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
জড়ায় অশ্রুর বাষ্পজাল;
অতীতের সূর্য্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে'
মৃত্যুর ঐশ্বর্য্য দেয় ঢেলে',
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল।
তাই বসন্তের ফুল,
নাম ভুলে যাওয়া
প্রেয়সীর নিঃশ্বাসের হাওয়া
যুগান্তর-সাগরের দ্বীপান্তর হ'তে বহে আনে;
যেন কি অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে
মিলনের রাতে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

প্রভাতী।

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয় কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি',
হে কালো কাজল আঁখি॥

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তার বেণু।
বলে, "এসো, এসো, লও খুঁজে লও মোরে,
মধু সঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ করে,
এসো এ বক্ষমাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে॥

দেখ চেয়ে কোন্ উতলা পবন বেগে
সুরের আঘাত লেগে'
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কি যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হের কি আশায় মাতি
আছে অঞ্জলি পাতি'।

হের গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী,
অরুণ পক্ষ প্রসারি' সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হতে নাহি জানি ॥

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
এখনো তোমার সময় আসিল না কি ?
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ
পাওনি সে সংবাদ ?
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা
দিকে দিকে আজি পাওনি কি সে বারতা ?
শোনোনি কি গাহে পাখী,
হে কালো কাজল আঁখি ?
শিশির শিহরা পল্লব ঝলমল,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল,
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি ॥

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

একদা।

জীবন-মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি,
সেখানে মিলেছিনু সময়-হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলেছি আজি একা ভেসে
কোথা যে কতদূর দেশে,—
তরণী দুলিতেছে ঝড়ে;
এখন কেন মনে পড়ে
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি',
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি॥

সেখানে বসেছিনু আপনা-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে,
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া ওঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুসি ওঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
তারায় হল তারাময়,

প্রাণের নিঃশ্বাস কি মহাবেগে
ছুটিছে দশদিকগামী,
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি ॥

বিজনে বসেছিনু আকাশে চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে ।
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখি পাতে ।
সে দিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন খানে,
বিশ্ব-হৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,
কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফোটে দিনযামী
বুঝিনু, যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি ॥

বুঝিনু কি আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে,
কেন যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে ।

অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি ;
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে ;
রজনী কি খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়কামী
বুঝিনু, যবে দোঁহে পরাণপণে
খেলিনু তুমি আর আমি ॥

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পত্র।

সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনি সবুজ পত্র আবার প্রকাশ করছেন শুনে সুখী হলুম। সবুজ পত্রের কাছে যুবক সম্প্রদায় সকলেই ঋণী, বিশেষ করে এই আমাদের ত্রিশ বছরের দল। যখন প্রথম সবুজ পত্র বের হল, তখন আমরা কলেজে প্রবেশ করেছি, জ্ঞানের ভিখারী, বইয়ের পর বই পড়ি। কিন্তু সে সব বই ইংরেজী ভাষায় লিখিত হলেও এক নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত। কোন-কিছুর তোয়াক্কা না রাখাই সে সব বইয়ের ভঙ্গী। আবার বয়সের ধর্ম্মে আমাদের ভাবনাগুলিও তখন পাহাড়ের ঝরনার মতন প্রচলিত সংস্কারগুলিকে ডিঙ্গিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের ভাবধারার আদিতে যে শক্তিই থাক না কেন, তার শিরে ছিল ঘন কুয়াসা। সে কুয়াসা ভেদ করার শক্তি আমাদের ছিল না বলেই আমরা প্রত্যেকেই সেই ভাবধারার পাদদেশে এক কুসুমকানন রচনা করেছিলাম। আপনার দলের লেখা সে কুয়াসা নষ্ট করে দেয়, তাই সবুজ পত্রের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কুয়াসা দূর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখি যে, কুসুমকাননও নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমে এ অপচয়ে আমরা দুঃখিত হলুম। তারপর যখন বুঝলুম যে, ঝরনা নদীতে আশ্রয় নিয়েছে, আর সে নদী দেশের মাটীকে উর্ব্বর করেছে, তখন এই বুঝে আর আনন্দের সীমা রইল না যে, স্বাধীনতার বেগ নিষ্কাম এবং উদ্দেশ্যবিহীন হলেও পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্যপূর্ণ। রবি বাবু আমাদের সমাজকে অচলায়তন বলেছেন—সেটি বোধহয়

অন্তের গড়া, চাই কি তাকে অসংস্কৃত মনের বেষ্টনও বলা যেতে পারে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা মার্জ্জিত বুদ্ধিরও একটা আবেস্টন আছে—তার বাঁধন আরো শক্ত, আরো অজ্ঞানিতভাবে নিবিড়। আপনি এবং আপনার দল কোন উপদেশ না দিয়ে আমাদের ঐ কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন বলে আমরা আজ খানিকটা মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছি। বর্ত্তমানে দেখছি যুবকদের মনে সমাজ-বন্ধন, ও ইংরেজী বুলির দাসত্ববন্ধন ছাড়া রাজ-নৈতিক ভাবপ্রবণতার এক নতুন বন্ধন এসে পড়েছে। সমাজ-বন্ধন জীবন যাত্রার পক্ষে দরকারী, মনের কাছে নয়; ইংরেজী বুলির দাস হলে হয়ত নেতা হওয়া যায়, কিন্তু মন স্বাধীন হয় না। ভাবপ্রবণতার সাহায্যে দেশকে নাড়া দেওয়া যায় শুনেছি। নাড়া দেওয়া এবং নড়ে যাওয়া, এ দুটি মানুষের পক্ষে চরম কথা নয়। গন্ধমাদনের জীবজন্তুরা হনুমানের কাঁধে নাড়া খেয়ে জেগে উঠে যে মানুষ হয়ে উঠেছিল, এ কথা রামায়ণে প্রকাশ নেই। স্বরাজ, ত্যাগ-ধর্ম্ম, অহিংসা, অসহযোগ, দাস-মনোভাব, প্রভৃতি ধরতাই বুলির সাহায্যে মন কখনও মুক্ত হবে না। অতএব প্রায় ১৫ বছর আগে যে সমস্যা আমাদের ছিল, তা এখনও রয়েছে, বরং তার গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছে। সবুজ পত্র তখন সে সমস্যা-সমাধানে তৎপর হয়েছিল, এবং অন্ততঃ জনকয়েকের পক্ষে সমাধান করেও ছিল—স্বাধীনতার অমৃত বণ্টন করে। আমরা আশা করছি সবুজ পত্র এখনও যুবকবৃন্দের মন থেকে কথার নেশা আবার ঘুচিয়ে দেবে।

আশাও করছি, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হচ্ছে যদি সবুজ পত্র "ভূর্জ্জ" পত্রে পরিণত হয়ে থাকে। সেই জন্য আমরা প্রথম সংখ্যা পড়বার

জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছি। আপনাকে গোড়ায় বলে রাখা ভাল যে, নিম্নোক্ত লক্ষণ দুটি সবুজ পত্রে প্রকাশ পেলে, আমরা আপনাদের পত্রখানিকে অন্যান্য বাজে পত্রিকার সঙ্গে ওজন-দরে বাজারে ছেড়ে দেব।

(১) কি কাজ করতে হবে, তার প্রোগ্রাম তৈরীকরণ।

(২) সমাজ-মন, জাতীয় মন, দলের মন বোলে একটি নতুন পদার্থে বিশ্বাস করা এবং তাকে প্রশ্রয় দেওয়া।

কাজ আমরা না করে থাকতেই পারি না, কিন্তু কাজের চেয়ে কি মনোভাবে কাজ করি, সেইটেই আসল কথা—এই অভিজ্ঞতা আমরা অর্জ্জন করেছি। অর্থাৎ মন তৈরী আগে দরকার। মন তৈরী হওয়ার মানে মনের ধর্ম্ম বোঝা। সে ধর্ম্ম হচ্ছে স্বাধীনতা। মনের ধর্ম্ম বোঝার অর্থাৎ স্বাধীন হওয়ার গোড়ার কথা এবং উপায় হচ্ছে আলোচনা, বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্য। প্রবৃত্তিগুলি বুদ্ধিছাড়া নয়, যখনই জোর কোরে বুদ্ধিকে প্রবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করি, তখনই আলোচনা abstraction-এ পরিণত হয়। বুদ্ধির সাথে প্রবৃত্তির সম্বন্ধ মানলেই আলোচনা কার্য্যকরী হয়। তথাকথিত শব্দ-বুদ্ধির সাহায্যে জোর প্রোগ্রাম তৈরী হয়, কাজ হয় না। মন শুধু তা'তে স্বপন্থা হারায়, কথার কুয়াসার ভিতর। কথা এবং কার্য্যের অসহযোগ হয় তখনই, যখন পণ্ডিতী বুদ্ধির সাহায্যে কথা কর্ম্মচ্যুত এবং কার্য্য বুদ্ধিচ্যুত হয়ে পড়ে। সেই জন্য সম্পাদক মহাশয়, আপনি দয়া কোরে পণ্ডিতী তর্কের প্রশ্রয় দেবেন না, এবং প্রোগ্রামসমূহকে দূরে পরিহার করবেন—এই আমাদের অনুরোধ। বছর চারেক মাষ্টারী করে দেখেছি যে, পণ্ডিতমূর্খই ভারতের সব চেয়ে অপকারী জীব,

এবং প্রোগ্রাম তৈরী করাই সব চেয়ে বৃথা কাজ। কারণ সেটা কাজও নয়, কথাও নয়। মুখে আমরা যাই বলি না কেন, এই মাষ্টারদের এবং সমাজ-সংস্কারকদের ধারণা এই যে, দেশোন্নতি করা একটি ইমারৎ গড়ারই মতন কাজ, অর্থাৎ ইঁটের ওপর ইঁট সাজিয়ে যাওয়া, mechanics-এর নিয়ম অনুসারে। নিউটন সাহেব অনেক খাঁটি কথা বোলে গিয়েছেন, সত্য। সভ্যতা যদি মনোরাজ্যের বস্তু হয়, তাহলে অবশ্য নিউটনের নিয়মগুলিকে খাটাবার চেষ্টা বৃথা। আমরা একটি মনের ওপর আর একটি মনের প্রভাব কি তা জানি নে, উন্নতি এবং অবনতি কি পদার্থ তা জানি নে, তবে তাদের লক্ষণগুলিকে চিনতে শিখেছি। যদিও আজকালকার মনোস্তত্ত্ববিদেরা সে লক্ষণ গুলিকে অঙ্কের নিয়মে ফেলতে তৎপর হয়েছেন, তথাপি Behaviourism সম্বন্ধে যে কেউ পড়েছেন, তিনিই জানেন সে চেষ্টা কতদূর ফলবতী হয়েছে। অঙ্কের হাত থেকে সমাজতত্ত্ব উদ্ধার করা একটি মহৎ কাজ, এই আমার বিশ্বাস,—কেননা সব সময়ে হিসেব করা দরকারী কাজ হলেও, সেটি বেণে বুদ্ধির পরিচায়ক। সম্পাদক মশাই, শুনেছি আপনি বেণে বুদ্ধির বিরোধী, তাই আপনাকে প্রোগ্রাম না বাঁধতে অনুরোধ করছি।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে, নতুন সবুজ পত্রের কোন ছত্রে যেন সমাজ-মন, জাতীয়-মন ইত্যাদি কথা না থাকে, এবং একমাত্র ব্যক্তিগত মন ছাড়া আর কোন মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস প্রকাশ না পায়। যখনই দেখেছি কি শুনেছি State কিম্বা নেতারা লোকদিগকে উৎসাহিত করেছেন অতিমানুষিক মনের দোহাই দিয়ে, তখনই তার ফলে সাধারণ লোকেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, হয় অন্য লোকের সঙ্গে,

নয় নিজেদের দেশের ভিন্ন মতাবলম্বীর সঙ্গে। কোন সমষ্টির মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসের পূর্ব্বোক্ত কারণ ছাড়া আরো অন্য কারণ আছে। ও পদার্থ হয় যোগ নয় বিয়োগে তৈরী। মনের যোগবিয়োগ হয় না, জড় পদার্থেরই হয়। কেউ কেউ বলেন, একত্র থাকার ফলে একটি মন ও আর একটি মনের সংমিশ্রণে নতুন একটি মনের সৃষ্টি হয়। নতুন মনটিকে কিন্তু শাসকের দল ছাড়া আর কেউ চিনতে পারে না। পরের কাছে আত্মসমর্পণ করা মনের ধর্ম্ম নয়, তবে জোর কোরে আত্মসমর্পণ করান শাসক-ধর্ম্ম বটে। একত্র বাসে মন যে এক হয়ে যায় না, এ প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তিই জানেন। হয় যা, তার নাম একটি tradition। সেটি বাইরের জিনিষ, তার ক্ষমতা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার মতনই কার্য্যকরী। এবং তার ফল নির্ভর করে তার নিজের শক্তির উপর নয়, ব্যক্তির তা ব্যবহার করবার ইচ্ছা এবং ক্ষমতার উপর। সমাজ-মন বোলে কোন পদার্থ নেই, যা আছে সেটি ব্যক্তির মনের মধ্যে একটি বিশ্বাসমাত্র। সে বিশ্বাস mechanical নিয়ম অনুসারে সৃষ্ট একটি analogy মাত্র। Analogy-কে সত্যের রূপ দিলে সত্যের অপমান করা হয়। সত্য হচ্ছে ব্যক্তি। আমি ইংরেজী ব্যক্তি-তন্ত্রতার কথা বলছি না। সামাজিক মনের উপকারীতা মূর্খ ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু কেবল মূর্খরাই সমাজ-মনের অস্তিত্ব মানে। সমাজকে কেটে বেরতে হবে ব্যক্তির, এই হচ্ছে আসল কথা।

সম্পাদক মশাই, পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আপনারই পুরাতন সবুজ পত্রের কথা। আপনাকে আপনার কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে সাধারণে হয়ত সন্দেহ করতে পারে যে,

পুরাতন সবুজ পত্রের সঙ্গে নতুন সবুজ পত্রের কোন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নেই। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মন্ত্র আপনাকে অসহযোগ আন্দোলনের বাইরে দাঁড় করিয়েছিল, সে মূলমন্ত্র আশা করি আজও সবুজ পত্রের শক্তি সঞ্চার করবে।

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্য:—

শ্রীমান ধূর্জ্জটীপ্রসাদের চিঠি পড়ে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রফেসারি করতে গিয়ে তিনি অসংখ্য প্রফেসারের অসংখ্য বই পড়তে বাধ্য হয়েছেন, ফলে তাঁর অন্তরাত্মা পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। শ্রীমান সম্প্রতি ইংরাজী ভাষায় Personality নামক যে নাতিহ্রস্ব কেতাব লিখেছেন, তার শুধু পাতা উল্টে গেলেই দেখা যায় যে. তাঁকে ইতিমধ্যেই এক লাইব্রেরী প্রফেসারী পাণ্ডিত্য গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। এর ফলে তাঁর যে পাণ্ডিত্যে অরুচি হয়েছে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সবুজ পত্র পণ্ডিতী কাগজ হবে না, তার কারণ আমরা পণ্ডিত নই, এবং আমাদের শরীরে তাদৃশ পাণ্ডিত্যভক্তিও নেই। যেটুকু ছিল, ইউরোপের গতযুদ্ধে সেটুকু নষ্ট করেছে। উক্ত যুদ্ধ হাতেকলমে প্রমাণ করে দিয়েছে যে. ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সকল কথাই সমান মিছে। আর ইউরোপের যে সর্ব্বনাশ ঘটেছে, তার মূলে ছিল পাণ্ডিত্যের প্ররোচনা ও উত্তেজনা।

সম্পাদক।

গত হিন্দুসভা।

——:০:——

পৃথিবীতে প্রতি যুগে প্রতি জাত একটা-না-একটা মহা আবিষ্কার করে বসে। তাই নৈসর্গিক নিয়মে আমাদের জাতও এ যুগে একটা মস্ত গুপ্ত সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে আবিষ্কার হচ্ছে এই যে, হিন্দু মুসলমান এই দুই জাত মিলে মিশে এক না হলে আমরা একজাত, ভাষান্তরে nation হব না। এ আবিষ্কারকে মহা আবিষ্কার বলছি এই কারণে যে, এটি হচ্ছে সেই জাতীয় আবিষ্কার যা বালক ও বৃদ্ধ উভয়েই প্রত্যক্ষ করতে পারে। সকালে ঘুম ভাঙবার পর চোখ মেলা মাত্র আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আবিষ্কার করে যে, আকাশে সূর্য্য উঠেছে। আমাদের এই নব আবিষ্কার পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারের অনুরূপ। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আমাদের জাতির পলিটিকাল ঘুম ভেঙেছে, অথবা ভাঙছে।

আবিষ্কার অবশ্য প্রথমে করেছেন পলিটিসিয়ানরা, তবে যেহেতু ভারতবর্ষে পলিটিসিয়ান ছাড়া আর মানুষ নেই,—বাদবাকী সকলে "মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি"—সে কারণ এই পলিটিসিয়ানদের আবিষ্কার-কেই আমি জাতীয় আবিষ্কার বলছি।

এই মহা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই পলিটিসিয়ানদের মাথায় এক মহা সমস্যা উপস্থিত হল। যা না হলে হবে না, তা কি করে করা যাবে? শেষটা অনেক মাথা ঘামিয়ে পলিটিসিয়ানরা স্থির করলেন

যে, এ হচ্ছে ছেরেফ্ সংখ্যার কথা। সরকার এ দেশে যদি আদম স্নুমারী না করতেন ত, এ সমস্যা উঠ্‌তই না। অমনি সংখ্যা সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করবার জন্য কংগ্রেস আঁক কষতে বসে গেল। কিন্তু হাজার কষাকষি করেও পলিটিসিয়ানরা এ সমস্যার মীমাংসা কিছুতেই করতে পারলেন না। কারণ কংগ্রেস দেখতে পেলে যে, পাটি-গণিতের হিসেবে, এক থেকে এক বিয়োগ করলে হয় শূন্য, আর একে একে যোগ দিলে হয় দুই। স্নুতরাং এ দুয়ের যোগ বিয়োগের ফলে এক কিছুতেই হয় না। তার পর কংগ্রেস গেল জ্যামিতির কাছে। ও শাস্ত্র দেখিয়ে দিলে যে, এ সমস্যার একমাত্র মীমাংসা হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের parallel lines-য়ে চলা। কিন্তু এ মীমাংসা কংগ্রেস গ্রাহ্য করতে পারলে না, কেননা ও দুই সমান্তরাল সরল রেখার মিলন হয় অসীমের দেশে, ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে they meet in the infinite। কিন্তু কংগ্রেস চেয়েছিল ছ-মাসে স্বরাজ।

একমাত্র যে শাস্ত্র ওর মীমাংসা করে দিতে পারত, কংগ্রেস সে শাস্ত্রের অর্থাৎ algebra-র কাছ দিয়েও ঘেঁষ্‌লে না। পূর্ব্বোক্ত দুইকে এক করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, $a+b=c$ করা, কিন্তু তাতে কেউ রাজী হয় না; aও b-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে c হতে চায় না, bও a-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে c হতে চায় না। এ দেশের ইংরাজীপড়া মহা পেট্রিয়টদের মাথায় এ সোজা কথাটা কিছুতেই ঢুকল না যে, nation শব্দের মানে হচ্ছে সেই c জাত, যার ভিতর a ও b মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

অগত্যা কংগ্রেসওয়ালা পলিটিসিয়ানরা Science ছেড়ে Art-এর শরণাপন্ন হলেন, অর্থাৎ তাঁরা বসে গেলেন হাতেকলমে এ মিলনের

ধ্যানমূর্ত্তি গড়তে। শেষটা তাঁরা দেখতে পেলেন যে, তাঁরা শিব গড়তে বাঁদর গড়েছেন।

ফলে হিন্দুরা এখন A হতে চাচ্ছে। এই বাসনা থেকেই জন্মলাভ করেছে হিন্দু মহাসভা। এই হিন্দুসভার আমি বিশেষ পক্ষপাতী, কারণ হিন্দু জাতের প্রতি আমার প্রাণের টান আছে, আর হিন্দুসভ্যতার প্রতি আমার মনের টান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দু-সভার সংগঠন দেখে আমি যেমন উৎফুল্ল হই, আবার তার চালচলন দেখে তেমনি বেকুব বনে যাই। আমি ও সভার সভ্যদের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝতে পারিনে যে, সে সব কথা হিন্দু সভ্যতার কথা, কি হিন্দু অসভ্যতার কথা। এ কথা শুনে চমকে উঠবেন না। সকল সভ্যতারই গোড়ায় অনেকটা অসভ্যতা থাকে। হিন্দিতে একটা প্রবচন আছে—চিরাগ্‌কো নীচে আঁধেরা। এই উপরের আলোর নামই সভ্যতা, আর তার নিম্নস্থ অন্ধকারের নাম অসভ্যতা। অবশ্য সমাজমাত্রেই আলোছায়া দিয়ে গড়া, কিন্তু মন জিনিষটে ওর ছায়া বাদ দিয়ে আলোটাই আত্মসাৎ করতে ভালবাসে; হাঁস যেমন নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ করে। আর মন যে হাঁস, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,—কারণ যার চরম মন, তাকে আমরা পরমহংস বলি।

হিন্দুসভা যে কলকাতায় কেন এল, তার একটু কারণ আছে। এই হিন্দু মুসলমান সমস্যাটা ভারতব্যাপী হলেও, সর্ব্বত্র এর প্রকোপ সমান ভীষণ নয়। এ বৎসর মা শীতলার অনুগ্রহ সমগ্র কলকাতা সহরটার উপর হলেও, সে অনুগ্রহ মারাত্মকরকম হয়েছে এক নম্বর ও চার নম্বর ডিষ্ট্রিক্টে, অর্থাৎ এ সহরের উত্তর ও দক্ষিণ মুড়োয়। তেমনি হিন্দু মুসলমান সমস্যাটা বিশেষ করে ঘনিয়ে উঠেছে, শুধু

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলে,—পাঞ্জাবে ও বাঙলায়। তাই হিন্দু উত্তরপশ্চিম হিন্দু দক্ষিণপূর্ব্বের কোলে এসে পড়েছিল। আসল এ সমস্যাটা হচ্ছে চিরকেলে উত্তরাপথেরই সমস্যা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উত্তরাপথে এ সমস্যাটা হচ্ছে মামুলি, আর তা চণ্ডিদাসের পীরিতি বেয়াধির মত থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠে, জ্বালার নাহিক ওর। দক্ষিণাপথের সমস্যা স্বতন্ত্র, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণশূদ্রের মধ্যে, বর বড় কি কণে বড়, এরই মামলা।

হিন্দুসভা কিন্তু বাঙলায় এসে দেখলেন যে, এ দেশে তার এক পরিপন্থী সভা রয়েছে, যার নাম ব্রাহ্মণ-সভা। সে সভা হিন্দুসভাকে অস্পৃশ্য বলেছে। ফলে বাঙালীরা নাকি হিন্দুসভাকে বয়কট করেছে। এ কথা শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়েছি, কেননা বাঙালী যে ব্রাহ্মণ-সভার হুকুমের দাস, এ জ্ঞান আমার ছিল না। এ দেশে যে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব নেই, তার কারণ বাঙলায় ব্রাহ্মণসভা থাক্‌তে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ নেই। বাঙলাদেশে অবশ্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত নামক এক দল মহাব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্তু তারা আছে শুধু বিদায় নেবার জন্য। বাঙালীরা যে হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেনি, তার কারণ বাঙলায় হিন্দু নেই। যে কটি ছিল তারা সব একদম Indian হয়ে গেছে।

সে যাই হোক, দেখা যাক্ হিন্দু-সভা কলকাতায় কি করে গেলেন। সে সভা করেছে কতকগুলি সংকল্প। সে সংকল্পগুলির চেহারা প্রথমে দেখে মনে একটু খট্‌কা লাগে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, সভা যা করেছে তা করা ছাড়া তার উপায়ান্তর ছিল না। হিন্দুর হিঁদুয়ানি বজায় রেখেই ত সভা তার সভ্যতার পরিচয় দেবে।

অস্পৃশ্য জাতদের যে উন্নতি করতে হবে, এ বিষয়ে সকলেই এক

মত, অপরপক্ষে অস্পৃশ্যদের যে অস্পৃশ্য রাখতে হবে, এ হচ্ছে হিন্দু মত। অস্পৃশ্যতা দূর করলে হিন্দু সমাজ ত আর হিন্দু সমাজ থাকে না; অস্পৃশ্যতাই যে হিন্দু সমাজের প্রাণ, তা একটু ভেবে দেখলেই স্পষ্ট চোখে পড়ে। আমাদের সমাজে হরেকরকমের অস্পৃশ্যতা আছে, যথা—আমরা কোনও কোনও জাতের দেহ স্পর্শ করিনে; আবার যে জাতের দেহ স্পর্শ করি তার জল স্পর্শ করিনে; আবার যাদের দেহ ও জল দুই স্পর্শ করি, তাদের অন্নস্পর্শ করিনে; আবার যাদের অন্ন স্পর্শ করি তাদেরও হাতে রুটি খাই, ভাত খাইনে। মহাত্মা গান্ধী যে অস্পৃশ্য বলতে ইতর জাত বোঝেন, এটি তাঁর মহা ভুল। আমরা অপরকে ছুঁলে আমাদের জাত যায়, আর অপরে আমাদের ছুঁলেও আমাদের জাত যায়। সুতরাং আমরা জাতে যে যত বড়, সে তত অস্পৃশ্য। আমাদের ভিতর যার জাত যত ঠুন্‌কো—তার জাত তত টঙ্ক।

অস্পৃশ্যতা দূর করলে হিন্দুর জাত মারা যায়, আর সমাজের পতিত উদ্ধার না করলে হিন্দুজাতি মারা যায়। এই উভয় সঙ্কটের ভিতর থেকে বেরবার হিন্দুসভা একটি অপূর্ব্ব উপায় বার করেছেন। তাই প্রথম সংকল্প হয়েছে এই যে, অস্পৃশ্যদের অস্পৃশ্য রেখে, পতিত উত্থিত করতে হবে। পতিতদের পিপাসা দূর করতে হবে, তাই তাদের জন্য অস্পৃশ্য কূয়ো খুঁড়তে হবে। জল-পিপাসার মত তাদের জ্ঞান-পিপাসাও মেটাতে হবে; অর্থাৎ তাদের শিক্ষা দিতে হবে, তাই তাদের জন্য সব অস্পৃশ্য স্কুল বানাতে হবে। আর সে সব স্কুলে অস্পৃশ্য রাখতে হবে, একমাত্র বেদ। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন শুধু পদমরাজ জৈন। তিনি বলেন যে, এক কলের জল

যখন আমরা সবাই খাই, তখন সকলে এক কূয়োর জল কেন খাব না? তারপর বেদ যখন খৃষ্টানে পড়ছে—তখন অধিকাংশ হিন্দু তা কেন পড়তে পারবে না?—এ দুই অহিন্দু প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়।

কলের জল আর কূয়োর জল এক নয়। কূয়োর জল আতপ আর কলের জল সিদ্ধ, অতএব তা শুদ্ধ, অতএব তা সকলেই খেতে পারে। তারপর এই সিদ্ধ জল কল খুলে নিতে হয়—আর আতপ জল কূয়ো থেকে তুলে নিতে হয়। কলের জল উপর থেকে পড়ে, অতএব তা মন্দাকিনীর জল, কূয়োর জল নীচে থেকে আসে, অতএব তা ভোগবতীর জল। এ দুয়ের প্রভেদ আকাশপাতাল। স্বর্গে জাতিভেদ নেই, কিন্তু রসাতলে আছে। সুতরাং কলের জল সর্ব্ব লোকপানীয়, কিন্তু কূয়োর জল স্বধর্ম্ম অনুসারে পেয়।

তারপর যে সব খৃষ্টানেরা বেদ জানে, তারা বেদ মানে না; আর যে সব হিন্দুরা বেদ জানে না, তারাই তা মানে। দেশশুদ্ধ লোককে যদি বেদ মানাতে চাও, তাহলে দেশশুদ্ধ লোককে বেদ জানতে দিয়ো না। এ সব যুক্তির কোনও খণ্ডন নেই—কাজেই শ্রীযুক্ত পদমরাজ জৈনের আপত্তি হিন্দু-সভায় সর্ব্ব হিন্দুর সম্মতিক্রমে সকরতালি অগ্রাহ্য হয়েছে।

হিন্দু নামক ছোট হাতের aকে বড় হাতের Aতে পরিণত করতে হলে, হিন্দু সমাজের শুধু বাহ্যিক উন্নতি করা যথেষ্ট নয়, হিন্দু মাত্রের মনেরও উন্নতি করতে হবে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, অপরাপর সমাজের মত হিন্দুসমাজের ভিতর আলোও আছে, অন্ধকারও আছে। আমাদের মনের অন্ধকার দূর করবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে—

হিন্দুমনের আলো আমাদের সকলের মনের উপর ফেলা। তাই হিন্দু সভা প্রস্তাব করেছেন যে, আমাদের প্রত্যেককেই প্রতি একাদশীতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করতে হবে। এ প্রস্তাব অতি সুবিবেচিত; স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করেই এ প্রস্তাব করা হয়েছে। গীতা আমাদের একাদশীর দিনই পড়তে হবে, কারণ খালি পেটেই মানুষের মনে আধ্যাত্মিকতা ভালরকম চেগে ওঠে। তারপর আপামর চণ্ডাল সকলকেই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়তে হবে। কেননা, তা পড়লে সে সব অনধিকারীদের বেদ পড়বার লোভ আর থাকবে না। কারণ তাঁরা দেখতে পাবেন যে,—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥

এতেও যদি তাঁদের বেদ পড়বার লোভ মূলে হাবাৎ না হয়ে যায়, তাহলে সেই বেদলোভিরা একটু পরেই দেখতে পাবেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন

নির্গুণ হওয়াই যে হিন্দুর আদর্শ, তা কে না জানে; সুতরাং ভগবানের এ আদেশ আমাদের সকলেরই শিরোধার্য্য।

তবে উক্ত প্রস্তাব শুনে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, হিন্দু-সভার কর্ত্তৃপক্ষেরা হয়ত গীতাকে Bible বলে ভুল করেছেন। ইংরাজী সভ্যতার নকল সকল ক্ষেত্রে চলে না। Bible সকলেই পড়তে পারে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তাই বিলেতে Bible সকলকে পড়ান হয়। কিন্তু গীতাকে লোক-মনের "মহাপ্রসাদ" করা চলে না;

বিশেষতঃ তার দ্বিতীয় অধ্যায়কে ত নয়ই। ও বস্তু হচ্ছে ভয়ঙ্কর কড়াভোগ।

ও অধ্যায়ের প্রথম অংশ আদ্যোপান্ত Metaphysics, এবং বেজায় মাথা-বকানো Metaphysics। আমরা জাতকে জাত ঘোর আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু এতদূর দার্শনিক নই যে, ও দর্শন গলাধঃকরণ করবামাত্র সকলেই তা জীর্ণ করে ফেলতে পারব। গীতা গিলে বহু লোক যে তা জীর্ণ করতে পারে না, তার প্রমাণ তারা চব্বিশ ঘণ্টা তা উদ্গীরণ করে। এ দর্শনের বড় জোর একটি উপমা আমরা আয়ত্ব করতে পারব:—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

শুনছি গীতা যে-সে বাজারে নয়, বড় বাজারে চালানো হবে। তা যদি হয়, তাহলে বড় বাজার খুব সম্ভবত ও শ্লোকের অর্থ বুঝবে এই যে, মানুষের ইহলোক পরলোকের ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে প্রকৃতির piece-goods-এর কারবার। সে যাই হোক্, ও শ্লোক যে যত মুখে আওড়াক, কেউ তা মেনে নেবে না। কারণ নিত্য দেখা যায় যে, মানুষে দেহরূপ বাসকে কিছুতেই ত্যাগ করতে চায় না, আর ও বাস জীর্ণ হলেও যতদিন পারে ততদিন সেটিকে তালি মেরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তা যদি না করত, তাহলে ডাক্তারি বলে মনুষ্যসমাজে একটা বিদ্যে ও ব্যবসা বেরত না। ও কাপড়ের উপর মানুষের নৈসর্গিক মমতা ছাড়া, ও কাপড় ছেড়ে ফেলার আর এক অন্তরায় আছে। 'নতুন কাপড় যে পাব, সে কাপড় কিরকম হবে তা কারও জানা নেই। হিন্দুশাস্ত্রে ভয় দেখায় যে, সে কাপড়

পশুচর্ম্মও হতে পারে, সাপের খোলসও হতে পারে। সেই ভয়েই ত হিন্দুরা জন্মান্তর চায় না, চায় মোক্ষ, ভাষান্তরে নির্ব্বাণ,—অর্থাৎ ও বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মাকেও একদম পুড়িয়ে নিবিয়ে দিতে চায়।

তারপর ও অধ্যায়ের প্রথম অংশের Metaphysics-এর পিঠ পিঠ আসে দ্বিতীয় অংশের Ethics। সম্ভবত হিন্দুসভা সকলকে এই Ethics-ই এস্তেমাল করতে বলেছেন। কিন্তু ও Ethics-এর প্রতি একটু মনোযোগ করলেই দেখা যায় যে, ও ব্রাহ্মণের জন্য নয়, বৈশ্যের জন্যও নয়, শূদ্রের জন্য ত নয়ই :—

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ কথা যে আমাদের সম্বোধন করে বলেন নি, তার স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের কেউই "পরন্তপ" নই; আমরা সকলেই "পরস্তাপিত"।

ও ধর্ম্ম হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের একচেটে ধর্ম্ম, শুধু তাই নয়, যে-সে ক্ষত্রিয়কে ভগবান ও উপদেশ দেননি, দিয়েছেন একমাত্র তৃতীয় পাণ্ডবকে। যে উপদেশ অর্জ্জুনের মনের খোরাক, আমাদের পক্ষে তা strong meat—সংস্কৃতে যাকে বলে মহামাংস। ও আধ্যাত্মিক আহার আমাদের পক্ষে অতিশয় গুরুপাক। ও বস্তু পেটে যাবামাত্র আমাদের মাথায় চড়ে যাবে, আর অমনি হবে heart-failure। তারপর তৃতীয়াংশে পাই আদর্শ মানবের definition। এ অংশটি অবশ্য পাঠ্য, আমাদের leader-দের পক্ষে। তাঁদের যদি "প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা" হয়, তাহলে আমরা জাতকে জাত মনুষ্যত্বের আরেক ধাপ্ উঁচুতে উঠে যাব। নেতাদের অব্যবস্থিতচিত্ততাই আমাদের জাতকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। তাঁদের হুকুমে দুদিন আগে আমরা যাদের

সঙ্গে গলাগলি করতে প্রস্তুত হয়ে ছিলুম, তাঁরাই আবার আজ তাদের সঙ্গে দলাদলি করতে হুকুম দিচ্ছেন।

গীতার প্রদীপ থেকে আমাদের মনের সল্‌তে ধরিয়ে নেবার প্রস্তাবটা খুবই ভাল। কিন্তু আমরা তা করতে পারব, যদি আমাদের মানসিক বর্ত্তিকায় স্নেহ থাকে। অপরপক্ষে সে সল্‌তেয় যদি তেল না থাকে, আর থাকে শুধু তুলো, তাহলে গীতার প্রদীপের সংস্পর্শে ত মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব, ভাষান্তরে নির্ব্বাণ লাভ করব।

তাই আমি বলি, দেশশুদ্ধ লোককে গীতাপাঠ না করিয়ে চণ্ডীপাঠ করানো হোক। "ধনং দেহী মানং দেহী দ্বিষং জহি"—এ সব কথা সকলে বুঝতেও পারবে, ও মনের সঙ্গে সমস্বরে বলতেও পারবে। আর লালাজীরও এই হচ্ছে আসল প্রার্থনা,—অবশ্য নিজের জন্য নয়, সমগ্র জাতের জন্য। লালাজী আমাদের যুবকদের মনে বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে আনন্দ আনতে চেয়েছেন। চণ্ডীপাঠ করলে সে আনন্দও যুবকরা লাভ করবে। কেননা, পূর্ব্বোক্ত স্তোত্রের শেষে আছে, "মনোরমাং ভার্য্যাং দেহী"। আর আচামার সাধারণের এ শাস্ত্রে যে অধিকার আছে তার প্রমাণ, কথায় বলে "চণ্ডীপাঠ ও জুতো সেলাই" এক সঙ্গেই করা যায়।

হিন্দু-সভার কাছে আমার শেষ নিবেদন এই যে, aকে A করবার একটা অব্যর্থ উপায় আছে। সে উপায় হচ্ছে স্বরকে একটু পরিবর্ত্তন করা। Uকে I করতে পারলেই a, A হয়ে যাবে—আর আমরা যদি তা না করতে পারি, তাহলে আমরা সকলে 0 হব—গণিতের ভাষায় যাকে বলে শূন্য।

বীরবল।

কথা-বচন।

(১)

আজকাল শিক্ষিত সমাজ মাথা ঘামাচ্ছে, স্বরাজ নিয়ে নয়,—স্বরাজের মানে নিয়ে।

(২)

স্বরাজ যে কি তা কেউ জানে না, কিন্তু স্বরাজ যে কি নয়, তা সবাই জানে। স্বরাজের সংজ্ঞা "নেতি" "নেতি"।

(৩)

মহাত্মা গান্ধী হাত বাড়িয়েছিলেন স্বরাজ ধরতে, হাতে পেয়েছেন, স্বরাজপার্টি।

(৪)

স্বরাজ ও স্বরাজপার্টি এক জিনিষ নয়। স্বরাজপার্টি হচ্ছে স্বরাজ বানাবার কল।

(৫)

অতীতে এ কল মানুষে বানিয়েছে, ভবিষ্যতে এ কলে মানুষ বানাবে।

(৬)

কংগ্রেসের এতদিনে নাড়ীকাটা হল। চরকার সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে।

(৭)

এ সূতা ছিঁড়ে দিয়েছে এক ফুৎকারে। লর্ড বারকেনহেডের বক্তৃতার পর কংগ্রেস আর Spinning association থাকতে পারে না।

(৮)

আমাদের হাজার কথার চাইতে, ইংরাজের এক কথার মন্ত্রশক্তি বেশি। এর কারণ আমাদের কাজের কথাও পদ্য, ওদের ভাবের কথাও গদ্য।

(৯)

লর্ড বারকেনহেডের বক্তৃতায় কি আছে?—তার ভিতর আছে গর্জ্জন, নেই বর্ষণ।

(১০)

আমরা ওদের কাছে অবশ্য কিছু পাবার আশা করিনে, কিন্তু না পেলে নিরাশ হই।

(১১)

অপরের কাছে নিরাশ হলে, নিজের উপর ভরসা বাড়ে।

(১২)

ঈশ্বরে বিশ্বাস হারালেই আমরা সোঽহং হয়ে উঠি।

(১৩)

কবি আবিষ্কার করলেন "ভারত সুধুই ঘুমায়ে রয়"।

(১৪)

অমনি অকবিরা আবিষ্কার করলে,—

না জাগিলে সব ভারত ললনা।
এ ভারত আর জাগে না জাগে না॥

(১৫)

পরে দেখা গেল, এ দেশে পুরুষের ঘুম স্ত্রীলোকের চাইতে কিছু কম নয়। বরং আমাদের নাসিকাগর্জ্জন বেশি।

(১৬)

তাই এ যুগে "ললনার" জায়গায় জন-সাধারণ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(১৭)

আমরা এখন জন-সাধারণকে জাগাবার ভার অসাধারণ-জনের হাতে দিয়েছি।

(১৮)

জন-সাধারণের সঙ্গে অসাধারণ-জনের স্পষ্ট প্রভেদ এই যে, জন-সাধারণ ঘুমোয় কিন্তু স্বপ্ন দেখে না, অপরপক্ষে অসাধারণ-জন ঘুমোয় না, সুধু স্বপ্ন দেখে।

(১৯)

নিদ্রা ও স্বপ্ন, এ দুয়ের ভিতর কোন্‌টা বেশি ভাল বলা কঠিন।

(২০)

ঘুম হচ্ছে খাঁটি মাল, আর স্বপ্ন হচ্ছে মেকি জাগরণ।

(২১)

নিজে জাগা ও পরকে জাগানো এক ক্রিয়া নয়। জাগ্‌বার ও জাগাবার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

(২২)

পরকে এক দিকে জাগাতে হলে, অন্য দিকে ঘুম পাড়াতে হয়।

(২৩)

হৃদয়কে জাগাতে হলে যে মস্তিষ্ককে ঘুম পাড়াতে হয়,— এ ত পুরোনো কথা।

(২৪)

নতুন কথা এই যে, পলিটিকাল বুদ্ধিকে জাগাতে হলে ন্যায়বুদ্ধিকে ঘুম পাড়াতে হয়।

(২৫)

বাঙালীর যে পলিটিকাল বুদ্ধি নেই, তার কারণ বাঙালীর Conscience আছে; আর মারহাট্টাদের যে পলিটিকাল বুদ্ধি আছে, তার কারণ তাদের Conscience নেই।

(২৬)

যার Conscience আছে, তার Discipline নেই। সে বাগ মানে না।

(২৭)

Discipline মানে হচ্ছে উপরওয়ালার হুকুম নির্বিচারে মানা।

(২৮)

ন্যায়বুদ্ধিও বিচারবুদ্ধি, বুদ্ধিও বিচারবুদ্ধি।

(২৯)

ও দুই বুদ্ধিকে দু' হাতে চেপে দিতে পারলেই, মানুষ পুরো Disciplined হবে, অর্থাৎ ভেড়া বনে' যাবে।

(৩০)

ভেড়াকে যত সহজে চরানো যায়, অন্য কোনও জানোয়ারকে তত সহজে নয়। গরুও মাঝে মাঝে শিং বাঁকায়।

(৩১)

দ্বিজু রায় বলেছেন, "মানুষ আমরা নহিত মেষ"।

(৩২)

কবিতেই বাঙালীর মাথা খেয়েছে।

(৩৩)

আমরা যদি পলিটিকালি বড় হতে চাই, তাহলে আমাদের কায়-মনোবাক্যে প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা মানুষ নই, মনুষ্যরূপী মেষ।

(৩৪)

আমাদের বোঝা চাই যে, আমরা জাতকে জাত ভেড়া না বনে' গেলে আমাদের মধ্যে মেড়া জন্মাবে না।

(৩৫)

আর তা না জন্মালে আমাদের হয়ে লড়বে কে? আমাদের leader হবে কে?

(৩৬)

এ পরিণতি লাভ করবার জন্য অসাধ্য সাধন করতে হবে না। কে না জানে যে বাঙালী কামরূপ গেলেই ভেড়া বনে।

(৩৭)

কামরূপ কোথায়?—বাঙলার বাইরে।

(৩৮)

কামরূপ যাবার সোজা পথ কি? উড়ো পথ, ভাবের শূন্যমার্গ।

বীরবল।

নবম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সন্ন্যাসিনীর আত্মকাহিনী।

—:০:—

—মা, ও-বাড়ীর মালীর সঙ্গে দু'জন মা'জী এসেছেন।

—আচ্ছা, বস্‌তে বল, আমি যাচ্ছি।

হাতের কাজ সেরে যখন সিঁড়ির ঘরে গেলুম, তখন দেখলুম আমাদের ব্যামিশ্র গৃহসজ্জাকে লজ্জা দিয়ে দু'টি ভৈরবী একটা কৌচে বসে' আছেন। অবশ্য ভৈরবী ঠিক কা'কে বলে আমি জানিনে, তবে একপ্রকার সাধারণ ধারণা আছে যে, তাঁদের পরণে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুর, গলায় মালা এবং হাতে ত্রিশূল থাকে। উক্ত বর্ণনার সঙ্গে এঁদের আর সব বেশভূষার মিল ছিল, কেবল ত্রিশূলের বদলে হাতে ছিল চাঁদার খাতা। শুনলুম বারাণসী ধামে তাঁরা অসহায় অসুস্থ হিন্দু-বৃদ্ধাদের জীবিত-সেবা ও মৃত-সৎকারের উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম স্থাপন করেছেন, এবং খাতা খুলে দেখলুম অনেকে তাঁদের সৎকার্য্য ও সততা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সুতরাং আশ্বস্ত মনে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে ভদ্রতার খাতিরে দু'চার কথা কইতে বসলুম। বল্লুম—সেকালে বৌদ্ধদের মধ্যে শুনেছি এরকম সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মেয়েরা কাজ করত, অন্য দেশে আজও করে; কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর সে-ভাবে কাজ হয় না, অথচ তার একটা ব্যবস্থা থাকা খুব দরকার। অবশ্য অনেক বিধবা আত্মীয়-পরিবারে জীবন উৎসর্গ করেন, কিম্বা অনেক স্ত্রীলোক সেবিকারও কাজ করেন; কিন্তু সে

কাজ পুরুষের মত নিজের গ্রাসাচ্ছাদন বা পরিবার প্রতিপালনের জন্য; তোমরা যেরকম দল বেঁধে পরোপকার ব্রত নিয়েছ, সে ভাবের কাজ ত নয়। আর সকলে যদি সংসার ত্যাগ করে ত সংসারই বা চলে কি করে?—আমার কোন কথা তাঁদের মনঃপূত হলে, সন্ন্যাসিনীদ্বয় চাওয়াচাওয়ি করে' সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগলেন; পরে আমার প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের নিজের কথা বল্‌তে লাগলেন।

ক্রমে তাঁদের কথায় এত তন্ময় হয়ে পড়লুম যে, ভদ্রতা আগ্রহে এবং দু'চার কথা দীর্ঘকালব্যাপী কথোপকথনে পরিণত হল। বই আমরা পড়ি কিসের জন্য?—না নতুন ভাব, নতুন জ্ঞান, নতুন ঘটনা ও নতুন মনের সংস্পর্শ পাবার জন্য, এবং নিজের মনের প্রতিধ্বনি শোনবার জন্য,—এই ত? এই সব উপাদানই প্রচুর পরিমাণে এই নবীন সন্ন্যাসিনীর সরল বাক্যালাপের মধ্যে পেয়েছিলুম। যদিও এস্থলেও উক্ত ফর্দ্দের শেষ দফাটি সম্বন্ধে একটু সন্দেহ থাকতে পারে। তবে পরের কাছে নিজের প্রতিধ্বনি সচরাচর পাওয়া না গেলেও, পরের মনের প্রতিধ্বনি সহজেই দেওয়া যায়, যদি নিজের মনের সুর বাঁধা থাকে এবং ঠিক পর্দ্দায় আঘাত পড়ে।

দু'টি আগন্তুকই প্রায় সমবয়সী, এবং আমাদের দেশে যাকে আধাবয়সী বলে' থাকে, তাই;—যদিও কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে ঠিক বয়স বলা শক্ত। দু'জনেরই সুচেহারা, তবে একটি যেন অপেক্ষাকৃত চুপচাপ, আর একটি প্রগল্‌ভা ও প্রধানা বলে' বোধ হল। মনে করা যাক্ প্রথমার নাম আনন্দময়ী, এবং দ্বিতীয়ার শান্তি মা। সন্ন্যাসিনীর আবার নাম কি? অন্যের সঙ্গে পৃথক করবার সুবিধার্থে তাঁদের ভেক-নাম একটা মার্কা মাত্র, কয়েদীর নম্বরের মত। যদিও সে নাম

যোগানন্দের আভাসে সরস, তবু যে নামে আত্মীয়ের "ঘা দিয়ে হৃদয় মাঝে মঙ্গল আরতি বাজে", বা যে নাম কোন জীবনের নিভৃত জপ-মন্ত্র,—অর্থাৎ নাম বলতে আমরা যা বুঝি, সে পর্য্যায়ের নাম ত তাঁদের নয়। বড় জোর নিজগুণে কেউ সে নাম বিশ্ববরেণ্য করে' তোলেন, যেমন বিবেকানন্দ।

শান্তি-মা'র সঙ্গেই আমার বেশির ভাগ গল্প হল। কথায় কথায় জানলুম তাঁর বাপের বাড়ী শ্বশুর বাড়ী দুইই কাশীতে। জিজ্ঞাসা করলুম—ছেলেপিলে হয় নি ?

—হাঁ মা, তা' কি আর হয়নি ? যা' থাকতে হয়, সবই ছিল। প্রথম ছেলেটিকে কোলেও করতুম, সবই করতুম, কিন্তু কেমন যেন আপনার মনে হত না। সেটি দেড় বছরের হয়ে মারা গেল। তারপরে একটি মেয়ে হল, সেও মারা গেল। কিন্তু আমার কিছুতে সংসারে মন বস্‌ত না।

—তোমার স্বামী কিছু বল্‌তেন না ?

—বল্‌তেন বই কি। আমি যখন বলতুম সবই ত করছি, তিনি বল্‌তেন করলে কি হবে, তোমার অন্তরটা কোথায় বল দেখি ?

—তুমি কি আগে বিশেষ কোন মন্ত্র নিয়েছিলে, যা বিশেষ কোন ইষ্টদেবতাকে মানতে কেউ শিখিয়েছিল ?

—না মা, ছোটবেলা থেকেই আমার মনে কেমন একটা বৈরাগ্য হত, মনে হত এই ত শরীর, এর কিছুই থাকবে না, এই ত মানুষের পরিণাম, এ সব নিয়ে কি হবে।

—বোধহয় তোমাদের বংশে এইরকম দিকে কারো কারো ঝোঁক ছিল ?

—হাঁ মা, আমাদের বংশ সাধকের বংশ। আমার বাবা আমাকে কাছে করে' বসিয়ে পড়াতেন, বল্‌তেন মেয়েদের হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিটা এস তোমাকে শিখিয়ে দিই।

—সংস্কৃত শেখান নি?

—না, তার আর সময় হল কই? দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলাই যেটুকু হয়।

—তোমার মা কিছু বলতেন না?

—মা রাগ করতেন। ঘর সংসারের কাজ ত কিছু শিখতুম না।

সঙ্গিনী।—ঘরকন্নার কিছুই জানতেন না। আত্মীয় স্বজনে বল্‌ত—মেয়েটা দেখছি কূলে কালী দেবে। তারপরে অবশ্য সব শিখেছিলেন।

—তারপরে বিয়ে হল ত? বিয়ে ত দিতেই হবে।

—হাঁ মা, ১১ বছর বয়সে বিয়ে হল। বাপের বাড়ী যেমন সাদা-সিধে ভাবে থাকতুম, একখানি বিলিতী কাপড় পর্য্যন্ত কখনো পরি নি, এঁদের তেমনি বৃহৎ সংসার, সাহেবী চালচলন। বাড়ীতে খানসামা, কুড়িজন দাসদাসী। এত বড় সংসারের জলখাবারের ভার আমার উপর পড়ল, বুঝতেই পারেন কত ময়দা মেখে কত লুচি ভাজতে হত। কিন্তু মন আমার যে-কে-সেই। কতবার তুলসীতলায় হাত যোড় করে' ঠাকুর দেবতাকে ডেকেছি যে—হে ঠাকুর, আমার মন ভাল করে' দাও, ও সব বাজে কথা যেন মনে না আসে। ভাল কথাকে বাজে কথা বলতুম! লোকে মনে বৈরাগ্য আনবার চেষ্টা করে, আমি বৈরাগ্য তাড়াবার চেষ্টা করতুম। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। বেশ মনে আছে, দোলের দিন আমার ননদ জা'রা মিলে কত আমোদ

করেছে, আমিও চুলে পাতা লতা কেটে সেখানে গেছি, মিশেছি, স্টেজ পর্য্যন্ত হয়েছে; কিন্তু ঘরে ফিরে এসে মনে মনে বলেছি,—দু'দিনের এই সব মায়ায় কেন ভুলে রয়েছ, এই সব হাসিখেলার পিছনে সংসারের যে আসল রূপ রয়েছে, সেটা কি দেখতে পাচ্ছ না? মনে হত চিরকালই কি এরা আমাকে এই বন্ধনে বেঁধে রাখবে? প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ত।

—তারপর কি হল?

—তারপর কোলে যে সেজ ছেলে হ'ল, তার উপর সত্যিকার মায়া পড়ল। সে আবার অতিরিক্ত ভালবাসা—একেবারে বিশ্ব-বিনিময়। সে ছেলেটিও তেমনি ছিল। তিন বছর বয়স হয়েছিল, তার মধ্যে নিজেও মাছ খেত না, আমাদেরও খেতে বারণ করত। ঠাকুর দেখলেই প্রণাম করত। নাম ছিল শচীশ। তার শেষ অসুখের সময় আমি প্রাণপণ সেবা করেছিলুম, কিন্তু রাখতে পারলুম না। সে সময় আমার চোখের সামনে থেকে কি-একটা পরদা সরে' গেল, জগৎকে অন্যরকম দেখলুম, যেন এ জগৎ নয়, আর এক জগৎ। তখন পেটে আর এক ছেলে ছিল, কিন্তু সে যে কবে হল, কি হল, কে দেখ্‌লে, সে সব আমি কিছুই জানিনে।

—তখন কি করতে?

—কি আর করব, পড়ে' থাকতুম, শুধু সাধু সন্ন্যাসী কেউ এলে উঠে বসতুম। আর একলা হলেই বিবেকের দংশন সইতুম। যেন ভিতরে ভিতরে বল্‌ছে—তুমি এই মনে করে' এই করেছিলে, এই আশা করেছিলে, কেমন, এখন কি হল, কি পেলে? মা, শোক সহ্য হয়, কিন্তু এই বিবেকের দংশন সওয়া যায় না। লোকে এরই যন্ত্রণায়

সংসার ত্যাগ করে। মনে হত যেন শুনতে শুনতে পাগল হয়ে যাব। আর শরীরও এমন হয়ে গিয়েছিল যে, ধরে ধরে চল্‌তে হত। আমার জন্যে এক দাসী রেখে দিয়েছিলেন। এমন দিন গেছে, যখন তার কাঁধে মাথা রেখেছি, তবে সে কাপড় পরিয়ে দিয়েছে, এই অবস্থা। আর সকলকে ডেকে ডেকে বলতুম—হ্যাঁগো, আমি ত ছেলেমানুষ ছিলুম, কিন্তু তোমরা ত সংসারের সবই জানতে, তোমরা কেন এই অগ্নিকুণ্ডে আমায় জেনে শুনে ফেলে দিলে ?

—তাঁরা কি বল্‌তেন ?

সঙ্গিনী। মা খুড়ি যে আস্‌ত, তাঁদেরই অমনি করে' জিজ্ঞেস করত। এতখানি চুল ছিল, আর রং আপনার ঐ সাড়ির পাড়ের মত লাল হয়ে গিয়েছিল। চোখ বের করে' যখন ঐ সব কথা বল্‌ত, তখন সকলে চুপ করে' এ ওর দিকে চাইতেন, বোধহয় মনে করতেন শোকে পাগল হয়ে গিয়েছে।

—তোমার সঙ্গে কি এঁর অনেক দিনের আলাপ ?

—হাঁ, সেই সময় থেকেই উনি যাওয়া আসা করছেন।

—তারপর ?

—এমনি ভাবে দিন যায়। কাউকে কিছু বলতুম না, চুপ করে'ই থাকতুম। একটু সুস্থ হলে একদিন ননদের বাড়ী গেলুম। সেখানে বাইরে ছেলেরা গোল করছে শুনে আমিও বেরিয়ে এলুম। দেখি জামগাছে একজন সন্ন্যাসিনী হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর তাঁর চারদিকে সকলে হাসি আহ্লাদ করছে। মা, আমি ছেলেবেলা থেকে ভিতরে ভিতরে একটা কেমন আভাস পেতুম, যেন সংসারে আমার অত্যন্ত আপনার কেউ একজন আছেন, কিন্তু স্পষ্ট কিছু বুঝতে

পারতুম না। এঁকে দেখে মনে হল, এঁকেই ত আমি ভিতরে ভিতরে চেয়েছি, এই সেই! অমনি ছুটে গিয়ে তাঁকে বল্লুম—ওগো, তোমার সঙ্গে আমায় নিয়ে চল, আমি এখানে থাক্‌ব না!

—এই সব শুনলে পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস হয়। তা তিনি কি বল্লেন?

—তিনি আর কি বলবেন, হাসতে লাগলেন। সে যে কি রূপ, সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির কথা আপনাকে কি বলব। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন কেন? এই আপনি যদি হঠাৎ আমাকে বলেন, তোমার সঙ্গে যাব,—সেইরকম আর কি। তাও কি হয়?

—তা' ত সত্যি, গৃহস্থের বউ। তবে কি করলে, কবে গেলে?

—সেদিন ত বাড়ী ফিরে গেলুম। পরদিন সকালে আমার স্বামীকে বল্লুম—আমার দীক্ষাগুরুর ওখানে যাব।

—তিনি তোমাকে যেতে দিলেন?

—হাঁ মা, তা' দিতেন। কোন জায়গায় কীর্ত্তন কি কিছু হলে তিনি নিজেই লোকজন দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন। আর এই ছ'মাস পরে আমি মুখ ফুটে একটা ইচ্ছে প্রকাশ করলুম, তা'তে তিনি বরং খুসিই হয়ে আমাকে কাপড়, জামা, চাদর গায়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। প্রথমে গুরুর বাড়ী গেলুম। যে মানুষ বল্‌তে গেলে এতদিন উঠে বস্‌তে পারি নি, সেই মানুষ বেশ উঠে হেঁটে অতটা পথ গেলুম। তারপর সোজা সেই সৌদামিনী-মা'র বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। তিনি ত আমাকে দেখে অবাক্—অ্যাঁঃ, এই কাল দেখা হ'ল, আর তুমি আজই এসেছ?

—তিনি কি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন? তোমরা কি ভৈরবী?

—না মা, আমাদের বৈদান্তিক মত, নিরামিষ আহার। তিনি আগে কারো শিষ্যা ছিলেন বটে, কিন্তু তারপরে নিজের মতেই নিজে চলতেন। তাঁর যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি উদার মন ছিল। কি যে মানুষ ছিলেন, সে বল্‌তে পারিনে। এই আশ্রমের কাজ তখন সবে তিনি আরম্ভ করেছেন। তাঁরই সঙ্কল্পিত কাজ আমরা হাতে করে' করছি।

—তাহলে তাঁর সঙ্গ বেশিদিন পাওনি?

—সাড়ে তিন বৎসর তাঁর কাছে ছিলুম। তারই মধ্যে তিনি আমাকে অনেক কাজ শিখিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম সহজ কাজ দিতেন; তাই নিয়ে বাড়ী চলে' যেতুম। বাসাবাড়ী যেখানে ছিল সেখানে বড় গোলমাল, তাই সোজা শ্বশুরবাড়ীতে ফাঁকায় চলে' গিয়ে ছাতের উপর পড়াশুনা করতুম।

—তাঁরা কি বল্‌তেন?

—বল্‌তেন ঐ দেখ ছোট বউমার আবার এক পাগলামী,—চিলে কোঠায় বসে' বসে' কি সব পড়ে! এই আধ্যাত্মিক গীতা, যা'তে সব ব্যাখ্যা আছে, আর যোগবাশিষ্ঠ, এমনি সব বই পড়তুম। সে আবার কিরকম পড়া, খাবার জন্যে ডাকতে এলে এইরকম করে' (সঙ্গিনীকে ঠেলা দিয়ে) ঠেল্লে তবে হুঁস্ হত। কিন্তু তখন নিজের পথ নিজে খুঁজে পেয়েছিলুম কিনা, তখন আবার অন্যদিকে মনও দিতে পারতুম। আমি খুব ধীর উদার ভাবে থাকতুম, পাছে কেউ বলে জ্যাঠামী করছে। কিন্তু মা, সংসারের লোক উদার ভাব ভালবাসে না।

—তা সত্যি, ছেলেমানুষ বেশি বৈরাগ্যের কথা বল্লে লোকে

জ্যাঠামোই ত বলে' থাকে। তারপর তোমার কোলের ছেলের কি হল?

—সেটা মেয়ে হয়েছিল মা, সেটাও বছরখানেক পরে মারা গেল। আমার শোকটোক কিছু হয়নি, আপনাকে সত্যি বল্‌ছি। মনে হত ঘরে ঘরে যত প্রসূতী প্রসব করছে, সকলের মধ্যেই আমি মা হয়ে রয়েছি। ছেলে মেয়ের ভাবনা কিসের?— বাগানে কত খেলা করতে আসত। আমার বরং মনে হল আমি ছুটি পেলুম। তখন স্বামীকে আবার বিয়ে করবার জন্যে ধরে' বসলুম। প্রথমে কিছুতেই রাজি হন না। ১৬ বৎসরের অভ্যাস কি সহজে ছাড়া যায়?—আমি অনেক করে' বোঝাতুম, বল্‌তুম দেখ, আমি মরে গেলে ত বিয়ে করতেই, তার চেয়ে আমি বেঁচে থাকতে থাকতে করনা, তাহলে আমি ছাড়া পাই, তোমাকেও সংসারে বসিয়ে দিয়ে যাই—আমি ত না থাকারই মধ্যে। এইরকম করে' বল্‌তে বল্‌তে শেষে একদিন যেই বিয়েতে মত দিলেন, অমনি আমি একটি ১৭ বছরের মেয়ের সঙ্গে সব ঠিকঠাক করে' ফেল্লুম।

—তাঁরা সতীনে দিতে রাজী হলেন?

—হাঁ, তাঁরা সমস্তই জানতেন কিনা। অনেক দিন থেকে দেখে শুনে তবে দিলেন।

—আর তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোক?

—তাঁরাও আপত্তি তুলেছিলেন। শ্বশুর শাশুড়ী তখন ছিলেন না, কিন্তু আমার এই শরীরের ভাসুরপো, অমুক (পশ্চিমের একটা সহরের নাম করে') জায়গার বড় সাহেব, তিনি খবর শুনে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন যেন এ বিয়ে বন্ধ করা হয়।

সঙ্গিনী।—তিনি অবশ্য ভাল মনে করে'ই বলেছিলেন যে, ছোট খুড়িমা শোকে পাগল, এ সময় তাঁর মনে কষ্ট দিয়ে বউ ঘরে আনা উচিত নয়।

—তা' আমি সেই লোককে বেশ করে' জল খাইয়ে বল্লুম দাঁড়াও, এখন এ নিয়ে গোল কর' না। বলে' তাড়াতাড়ি গায়ে-হলুদ পাঠিয়ে দিলুম।

—তারপর কি করলে? সে বউ তোমাকে ভালবাস্ত?

—তারপর যেতুম আসতুম। সে ভালবাসবে না কেন? আমি তাদের সংসার পাতিয়ে, ঘরকন্না গুছিয়ে দিয়ে তবে ত এলুম। মা, লোকে রাতারাতি সংসার ছেড়ে পালায় কেন বুঝিনে। একি চুরি করছি যে লুকিয়ে পালাব? আমি ১৬ বৎসর ঘর করেছি, তারপরে নতুন বউটির যখন ছেলে হ'ল তার প্রসবের সময় থেকেছি, তারপর ছেলেটি দু' মাসের হ'তে সেই যে চলে' এসেছি,—আর যাইনি।

—এ তুমি একটা নতুন জিনিষ দেখালে বটে! বিয়ে করা দূরে থাক্, স্বামী যদি অন্য মেয়ের দিকে চায়, তাহলেই কত স্ত্রী কেঁদে কেটে অনর্থ করে,—আর সেই স্বামীকে কি না তুমি নিজের হাতে করে' বিয়ে দিলে?

—হাঁ মা, আমার এই শরীরের ভগ্নীপতিও সে সময়ে বলেছিলেন যে তুমি একটা নতুন কাণ্ড করলে।

* * * * *

কেমন সহজে এঁরা "এই শরীরের" বিশেষণটি ব্যবহার করেন, আর কি সুন্দরভাবে এতে প্রয়োজন সাধিত হয়। শুধু "এই

শরীরের" এই সব সম্বন্ধ ? তাই ত ! অন্য শরীরে অন্য ঘরে জন্মালে সম্বন্ধ ত সবই অন্যরকম হত ! কিম্বা তা ঠিক নয়—যেখানেই জন্মাই, যতবারই জন্মাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ শরীরঘটিত, আত্মা নিঃ-সম্পর্ক ও নির্লিপ্ত,—এই ভাবে হয়ত ঐ কথা বলেন।

কিন্তু এঁদের বৈরাগ্য শুষ্ক স্বার্থপর বৈরাগ্য নয়, কেবলমাত্র নিজের মুক্তিলোভী নয়, সে ত এঁদের কার্য্যেই প্রকাশ। আমার বলে' বিশেষ জন-কতকের উপর সাধারণ গৃহীর যে বিশেষ মমতা, কবির ভাষায় এঁদের বলা যেতে পারে—"করেছ একি সন্ন্যাসী, বিশ্বমাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে !" মানুষ বলে' মানুষের উপর ওঁদের যথেষ্ট দরদ আছে, তা শান্তি-মা স্বীকার করলেন। অথচ মানুষের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করেন না, কি জানি কেন। বল্লেন—

—আমি দুর্ব্যবহার পাব বলে'ই মনে করি। এই আপনার কাছে আসছিলুম, মনে হচ্ছিল আপনি হয়ত বিরক্ত হবেন। আবার ভাবলুম, বিরক্ত হলেই বা কি করব।

—হাঁ, তোমরা ত নিজের জন্যে কিছু চাচ্ছ না যে চাইতে লজ্জা হবে। পরের সেবা আর ঘরের সেবার মধ্যে তফাৎ এই যে, আপনার লোকের দাবীদাওয়া এত বেশি, তাদের জন্যে যতই করনা কেন, সব যেন ফুটো পাত্রে জলের মত ঢাল্‌তে ঢাল্‌তেই বেরিয়ে যায়, কিছুতেই আশা পূর্ণ করা যায় না। আর পর তোমার কাছে কিছু আশা করে না বলে' যতটুকু পায় সেইটেই আশাতীত মনে করে—তাই দিয়েও তৃপ্তি হয়। আমারই কোন আত্মীয়াকে বল্‌তে শুনেছি যে, "যত পার তাই দিয়ে যাও, জীবনে কারো কাছে কিছু চেয়ো না।" কিন্তু তাঁরা অত বয়সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তুমি জীবনের আরম্ভ

থেকেই সে জ্ঞান পেলে কি করে', সেইটেই আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হয়।

—মা, আমি কষ্ট অনেক পেয়েছি, এতরকম দুঃখ আমার উপর দিয়ে গেছে যে শরীরে সইলেও মনে সহ্য করা যায় না। কিন্তু একদিন একটা বাড়ি তৈরি করা দেখলুম। মিস্ত্রীরা দেখি এত বড় একটা লোহার girder ছাতে তুল্‌ছে। আর একটু এগিয়ে দেখলুম যে, যে দেয়ালের উপর সেটা বসবে, সেগুলি এতখানি করে চওড়া। ঐ অত মজবুৎ গাঁথ্‌নী বলে'ই না অত ভারি লোহার চাপ সইতে পারবে? তখন মনে মনে ভাবলুম যে ভগবান যখন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন, তখন অবশ্য সহ্য করবার শক্তিও তিনি দেবেন।

—এখন তোমার শরীর ভাল হয়েছে ত?

—হাঁ মা, ছোটখাটো অসুখবিসুখ যেগুলি ছিল, সেগুলি সেরে গিয়েছে। আর এখন আমার বিষয়বুদ্ধিও ঠিক হয়েছে। ঐ যে ওখানে আপনার টেবিলটা রয়েছে, কিম্বা এই সাজাবার জিনিষগুলি রয়েছে, তা' বলে' দিতে পারব যে কোথায় কোন্‌টা রাখলে কাজ হবে, কোথায় কি মানাবে।

—তোমার জীবনের এই সব কথা লেখনা কেন?—শুনলে লোকের ভাল লাগবে।

সঙ্গিনী।—বাড়ীতে কত লেখা এমনি গাদা-করা পড়ে রয়েছে। আচ্ছা মা, এখন তবে আসি, আপনারও নাইতে খেতে অনেক বেলা হল। আবার যেদিন এদিকে আস্‌ব, আপনার সঙ্গে দেখা করে' যাব।—

সন্ন্যাসিনীদ্বয় বিদায় হলেন, আমিও বাস্তব সংসারে ফিরে এলুম। কোন্‌টা সত্যি বাস্তব?—

যদি তাঁদের কথাবার্ত্তার আংশিক আভাস পাঠকদের দিতে গিয়ে তাঁদের কাছে অপরাধী হয়ে থাকি ত আশা করি তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন। আর সন্ন্যাসিনীর তা'তে কি আসে যায়? তাঁদের জীবনও যেমন গৃহশূন্য, মনও ত তেমনি অনাগারিক।

* * * *

হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চূরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়॥

জনৈক গৃহিণী।

—

৺রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার।

——ঃ০ঃ——

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার যে এতদিন বেঁচে ছিলেন, এ কথাটা আমরা ভুলেই গিয়েছিলুম, কারণ গত বারো বৎসরের মধ্যে তাঁর মুখের কোনও কথা আমরা শুনতে পাইনি। তাই কাল খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পড়ে' তাঁর জীবনের কথা মনে পড়ে' গেল।

ভারতবর্ষের এ যুগ হচ্ছে আসলে renaissance-এর যুগ। এ যুগের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা এই যে, ভারতবর্ষ মনে পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের এই নব জীবনের চাঞ্চল্য দেখে অনেকে এর কারণ অনুসন্ধান করছেন।

এই অনুসন্ধানের ফলে একদল আবিষ্কার করেছেন যে, আমাদের এই চাঞ্চল্যের মূলে আছে ইউরোপ থেকে আমদানী-করা আমাদের নব-শিক্ষা। আমাদের সকল ছটফটানি হচ্ছে pouring new wine into old bottles-এর ফল।

আর একদল আবিষ্কার করেছেন যে, আমাদের নব জীবন তার রসরক্ত নীরবে সংগ্রহ করছে' প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও সাহিত্য থেকে। বাঙলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর Lord Ronaldshay বলেন যে, এ দেশের বর্ত্তমান পলিটিকাল অশান্তির মূলে আছে বেদান্ত। আর বেদ অনাদি হলেও, বেদান্ত হচ্ছে অনন্ত।

এ উভয় মতই এক হিসেবে সত্য, এবং এ উভয় মতই একদেশ-দর্শিতার ফল।

আমাদের নতুন মন গড়ে উঠছে যুগপৎ নবীন ইউরোপ ও প্রাচীন ভারতবর্ষের মনের স্পর্শে। বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দেশের এই দুই মনের সন্ধিতেই আমাদের মন যে তার নবরূপ লাভ করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ মন জিনিষটে আসলে দেশ কালের বহির্ভূত। যে স্থূলদর্শী ওর সুধু পার্থক্য দেখতে পায়, সে মন জিনিষটিকে দেখতে পায় না। আমাদের মনের এই renaissance-এর অগ্রদূত হয়েছে প্রধানত ভারতবর্ষের দুটি জাতি—বাঙালী ও মারাঠী।

ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বারা মুখ্যত অনুপাণিত হয়েছে Bengalee Babu; আর সংস্কৃত শাস্ত্রের এ যুগে বিশেষ চর্চ্চা করেছে Poona Brahmin.

যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের দল সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও প্রচার করেছেন, তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার হচ্ছেন অগ্রগণ্য। সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্রের তিনি যে পারদর্শী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য কেবলমাত্র অভিধান ও ব্যাকরণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তিনি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের চর্চ্চা করেছেন, ইংরাজরা যাকে বলে ঐতিহাসিক পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি অনুসারে। অর্থাৎ তিনি সংস্কৃত অক্ষরের মধ্য হতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারকল্পে জীবন যাপন করেছেন। ইতিহাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনের কাছে অতীতকে বর্ত্তমান করে তোলা, আর যে অংশে ও যে পরিমাণে মানুষের জীবন

তার মনের অধীন, সেই পরিমাণে ইতিহাস আমাদের নব জীবনের স্রষ্টা। ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধার করা এক জীবনের কাজ নয়, এক ব্যক্তিরও কাজ নয়। গুরুশিষ্যপরম্পরায় ইতিহাস গড়ে ওঠে। ভাণ্ডারকর সুধু নিজের কীর্ত্তি রেখে যান নি, তিনি মহারাষ্ট্র দেশে বহু শিষ্য রেখে গেছেন, এবং এই শিষ্যমণ্ডলী তাদের গুরুর প্রারব্ধ কর্ম্ম প্রতিদিন অগ্রসর করে দিচ্ছে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান উভয়মুখী renaissance-এর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ছিলেন একজন আদিগুরু। সুতরাং এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের চরণে স্মৃতির ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা আমাদের বাঙালীর পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ তিনিও ছিলেন এ যুগের একজন nation-builder।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শুভ-দৃষ্টি।

বাড়ীভরা লোকজন; ঘরে ঘরে গল্প আর হাসি—
স্বতঃস্ফূর্ত্ত শুভকর্ম্ম কণ্ঠে কণ্ঠে উঠিছে উল্লাসি;
চারিদিকে ডাক হাঁক, একটু নিরালা কোথা নাই;—
আজি বুঝি বৌ-ভাত! সাহানায় বাজিছে সানাই,
কলকোলাহলপূর্ণ বিচিত্র ধ্বনির বক্ষ চিরে,
বাড়ীতে না পেয়ে শ্রোতা সুর ভেসে বাহিরায় ধীরে!
চলেছে মেয়ের দল, ঝম্ ঝম্ ঝুম্ ঝুম্ ধ্বনি,
সেই সে সকাল থেকে কেবলি বাজিছে আগমনী!
—বেতর স্বরের মেলা—পান দেনা, ওরে জল আন্—
উচ্ছ্বসিত শিশুকণ্ঠে আনন্দের উন্মত্ত তুফান!

আরে আরে বর কই? বন্ধুরা শুধায় পরস্পরে;
বরের নাহিক দেখা, নাই সে নীচের কোনো ঘরে!
ততক্ষণ কোন্ ফাঁকে খুঁজে খুঁজে তেতলার কোণে
দেখে বর, নববধূ একা বসে' কাঁদিছে গোপনে!
ঘোমটার অন্তরালে অশ্রুবিন্দু ঝরি' ঝরি' পড়ে
স্বর্ণ আভরণে ভরা অঙ্কশায়ী দুটি হস্তপরে।
এদিক ওদিক চাহি' ধীরে বর শুধাইলা তারে—
কি হয়েছে, কাঁদ কেন? একবার বল' না আমারে!
বলিবেনা, বলিবেনা?—তত জোরে ঝরে আঁখিজল,
আনন্দ-প্রতিমা চক্ষে ভাষাহীন বেদনা তরল!
কি হয়েছে বল' না গো—বল' বল' লক্ষ্মীটি আমার!

এবারে কহিলা বধূ, অতি কষ্টে রুধি' অশ্রুধার,—
অস্পষ্ট মুদিত কণ্ঠে বাহিরিল ধ্বনি অতি ক্ষীণ—
ছোট ভাইটির মোর জ্বর দেখে' এসেছি সেদিন;
আমারি সে অনুগত—কাঁদে শুধু দিদি দিদি বলি',
মার কোলে ফেলে' তারে লুকায়ে যে এসেছিনু চলি',
ওগো, দুটি পায়ে পড়ি—
—চুপ চুপ, কেঁদোনাক আর,
এখনি খবর আমি এনে দিব ভায়ের তোমার।
সমবেদনায় পূর্ণ শুনি' সেই আশ্বাসের স্বর,
বধূর ব্যথিত বক্ষে বহে নব শান্তির নির্ঝর!

ঘোমটার আবরণ চকিতে উঠিয়া গেল ধীরে,
ডাগর নয়ন দুটি জলে-ভরা অমনি সে ফিরে'
মুহূর্ত্তে উঠিল ফুটি' স্বামীর সতৃষ্ণ নেত্রপানে,
সত্যকার শুভদৃষ্টি নিমেষে মিলায়ে সেইখানে!
উৎসবের বক্ষোবাসী আনন্দের চক্ষু দুটি ভরি'
অপরূপ হাসিকান্না একসঙ্গে পড়ে যেন ঝরি'!

আজি এই শুভদিনে কাঁদিতেছ তুমি নব বধূ?—
কবি কহে অশ্রু নহে—অপূর্ব্ব ও অন্তরের মধু
প্রথম স্ফুরিল আজি ভোগবতী অমৃতের মত,
সমবেদনার বাণে সর্ব্ববাধা করিয়া প্রহত!
আরক্তিম শুক্তি মাঝে ওই অশ্রু মুকুতা তরল—
ওরি মূল্যে মহনীয় গৃহস্থের রিক্ত গৃহস্থল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মাধুরী।

—মরতে এতদিন ভয় পাই নি। এখন চোখ বুজ্‌লেই শিউরে উঠি!

—ছিঃ—সে কি কথা! তুমি সেরে উঠ্‌বে।

—না গো! আর আমায় মিথ্যে প্রবোধ দিয়ো না। ছেলেমানুষটি তো আর নই! বিশটি বছর বয়স হয়েছে। মরবার আগেকার সব লক্ষণগুলিই আমি চিনি। তোমার অসুখের সময় ডাক্তার বহুবারই তোমাকে জবাব দিয়ে গিয়েছিল। তবু আশা ছাড়ি নি, কায়মনো-বাক্যে যমের সঙ্গে যুঝেছিলাম—জিতেওছি। আমার মাথার সিঁদুরের টিপটি দেখ দেখি—খুব লাল—না?

—হাঁ।

—কিন্তু শুধু 'লাল' বল্‌লেই তো বলা হ'ল না! ও তো শুধু লাল নয়—আগুনের মত লাল টক্‌টকে। টিপ যখন পরি—মনে হয় আগুনের মত জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বল্‌ছি!

—তুমি আরো সুন্দর হয়েছ দেখতে!

—হবেই তো! আগুন যে দেখতে খুব সুন্দর!—কিন্তু সে যে নিজে কতখানি জ্বলে' জ্বলে' অমন রাঙা রূপ পায়, তার খোঁজ কয়জনে রাখে?

—রাখি, আমি রাখি। মরে' তো গিয়েইছিলুম—বাঁচিয়েছ তুমি। এই বিদেশে যেদিন পঙ্গু হয়ে পড়্‌লুম, চাক্‌রিটি গেল; কয়েক মাসের চিকিৎসা আর পথ্যে শেষকালে তোমার গয়না ক'খানিও গেল—সে

পর্য্যন্ত দেখেছিলুম, হাঁ, সে পর্য্যন্তও দৃষ্টিশক্তিটুকু ছিল—তারপর আর জ্ঞান ছিল না। মনে পড়ে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতুম—যেন তুমি 'সাবিত্রী'।

—সে তুমি শতবার বলেছ—আমি শতবার শুনেছি,—কিন্তু শুনে কখনো লজ্জায় জিভ্ কাটি নি, বা মাথায় হাত তুলে সেই দেবীর উদ্দেশে নমস্কার করি নি। কেন করব? তাঁর চাইতে তো আমি কিছু কম করি নি! বরং এখন এই মরতে বসে ভাবছি—তিনিই বড়—না আমিই বড়! শুনলে লোকে হাসবে,—হাসবে কি ধিক্কারই দেবে—দিক্।

—তুমি ঘুমোও। বেশী কথা কইতে ডাক্তার বারণ করে গেছে।

—ডাক্তার এসেছিল?

—এসেছিল।

—ভিজিট?

—তা' সে কিছুতেই নেবে না। আর আমিই বা দেব কোথা থেকে? তাঁর দয়ার অন্ত নেই, মাধুরী!

—নেই-ই বটে!—কিন্তু তবু তো তোমার জন্য কোন ভরসা পাচ্ছিনে আমি। এখনো ভালো করে তোমার শরীর সারে নি—দুটি দিন একরকম উপোস করেই রয়েছ।—ডাক্তার আবার কখন্ আসবে?

—সকালবেলা। কিন্তু দেখ, এখন একটু ঘুমোলে কি ভালো হ'ত না?

—এখন রাত কত?

—রাত ভোর হয়ে এসেছে।

—অন্ধকার শেষ হয়ে এসেছে, না? উষার আলো বহুদিন দেখি নি। জানালা দুটো খুলে দিয়ে ঘরের দীপটি নিবিয়ে দাও না?

—আচ্ছা, দিচ্ছি। এইবার ঘুমোও।

—আঃ কি সুন্দর! এই উষায় জন্ম আর মৃত্যু কি মিশে গেল? অন্ধকার মরে যাচ্ছে—আলো ফুটে উঠছে। অন্ধকারের ভয়ের পাশে এই ফুটন্ত আলোর আশা আমার বড়ই ভালো লাগছে! যন্ত্রণা আমার অনেক কমে গেছে। সত্যি, আমার এখন কেমন ঘুম পাচ্ছে। একটা গল্প বলনা শুনি?

—সে কি গো!

—হাঁ, ঘুমিয়ে পড়লে তো চল্‌বে না। ডাক্তারের সঙ্গে যে শেষ দেখা হয় নি! আর যদি না জাগি?

—ডাক্তার তোমাকে বিশেষ করে ঘুমোতে বলেছে।

—আমাকে বিশেষ করে'ই জেগে থাক্‌তে হবে। তুমি বেহুলার গল্পটি বল—বেহুলার কথাই আজ বড় বেশী মনে পড়ছে!

—বেহুলার গল্প তো আমি ভালো করে জানি নে। আর একটা কিছু বলি?

—না, তা হবে না। তবে আমি যতটুকু জানি, তুমি সেইটুকুই না হয় শোন।

—কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছ না কি?—দেখ, আমিও তো সারা রাত ঘুমই নি—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

—বেশ তো! আমার 'শাস্তর' শুনতে শুনতেই না হয় ঘুমিয়ে পড়। মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ো কিন্তু—

—হুঁ।

—বাসর-রাতে সর্পাঘাতে লখিন্দরের প্রাণ গেল। বেহুলা বিয়ের রাত্রেই বিধবা হ'ল।

—হুঁ।

—বেহুলা বল্‌ল সে হবে না, আমি স্বামীকে মরতে দেব না, যেমন করেই হোক্ বাঁচিয়ে একে তুলবো-ই।

—হুঁ।

—বেহুলা মৃত স্বামীকে ভেলায় তুলে নিয়ে নদীর স্রোতে ভেসে চল্‌ল।

—চল্‌ল।

—মৃতদেহ পচে গেল, খসে' গেল। কিন্তু বেহুলা তবু আশা ছাড়্‌ল না। দেশের পর দেশ পার হয়ে গেল—কত আপদ, কত বিপদ, কিছুতেই সে দম্‌ল না। পথে কত লোকে কত প্রলোভনই না তাকে দেখাল। কত জনে বল্‌ল "ও মড়া আগ্‌লে আর কতদিন রইবে? তোমার অমন রূপ, অমন যৌবন!

—হুঁ।

—বেহুলা সে কথায় ফিরেও চাইল না—চল্‌ল, চল্‌ল,—এই যে, ঘুমিয়ে পড়েছ, না?

—হাঁ।

—বাঃ, শোন—

—বল—

—তারা সব বেহুলার রূপযৌবন চেয়েছিল, কিন্তু কেউ ই লখিন্দরের প্রাণ দান করতে চায় নি।

—না।

— চেয়েছিল ?

—না।

—এ কথা তো কেউ বলে নি—'তোমার রূপযৌবন দাও, লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তুল্‌ছি।' কেউ বলেছিল ?—বল!

—হুঁ।

—কি! বলেছিল ? বলেছিল ?—বল!

— না।

—যদিই বা কেউ তা বল্‌ত—তবে ? নাঃ, তুমি ঘুমিয়েই পড়েছ। আঃ, কি শীর্ণ হয়ে পড়েছ তুমি! আবার যদি তোমার সেবা করতে পারতুম! যাক্‌—ওকি! ও কার পায়ের শব্দ! ডাক্তার এসেছ ? আমি যে তোমারি প্রতীক্ষায় এখনো চোখ বুজি নি!

— কেমন আছ ?

—ও-পারের আলো তো আমার চোখে এসে পড়েছে। কেন, তুমি কি তা দেখ্‌তে পাচ্ছ না ডাক্তার ? পূব আকাশে তাকিয়ে দেখ না, কেমন লালে লাল হয়ে গেছে!

— কেমন আছ মাধুরী ?

—আমার সিঁথির সিন্দুর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, না ?

—হাঁ। কিন্তু, আর ভুল ব'কো না। যা' জিজ্ঞেস করি, উত্তর দাও। যন্ত্রণা বড় বেড়েছে, না ?

—যন্ত্রণা নয়, জয়ের উল্লাস! সাবিত্রীই বল, আর বেহুলাই বল—

তাঁদের সকলের গৌরবকে ম্লান করে' আমি চল্‌লুম। চল্‌লুম কিনা, তুমিই বল—

—সাধুচরণ দেখ্‌ছি ঘুমিয়ে পড়েছে—ওকে যে এখনি দরকার হবে।

—না, ওকে আর ডেকো না—সারাটি রাত আমার পাশে জেগে বসেছিল। অসুখের পর শরীর এখনো সারে নি—অথচ ওর অযত্ন অনিয়মের অন্ত নেই। হাতে একটি পয়সা নেই—কেমন করে' যে ওর চল্‌বে ভেবে পাইনে। আজ মরবার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার শেষ মিনতিটি নিবেদন করতে চাই—

—তুমি বেঁচে উঠ্‌লে ওর জন্য ভাবনা নেই—কিন্তু, তোমাকে যে এখন operation-এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

—না ডাক্তার, আর operation নয়, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও,—operation করলেও আমি বাঁচ্‌ব না।

—তোমার কোন ভয় নেই। সাধুচরণের অসুখের সময় দেখেছি অসাধারণ তোমার সাহস, অসাধারণ তোমার ধৈর্য্য। তোমাকে chloroform করতে হবে। ঐ পর্দ্দার আড়ালে আমাদের ডাক্তার সাহেব বসে' আছেন। তিনিই operation করবেন।

—কিন্তু এ বৃথা চেষ্টা। আমার হয়ে এসেছে। ডাক্তার! আমার শেষ অনুরোধটি তোমাকে রাখতেই হবে। রাখবে না কি?

—সে হবে এখন।—প্রস্তুত?

—কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার কথাটি রাখ—

—বল্‌লুম তো সে হবে এখন। তুমি প্রস্তুত হও—হাঁ, ঠিক্ হয়েছে—হাঁ ঠিক্ হচ্ছে—that's right—

—উঃ—মাগো! ডাক্তার!—আমার কথা রাখ—

—আচ্ছা, বল—

—আমি জানি, আমার স্বামীর উপর তোমার এতটুকু প্রীতি নেই, দরদ নেই, মমতা নেই।

—সে কথার তো এখন কোন প্রয়োজন নেই, মাধুরী!

—আছে। ও বেচারী নিঃস্ব, তার উপর পঙ্গু—ওর ভার যে তুমি নেবে, সে ভরসা আমি মোটেই করি নে।

—সে দেখা যাবে এখন—

—না, দেখা যাবে নয়, এখনি সেটা দেখ্‌তে হবে।

—বেশ! কি করতে হবে শুনি?

—একদিন জোর করেই তুমি আমাকে তোমার একটা হীরের আংটি দিয়েছিলে। তখন ও নিয়ে আর গোল করতে ভরসা পাই নি। ভেবেছিলাম পরে কোন উপায়ে সেটা তোমাকে ফেরৎ দেব। আজ সেটা তোমাকে ফেরৎ দিচ্ছি, কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা নিবেদনও আছে। এই নাও—

—সে নেব এখন। কিন্তু আর দেরী নয়। ডাক্তার সাহেবের সময় নষ্ট হচ্ছে—

—নাও এটা—

—দাও—

—দাঁড়াও—আর একটু বাকী,—উঃ—পরাও—মাগো—গেলুম—ডাক্তার! ডাক্তার!—ওকে ডেকে তোল—ডেকে তুলে তুমি নিজের হাতে আমার ঐ বেচারী স্বামীকে—ঐ আংটিটি দান কর—নাহয়

ভিক্ষাই দাও—আমি দিলে সে সন্দেহ করবে—দাও—দাও—ও—কে ডা—কো—

—মাধুরী তুমি—সে নয়। এ সব কথা আর নয়। ডাক্তার সাহেবের যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি—একটু সহ্য কর।

—হাঁ মাধুরী আমি, সে নয়···কিন্তু সে যে মাধুরীর সব। উঃ! যা—ই—গে—লু্—ম ডাক্তার—সাহেব—ডা—ক্তা—র সা—হে—ব, মা—গো—

—এ কি! এ কি! এ যে ডাক্তার! এ কি হচ্ছে ডাক্তার?

—ঘুমোও, ঘুমোও—আমি ওকে chloroform করছি। এ সময় বিরক্ত ক'র না—

—না—না—তু—মি শো—ন। বাইরে ডাক্তার সাহেব ব—সে আ—ছে—ন—তাঁ—কে ডা—কো—

—মাধুরী, লক্ষীটি চুপ কর—এখনি ওঁরা তোমাকে আরাম করে দেবেন—

—স—য়—তা—ন···ও—রা স—ব স—য়—তা—ন···উঃ! সরাও, দ—ম আ—ট্—কে আ—স্—ছে···নিঃ—শ্বা—স ব—ন্ধ হ—য়ে গে—ল···ডা—ক্তা—র সা—হে—ব শো—ন···উঃ—গে—লু্—ম···এই ডাক্তার বাবু— আ—মা—র স্বা—মী—কে বাঁ—চা—বা—র স—র্ত্তে—ওঃ! মা—গো—

[বাইরের ডাক্তার]—Well doctor, are you ready? It is getting late.

[ঘরের ডাক্তার, কপালের ঘাম মুছিয়া] Yes sir, it is too late!

মন্মথ রায়।

রবি-শস্য।

তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দেখি কাল সন্ধ্যাকালে কুয়াসার যে ঘনায়মান ঘোমটা সমস্ত প্রান্তরকে নাই করিয়া দিয়াছিল—আজ তাহা কোথায়! প্রান্তরলক্ষ্মীর দিক্‌বলয়-বেণীর একটি কেশও যে বিস্রস্ত হয় নাই। এই শিশিরচিক্কণ পৌষ উষাটি দেখিয়া কবি উর্ব্বশীর কল্পনা করিয়াছিলেন নিশ্চয়।

নিকটের নদীতীরে একখানি ক্ষেত। ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলাম। কাছেই একটা লোক কাজে ব্যস্ত, সে আমাকে দেখিয়াও দেখিল না। সদ্যজাত এই শিশু-ফসলের ক্ষেতে আমার দ্বারা কোনো ক্ষতি হইবে, এমন আশঙ্কা তাহার নাই।

চারিদিকে এই কচি-কোমল ক্ষেতটি সবুজ রঙের একটি কোলাহলের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা এখনো প্রকৃতির খেলাঘরে স্নিগ্ধ বাতাসে চলি-চলি পা-পা করিয়া দুলিতেছে; ইহাদের কাছে কোন্ প্রবীণ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে! এখনো ইহাদের ভবিষ্যৎ বাঁধা দিয়া বিজ্ঞ কৃষক হালের বলদ এবং গৃহিণীর অলঙ্কার কিনিতে ভরসা করে না! এখনো ইহাদের অবস্থাটা হওয়া-না-হওয়ার নাগরদোলায় দোল খাইবার মধ্যে।

আমার পাশের এই আখের ক্ষেতটি বড় তরুণ—ইহার রঙটি শরৎ কালের বৃষ্টি-বিগত স্বচ্ছ আকাশের মত। আর এই সরিষা ক্ষেতের সবুজ রঙটি শিশির পড়িয়া শাদা হইয়া উঠিয়াছে। মাকড়সার জালে

শিশির লাগিয়া ইহার পাতায় পাতায় মুক্তার মালা গাঁথা; এখনি সূর্য্য উঠিবে, দেখিতে দেখিতে মৌন রজনীর এই অশ্রু-সাধনাগুলি স্বর্ণ কান্তিতে সার্থক হইয়া উঠিবে। অদূরে ওই আলুর ক্ষেতটি বর্ষার প্রথম মেঘের মত গম্ভীর, ঘুমের মত চোখ-ডোবানো গাঢ় সবুজ তাহার বর্ণ। তাহার তৃষিত শিকড়ের চাপে মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া মানচিত্রের নদীর মত সব রেখা পড়িয়াছে। কাছেই মুশুরীর ক্ষেতটি বড় প্রতিবেশি-পরায়ণ—ছোট ছোট ঝাড় বাঁধিয়া উঠিতেছে; কিন্তু রঙটা কেমন যেন ম্লান, অনেক দিন যে বাড়ীতে চূণকাম করা হয় নাই, খানিকটা সেইরকম; ইহার মধ্যেই দুই একটা নীল ফুল ফোটো-ফোটো—তাহারা হঠাৎ আগে আসিয়া পড়িয়া থতমত খাইয়া গিয়াছে। ওখানে ওই সরিষা ফুলের গন্ধটি এখনো মৌমাছি ডাকিবার মত তীব্র এবং নির্ভরশীল হয় নাই—এখনো যেন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজেরই সন্দেহ; ঠিক নূতন কবির প্রথম কবিতার খাতাটির মত। ক্ষেতের আলের চারিপাশে কুসুম ফুলের চারা-পাতাগুলির দুই পাশে কাঁটা—যেন অনাগত রঙের আনন্দে ইতিমধ্যেই তাহারা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

পাশে ওই নদী। নদী হইতে ক্ষেতে জল সেচন করিবার চরখিটি অপ্রয়োজনের অবসরে মাছের খোঁজে উৎসুক বকটির মত এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীটা ক্রমাগত আঁকিয়া বাঁকিয়া পাক খাইয়া ছুটোছুটি করিয়া দুই তীরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে; তাহারা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নদী বেচারীর জলের সঞ্চয় বেশি নাই, বারে বারেই তাহার রিক্ততা ধরা পড়ে। ছোট ছোট স্রোতগুলি বালুর মধ্যে বিভক্ত হইয়া মৃত পুত্রের শ্মশান-শয্যায়

জননীর বিস্রস্ত বেণীর ইঙ্গিত করে। দুই পারের দৃশ্য কেমন অনুর্বর—মোটেই অতিথি-বৎসল নয়। সেখানে কতকগুলি শালিক উড়িয়া পড়িল, তাহাদের পাখার রঙ তাম্রধূসর, কিন্তু তলাটা শাদা—বাহিরে গম্ভীর অথচ ভিতরে রসিক লোকদের মত।

শিশিরসিক্ত মাটির ও ফসল-ক্ষেতের নানা গন্ধ মিলিয়া সৌগন্ধের একটি যে একতান উঠিতেছে, তাহা আমি কল্পনায় বার বার পাইতেছি। সে গন্ধ এত সূক্ষ্ম যে, হঠাৎ তাহা পাওয়া যায় না; দিনের আলোয় ক্ষীণ চাঁদ যেমন দেখা যায়, আবার যায়না,—তেমনি।

তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু এই ক্ষেতটির কথা ভুলিতে পারিলাম না। মনে হইতে লাগিল এই শিশু ক্ষেতটিকে ইহার মালিক "হ্যাম্‌লিনের" বাঁশীওয়ালার মত কোন্ যাদুমন্ত্রবলে বর্ণ বৈচিত্র্যহীন মরাইমুখো অন্ধকার এক পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—যদিও আজ সে ধরিয়া আছে বিরহীর ব্যথিত চিত্তের সম্মুখে অযাচিত সান্ত্বনার শ্যামায়মান সুধার পাত্রটি।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

অপলাপ।

—— ঃ০ঃ ——

আমি তব নাম লয়ে করেছিনু খেলা,
ভেবেছিনু মরণের অভিনয় করা
পরম গৌরব বুঝি। বলেছিনু জরা—
কামহীন, শক্তিহীন, স্তিমিত, একেলা,
চাহিনা। স'বনা আর জীবনের হেলা,
প্রণয় বাসনাতিক্ত, দিন গ্লানিভরা,
যৌবনের ব্যর্থ চেষ্টা। তার চেয়ে ত্বরা
আসুক অনমুভূতি. মৃত্যু এই বেলা।

হে করুণ, সত্য ভেবে মোর সে মিনতি,
যেমনি আসিলে মোরে তুলে নিতে কোলে,
অমনি কাতরে বলি, ভাসি' অশ্রুজলে—
ধরা অভুঞ্জিতা প্রিয়া, সর্ব্ববিত্তবতী,
জীবন যৌবন কাম্য, প্রেম সুমধুর,
মরণ অজ্ঞাত, অন্ধ, অসুন্দর, ক্রূর!

শ্রীসুধীন্দ্র নাথ দত্ত।

——

খেয়াল-খাতায়।

——:•:——

জীবন-খাতার শেষ দিকেতে এমনি ক'রে কবে
শেষ কথাটি লিখে দিয়ে বিদায় নিতে হবে!
যাত্রা যেদিন হবে সুরু—দুরু দুরু হিয়া—
মিলন লাগি' কার্ তরে সে কোন্ জনমের প্রিয়া?

কোন্ জনমের বধূ সে মোর—যুগযুগান্ত পরে
বাসর-রাতে দীপটি আবার জ্বালবে আমার তরে!
পথ-চাওয়া তার ক্লান্ত আঁখির মৌন আলাপনে
হারিয়ে-যাওয়া কথা যত আস্‌বে ফিরে মনে?

পারিজাতের পাপ্‌ড়ি-খসা আধেক আঁচলখানি
পাত্‌বে সে কি আমার তরে, বক্ষ হ'তে টানি?
গন্ধজলের ঝারির পাশে চন্দ্র-উজল থালা,
তারি পরে রইবে কি তার যত্নে-গাঁথা মালা?

নূতন জীবন পাব কি সেই নূতন পরিচয়ে?
মিলন বাঁধা রইবে চির মালা-বিনিময়ে?
মুখটী রেখে ঘুমভাঙ্গা মোর ব্যাকুল হিয়ার পরে,
অমরী সে—অমর মোরে করবে চিরন্তরে!

শ্রীকান্তি চন্দ্র ঘোষ।

বীরবলের পত্র।

(১)

শ্রীযুক্ত সবুজ পত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার দার্শনিক বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার করেছেন যে, সবুজ পত্রের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড পাকা টিকি আছে, সে টিকি ছিল পুরাকালে শাস্ত্রকারদের মাথায়, আর কালক্রমে তা আপনার মাথায় এসে বর্ত্তেছে। এ টিকির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে আর্য্যটিকি। আপনি যখন উক্ত আবিষ্কারটি আপনার কাগজের মারফৎ প্রচার করেছেন, তখন ধরে নিচ্ছি যে, আপনি অতুল বাবুর কথাকে ব্যজনিন্দা মনে করেন। মানুষের আত্ম-প্রতারণার সীমা নেই, বিশেষত সে মানুষ যদি সাহিত্যিক হয়। অতুল বাবু যা বলেছেন তা ব্যজস্তুতিও হতে পারে।

আপনার বিষয় আমার ধারণা এই যে, আপনি হচ্ছেন যুথভ্রষ্ট অতএব যুগভ্রষ্ট সাহিত্যিক। বর্ত্তমানের প্রতি বিরাগই আপনার স্বধর্ম্ম, তাই আপনি বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে কখনো অতীতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, কখনো ভবিষ্যতকে,—অর্থাৎ যা নেই তাই দিয়ে যা আছে তাকে আক্রমণ করেন। বর্ত্তমান যে আপনার মনঃপূত নয় তার কারণ, আমাদের বর্ত্তমান হচ্ছে কতকটা পড়ে-পাওয়া অতীত আর কতকটা উড়িয়ে-নেওয়া ভবিষ্যৎ। আমরা তাই একসঙ্গে তলারও কুড়তে উপরেরও পাড়তে চাই, ফলে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হই। এই হচ্ছে আমাদের যুগধর্ম্ম।

আপনি যে কোনমতেই হিন্দু-পদবাচ্য নন্, সে কথা অতুল বাবু আপনাকে সুহৃৎ-সম্মিত বাণীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ দেশ মুসলমান বিজয়ের পরে হয়েছে "হিন্দুস্থান," পূর্ব্বে ছিল আর্য্যাবর্ত্ত। সুতরাং *যার মন হিন্দুস্থানের বাইরে হিঁদুয়ানীর সন্ধান পায়, সে* বিশেষ্য *বাদ দিয়ে বিশেষণের ভক্ত হয়।* যেমন যার nation নেই সেই nationalism-এর ভক্ত হয়। ও-জাতীয় মনোভাব আমাদের সকলেরই আছে, সুতরাং এতে আপনার কিছু বিশেষত্ব নেই। আমাদের সকলের মাথাতেই হ্যাটও আছে, টিকিও আছে; আর আমরা পালায় পালায় ও-তুইই সমান আস্ফালন করি,—কখনো হ্যাট মনে করে' টিকিকে, কখনো টিকি মনে করে' হ্যাটকে। আপনি হয়ত হ্যাটকে হ্যাট, আর টিকিকে টিকি বলেই মানেন; নাহয় ত আপনার মতে টুপি আর টিকি ও-তুই একই জিনিষ।

(২)

সে যাই হোক্, এখন দেখা যাক্ এই আর্য্য টিকির স্বরূপটি কি, তা সে টিকি আপনার মাথাতেই থাক্ আর মনু-মেধাতিথির মাথাতেই থাক্। সে টিকির ভদ্র নাম হচ্ছে আর্য্য মনোভাব। আর্য্য বলে' কোনও জাতি ছিল কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। Max Muller এ জাতকে আবিষ্কার করেন ভারতবর্ষে ও পারস্যদেশে। তারপর পণ্ডিতের দলে প্রশ্ন উঠল—এই আর্য্যরা ভারতবর্ষে এল কোত্থেকে? মানুষ এল কোত্থেকে, এই হচ্ছে দর্শনের ও বিজ্ঞানের আদি প্রশ্ন। জর্ম্মাণ পণ্ডিতরা পরে অনেক হাড়ভাঙা গবেষণার ফলে আবিষ্কার করলেন যে, সাদা মানুষের জন্মস্থান হচ্ছে কালো বন (Black

Forest)—নামান্তরে জর্ম্মানী। যতদিন এ আবিষ্কার হয় নি, ততদিন *জর্ম্মান পেট্রিয়টিক পাণ্ডিত্যের ঘুম হয় নি।* *অন্যান্য ইউরোপীয়রা* এ আবিষ্কারে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হয় নি। ফরাসীরা বল্‌লে যে, ভারতবর্ষে যারা গিয়েছে তারা কখনই ফ্রান্সে জন্মায় নি, কারণ ফরাসীদেশে যারা জন্মায় তারা La belle France ছেড়ে স্বর্গেও যেতে রাজি নয়, ভারতবর্ষ ত অগ্নিকুণ্ড। আর ইংরাজরা লোকের জন্মভূমি নিয়ে মাথা বকায় না। পরের দেশকে আপন করাই হচ্ছে তাদের ঐতিহাসিক ধর্ম্ম, যেমন আপন দেশকে পরের করাই হচ্ছে ভারতবাসীর ঐতিহাসিক ধর্ম্ম। তারপর সম্প্রতি ইউরোপের মাটি গভীরভাবে খুঁড়ে দেখা গেছে যে, তার ভিতর পোঁতা আছে শুধু কাফ্রির করোটি ও কঙ্কাল। অর্থাৎ কৃষ্ণবনের আদ-বাসিন্দারা ছিল সব ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সুতরাং এখন হাতে-কোদালে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আর্য্য বলে কোনো জাত যখন ইউরোপে জন্মায় নি, তখন তারা পৃথিবীতে ছিল না। ও জীব আছে সুধু সাহিত্যে, এবং স্বনামে আছে সুধু সংস্কৃত সাহিত্যে; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যেও আর্য্য পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় আর্য্যপুত্র। আর সেকেলে আর্য্যপুত্রদের নিয়ে টানাটানি করত পণ্ডিতরা নয়—মেয়েরা।

আর্য্য ছিল না, কিন্তু আর্য্য মনোভাব আছে। ও একরকম অশরীরী আত্মা। আর ও আত্মা মাঝে মাঝে এর ওর দেহে ভর করে। আর তখন সে হয়ে ওঠে একজন ধনুর্ধর সাহিত্যিক।

(৩)

আর্য্য মনোভাবের লক্ষণ কি? কিসে ও বস্তুকে চেনা যায়? আর্য্যমনোভাব নাকি কখনো পুরুষের দাসমনোভাবকে আপনার

করেনি, কিন্তু আর্য্যরা স্ত্রীজাতির দাসীমনোভাবকে যে খুব আপনার করেছিলেন, তার দেদার দলিল সংস্কৃতে আছে, গদ্যে ও পদ্যে। কারও না কারও উপর প্রভুত্ব না করতে পারলে প্রভুমনোভাব বজায় রাখা যায় না। তাই প্রভুমনোভাবের চর্চ্চা করতে হয় নিত্যনিয়মিত। ইংরাজরা বলে Charity begins at home;—কথাটি ঠিক, কেননা প্রভুমনোভাবের চর্চ্চা ঘরে যত আরামে করা যায়, তার শতাংশের একাংশও বাইরে করা যায় না। বাইরে প্রথমত সুযোগের অভাব, দ্বিতীয়ত পরের উপর প্রভুত্ব খাটানোও নিরাপদ নয়। বিয়ে করলেই আমরা দেবতা হই--সুধু স্ত্রীর কাছে; তা'তে তেত্রিশ কোটীর সংখ্যা একাধিক হয় না। আর কার্য্যগতিকে ব্যাপারটা যদি তার উল্‌টো হয়— অর্থাৎ স্ত্রী যদি নিজগুণে দেবতা হয়ে ওঠেন, আর স্বামী হন তাঁর উপাসক—তাহলে সে সত্য আমরা পরদাচাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে পারি, সমাজকে এই আশ্বাস দেবার জন্য যে, আমাদের সনাতন স্বত্ব স্বামীত্ব সবই বজায় আছে—অন্তঃপুরে। অতুল বাবু বলেছেন যে, প্রভু-মনোভাব ও দাস-মনোভাব, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি উঁচুদরের তা বলা যায় না। আমি বলি এ সমস্যা উঠতেই পারে না, কারণ এর একটি মনোভাব অপরটির অপেক্ষা রাখে। ও দুইই তাই হয় সমান শ্রেষ্ঠ, নয় সমান নিকৃষ্ট। দাসমনোভাব দূর করতে পারলে প্রভুমনোভাব থাক্‌বে না, আর প্রভু-মনোভাব দূর করলে দাসমনোভাব থাক্‌বে না। আসলে ও দুইই একই মনে ঘর করে। আমরা প্রত্যেকেই কারও কাছে দাস, কারও কাছে প্রভু। যদি এই যমজকে বধ করা বর্ত্তমানে মানবের পক্ষে শ্রেয়স্কর হয়, তাহলেও ঐ দুটিকেই একসঙ্গে শুকিয়ে মারতে হবে। ওর একটিকে হৃষ্ট

করলে অপরটিও পুষ্ট হতে বাধ্য। আমরা যদি ঘরে স্ত্রীজাতির প্রতি প্রভু-মনোভাবকে দমন করতে পারি, তাহলে খুব সম্ভবত বাইরে পুরুষের প্রতি দাস-মনোভাব থেকে মুক্তিলাভ করব। স্মরণ করিয়ে দিই যে, Charity begins at home। দাস-মনোভাব থেকে নিস্কৃতি পাবার প্রধান উপায় হচ্ছে প্রথমে প্রভু-মনোভাব থেকে মুক্ত হওয়া। কথাটা শুনতে বিপরীত শোনায়, তার কারণ সত্য কথা চিরকালই অভ্যস্ত মিথ্যার উল্টো কথা। সুতরাং অতুল বাবুর আবিষ্কৃত আর্য্য মনোভাবকে সকলের পক্ষে একালে তামাদি গণ্য করাই শ্রেয়। যে প্রভুত্ব মানুষের মত মানুষের পক্ষে কাম্য, সে হচ্ছে নিজের উপর প্রভুত্ব। কিন্তু এ মনোভাব ডিমক্রাসির কাছে অগ্রাহ্য—কেননা এ হচ্ছে সাধনার ধন।

(৪)

তারপর অতুলবাবু বলেছেন যে, ইভলিউসনের হিসেবে মেষ শার্দ্দুলের চাইতে সভ্য জীব কি না, তাও বিচারাধীন। ইভলিউ-সনের পাকা হিসেব আমার নিকট অবিদিত। বিজ্ঞানের হিসেবে যা হয় হোক, কিন্তু মানুষের হিসেবে মেষ শার্দ্দুলের চাইতে নিশ্চয়ই ঢের বেশি সভ্য, অর্থাৎ মানুষের ঢের বেশি পছন্দসই জীব। মেষের সঙ্গে আমরা ঘর করতে পারি, শার্দ্দুলের সঙ্গে পারি নে। তারপর ভেড়ার লোমে আমরা পোষাক বানাই, আর সেই পোষাক পরে আমরা সভ্য হই। অপরপক্ষে মহাদেব ছিলেন একমাত্র কৃত্তিবাস দেবতা, আর মহাদেব যত বড়ই দেব হোন, কেউ তাঁকে কস্মিনকালে সভ্য বলেও নি, বল্‌বেও না। কিন্তু মেষের সভ্যতার সব চাইতে বড় দলিল হচ্ছে এই যে, ভেড়াকে আমরা খাই, আর বাঘ আমাদের খায়।

যে জীব মানুষকে যুগপৎ অন্নবস্ত্র দুইই জোগায়, সে যে অতি শ্রেষ্ঠ জীব, প্রকৃতি কোটী কোটী বৎসর ধরে সেই জীব যে মানুষের জন্য ধীরে সুস্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী করেছে, এ কথা মানুষ হয়ে কে অস্বীকার করবে? অন্নবস্ত্র বাদ দিলে সভ্যতার আর বাকী থাকে কি? মেষ যে সুধু সভ্য তাই নয়, সে মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে সভ্য করেছে, এবং তার সভ্যতা অদ্যাবধি বাঁচিয়ে রেখেছে। মটন না খেলে Darwin যে ইভলিউসান আবিষ্কার করতে পারতেন না, তা বলাই বাহুল্য।

অপর পক্ষে বাঘ মানুষের কোন কাজে লাগে না, এক কাব্যের উপমা ছাড়া। আর সে উপমার জন্য যে আমাদের বাঘের কাছেই যেতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। বাঘের বদলে সিংহ আমরা যেখানে সেখানে বসিয়ে দিতে পারি। ভারতচন্দ্র বলেছেন "কড়িতে বাঘের দুধ মেলে"। মিলতে পারে, কিন্তু সে দুধ খায় কে? সুতরাং এ কথা জোর করে বলা যায় যে, ব্যাঘ্র জাতির কোনরূপ economic value নেই। আর্য্যদের যে খুব ব্যাঘ্রপ্রীতি ছিল, এ ধারণা অতুল বাবুর হয়েছে সংস্কৃত কাব্যের উপমা পড়ে'। আর এ কথা যদি সত্য হয় যে আর্য্যদের খাদ্যখাদকের ভেদজ্ঞান ছিল না, তাহলে সে অভেদজ্ঞানের প্রশ্রয় আশা করি আপনি দেবেন না।

(৫)

নর-শার্দ্দূল আর্য্যাবর্ত্তের আদর্শ পুরুষ হতে পারে, কিন্তু মানুষকে বাঘ বানাবার বিদ্যা জানা ছিল হিন্দুস্থানের লোকের, কোম্পানির আমলে।

মধ্যপ্রদেশের দেওরির রাজা শ্রীমন্ত রামচন্দ্র রাও Colonel Sleeman-কে বলেছিলেন যে,—

"আমাদের বাড়ীতে রঘু বলে একজন ধোবা ছিল। সে ছিল একজন মস্ত মাতাল—যেমন সকল ধোবাই হয়ে থাকে। মানুষ বাঘ হলে তার মনোভাব কিরকম হয়, তাই জানবার জন্য রঘুর মনে একদিন এমনি অদম্য প্রবৃত্তি জন্মলাভ করলে যে, সে তখনি ছুটে জঙ্গলে গিয়ে দুটি শিকড় তুলে নিয়ে এল। তার একটি খেলে মানুষ বাঘ হয়, অপরটি খেলে বাঘ মানুষ হয়। রঘু তার স্ত্রীর হাতে একটি শিকড় দিয়ে বল্‌লে যে, আমি এই শিকড়টি খাচ্ছি, খাবামাত্র বাঘ হয়ে যাব। তুমি পাশে দাঁড়িয়ে থাক। যেই দেখবে আমি বাঘ হয়েছি, অমনি তোমার হাতের শিকড়টি আমার মুখে গুঁজে দিয়ো। স্ত্রী উত্তর করলে তথাস্তু। রঘু শিকড়টি খেতে না খেতেই একটি ভীষণ Royal Bengal Tiger হয়ে উঠ্‌ল দেখে, তার স্ত্রী ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। রঘু অগত্যা ঘর ছেড়ে বনে চলে গেল, আর একে একে তার সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে ভক্ষণ করলে। শেষটা গাঁয়ের লোক তাকে গুলি করে মারতে বাধ্য হল। তার মৃতদেহ দেখে সকলেই চিনতে পারলে যে, এ রঘু, কেননা নর-শার্দ্দুলের কোনও লাঙ্গুল থাকে না।"

Sleeman সাহেব যখন এ ঘটনায় অবিশ্বাস করেন নি, তখন আমরাও তা অবিশ্বাস করতে পারিনে। কর্ণেল সাহেব যে রামচন্দ্র রাওএর কথায় অবিশ্বাস করেন নি তার কারণ, শ্রীমন্ত ছিলেন গণেশের ন্যায় খর্ব্বকায়, ও কার্ত্তিকের ন্যায় রূপবান পুরুষ—বড়লোকের যেন একটি সুন্দর Pocket Edition। তারপর তিনি ছিলেন অসাধারণ

সদ্বংশজাত, মহাপণ্ডিত ঢোণ্ডে দত্তাত্রেয়ের বংশধর; উপরন্তু তিনি ছিলেন একজন perfect gentleman। আর সেকালে ঘোর মিথ্যাবাদী perfect gentleman হত না, কারণ কোম্পানির আমলে ভারতবর্ষের লোক আমাদের মত সভ্য ছিল না।

Sleeman সাহেব আরও বলেন যে, "সাগর" সহরের ত্রিশ হাজার লোকের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে এ ঘটনায় অবিশ্বাস করত। Mass mind-এর কাছে যা সত্য বলে গ্রাহ্য—আজকের দিনে কোন্ শিক্ষিত লোক তা অগ্রাহ্য করবে? আর ইংরাজি শিক্ষা লাভ করলেই যে অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস হারাতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। গুরুচরণ বাবু Sleeman সাহেবকে বলেছিলেন যে, স্ত্রীলোক যে সাপ হয়, এ তাঁর চোখে দেখা। গুরুচরণ বাবুর পিতামহের পাঁচটি গৃহিণী ছিল। তাদের মধ্যে দুটি অজগর সাপ হয়ে যায়। তাঁর পিতামহের মৃত্যু হলে এই পঞ্চ কন্যাই তাঁর সহমরণে যায়, তিনটি নারী আর দুটি সাপ। আর গুরুচরণ বাবু পিতামহের শ্রাদ্ধের দিন বৎসর বৎসর পাঁচটি পিতামহীরই শ্রাদ্ধ করতেন।

গুরুচরণ বাবু লোকটি কে? তিনি ছিলেন একে বাঙালী, তার উপর কলকাতার লোক। তিনি কলেজে পড়তেন না, কলেজে পড়াতেন। তিনি ছিলেন Jubbulpore College-এর Principal, এবং অতিশয় সুশিক্ষিত। Sleeman সাহেব বলেন যে, গুরুচরণ বাবু "speaks and writes English exceedingly well, and is decidedly a thinking man"। আজকাল কোনও ইংরাজি কাগজের বাঙালী সম্পাদককে এত বড় সার্টিফিকেট কোন ইংরেজ ত

দেবেই না, কোনও বাঙালীও দেবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং গুরুচরণ বাবুর মত ইংরাজী কথক, লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির সাক্ষ্য অমান্য করা চলে না। অতএব প্রমাণ হয়ে গেল যে, কোম্পানীর আমলে এ দেশে স্ত্রীলোক সাপ হত আর পুরুষ বাঘ হত। সুতরাং মানুষকে নর-শার্দ্দুল বানাবার জন্য আমাদের বৈদিক যুগে ফেরবার প্রয়োজন নেই। বছর পঞ্চাশ ষাট পিছু হট্‌লেই আমরা একটা হিন্দুস্থানী লুপ্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারব।

(৬)

সম্পাদক মহাশয়, আপনি হয়ত এ সব কথা শুনে একটু বিরক্তির স্বরে উত্তরে বলবেন যে, রঘুর উদাহরণ দেওয়ায় আর্য্যত্বের অপমান করা হয়, কারণ রঘু ছিল প্রথমত অস্পৃশ্য, দ্বিতীয়ত মাতাল। রঘুর শরীরে এ দুই দোষ যে ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। তবে যে মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে রঘু আপনাকে শার্দ্দুলে রূপান্তরিত করে, সে হচ্ছে ষোল-আনা আর্য্য-মনোভাব। রঘুর ভিতরকার প্রেরণা ছিল psychological,—physiological নয়। স্ববংশ নির্ব্বংশ করবার অভিপ্রায়ে রঘু বাঘ হতে চায় নি। শার্দ্দুলের মনোভাব আয়ত্ত করবার লোভেই সে নর-শার্দ্দুল হয়েছিল। এ লোভ হচ্ছে আধ্যাত্মিক উচ্চ আশা।

অবশ্য ব্যাঘ্রত্ব লাভের জন্য ধোবা বেচারা অনার্য্য উপায় অবলম্বন করেছিল। সে শিকড় খেয়েছিল, অর্থাৎ সে সাহায্য নিয়েছিল দ্রব্যগুণের, বিদ্যার নয়; matter-এর, spirit-এর নয়। কিন্তু এক-

মাত্র বিদ্যার সাহায্যেও নর যে শার্দ্দুল হতে পারে, তার প্রমাণ ঐ Sleeman সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্তেই আছে।

Sleeman সাহেব তাঁর বন্ধু মৈহারের রাজার সঙ্গে জব্বলপুর থেকে মির্জ্জাপুর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি রাজা বাহাদুরকে ও প্রদেশে বাঘের উপদ্রবের কথা বলেন। উত্তরে রাজা সাহেব বলেন যে, আসল বাঘের দৌরাত্ম্য দূর করা অতি সোজা, কিন্তু বিদ্যাবলে মানুষ যখন বাঘ হয়, তখন তাকে সামলানো অসম্ভব। এ কথা শুনে কর্ণেল সাহেব রাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন—"মানুষ কি করে বাঘ হয়?" রাজা সাহেব উত্তরে বলেন যে,—"যারা বিদ্যা অর্জ্জন করেছে, তাদের পক্ষে বাঘ হওয়া অতি সোজা। তবে ও বিদ্যে যে তারা কি করে' শেখে, তা আমাদের মত নিরক্ষর লোকেরা জানে না।" তারপর রাজা সাহেব এই গল্পটি তাঁকে শোনান।

এই মৈহারে একটি খুব বড় মন্দিরে একটি খুব বড় পুরোহিত ছিল, সে বিদ্যাবলে মাঝে মাঝে বাঘ হত। তার একটি সোনার কণ্ঠী ছিল, সে বাঘ হবামাত্র তার চেলারা তার গলায় সেটি পরিয়ে দিত। শেষটা বৃদ্ধ বয়সে সে বাঘ হবার অভ্যাস ছেড়ে দিলে। এক সময় যখন তার পুরোণো চেলারা সব তীর্থভ্রমণে গিয়েছিল, তখন হঠাৎ একদিন তার মনে বাঘ হবার দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি জেগে উঠ্‌ল। আর সে একটি নতুন চেলার হাতে সোনার কণ্ঠীটি দিয়ে তাকে আদেশ করলে যে, আমি যেই বাঘ হব, অমনি আমার গলায় এটি পরিয়ে দিয়ো। কিন্তু গুরুকে বাঘ হতে দেখে, চেলা বেচারা ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগ্‌ল। আর যে মুহূর্ত্তে তিনি বিকট গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন, তখন চেলার হাত থেকে কণ্ঠীটী মাটিতে পড়ে গেল। পুরোহিতপ্রবর

যখন দেখলেন যে ফিরেফিরতি মানুষ হবার উপায় নষ্ট হল, তখন তিনি মহা গর্জ্জন করতে করতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। তারপর গুরুজী বছরের পর বছর ধরে' অসংখ্য লোকের ঘাড় মট্‌কে তাদের রক্তমাংস আহার করতে লাগলেন।

এ গল্প শুনে Sleeman সাহেব প্রশ্ন করলেন :—
"Do you think, Raja Sahib, that the old highpriest is one of the tigers at the Katras pass ?"

কর্ণেল সাহেব পাছে উক্ত ব্রাহ্মণের উপর গুলি চালান, এই ভয়ে রাজা সাহেব সসম্ভ্রমে উত্তর করলেন—"No, I do not"। তার পরে রাজা সাহেব যে ক'টি কথা বলেন, সে কটি সোনার অক্ষরে লিখে সব আর্য্য-পণ্ডিতদের ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা উচিত। মৈহার রাজের কথা ক'টি এই :—"When men once acquire this science, they cannot help exercising it, though it be to their own ruin, and that of others"। যে মনোভাবকে অতুল বাবু আর্য্য মনোভাব বলেন, সে হচ্ছে আসলে জর্ম্মান-আর্য্য-মনোভাব, এবং সেই মনোভাবের kultur করার ফল হয়েছে their own ruin, and that of others। আপনি আশা করি বাঙালীর মনে এমন কোনও ভাব আনতে চান না, যার ফলে তারা স্বজাতির ঘাড় ভেঙ্গে খাবে, আর তাদের স্ত্রীরা সব হুড়কো হবে। আর যে ক'জন হবে না, তারা গুরুচরণ বাবুর পিতামহীর মত সাপ হবে, এবং শেষকাণ্ডে স্বামী শার্দ্দুলের সঙ্গে সহমরণে যাবে। বাঘ হবার মহা বিপদ এই যে, একবার বাঘ হলে আর মানুষ হওয়া যায় না। বেচারা রঘু ও বেচারা highpriest এ মহাসত্য সশরীরে আবিষ্কার করেছিল। একজন

মল' গুলি খেয়ে, আর বশিষ্ঠবংশাবতংসের কাজ হল শুধু অরণ্যে গর্জ্জন করা। দ্বিজু রায় আমাদের বলেছেন—"আবার তোরা মানুষ হ"—এই উপদেশই শিরোধার্য্য। মানুষ-জন্তুটি কি বলা কঠিন, কিন্তু এ জানোয়ার যে ভেড়াও নয় বাঘও নয়, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই; আর ও-দুয়ের মাঝামাঝি কোনও জীব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মানুষকে হয় মেষ নয় শার্দ্দুল করা হচ্ছে অর্থশাস্ত্রের আদর্শ, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নয়। আর সেকেলে আর্য্যদের কাছে অর্থের চাইতে যে ধর্ম্ম বড় ছিল, এ কথাটা বিনা বিচারে মেনে নেওয়া ভাল, কারণ আমরা নিজেদের তাঁদের বংশধর বলে' মনে করি।

(৭)

এখন সবুজের হিঁদুয়ানীতে ফিরে আসা যাক্। অতুল বাবুর একটি কথা নির্ভুল। তিনি বলেন যে, আর্য্য মনের প্রধান গুণ হচ্ছে ঋজু কাঠিন্য। যার চোখ আছে, আর্য্যমনের এ গুণ যে তার চোখে পড়বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ গুণ হচ্ছে æsthetical, কারণ ঋজুতা হচ্ছে form-এর একটা বিশেষ ধর্ম্ম। আর যার অন্তরে কিঞ্চিৎ কাঠিন্য নেই, অর্থাৎ যা অন্তঃসারশূন্য, তা কখনই ঋজু হতে পারে না,—মনোজগতেও নয় বস্তুজগতেও নয়, উদ্ভিদজগতেও নয় জন্তুজগতেও নয়। প্রাচীন সভ্যতা মাত্রেরই এই নয়ন-মনোমুগ্ধকর form অর্থাৎ আকার আছে, তা সে সভ্যতা গ্রীসেরই হোক্ আর ভারতেরই হোক। অপরপক্ষে বর্ত্তমান সভ্যতা মাত্রেই যে কদাকার, বর্ত্তমান সভ্যতার উমেদার ও মোসাহেবরা এ সত্য ভুলে গেছে। কিন্তু ঘটনা যে সত্য, তা একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখা যায়।

বর্ত্তমান সভ্যতার বীজমন্ত্র হচ্ছে দুটি কথা—*liberty* এবং progress, মুক্তি ও গতি। মুক্তি কাম্য গতিলাভের জন্য, আর গতি কাম্য মুক্তিলাভের জন্য। বাঢ়ং। মুক্তি জিনিষটে কি? আকারের বন্ধন থেকে মুক্তি। আর গতির লক্ষ্য কোন্ দিকে? বিকারের দিকে। চোখের মাথা খেয়ে দার্শনিক না হতে পারলে এই কিম্ভূতকিমাকার সভ্যতাকে আইডিয়াল বলে' চেনাও যায় না, মানাও যায় না। নবযুগ-ধর্ম্মী দার্শনিকরা মানুষকে লোভ দেখান যে, বর্ত্তমান সভ্যতার স্রোতে ভেসে চল্‌লে মানুষ চট্‌পট্ ভবিষ্যৎ সভ্যতায় গিয়ে পৌঁছবে, যেখানে মানুষমাত্রেই দেহে বাঘের মত খেতে পারবে ও মনে সাপের মত এগতে পারবে। সংক্ষেপে মানুষ যেখানে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পরমার্থ লাভ করবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে আস্থা রেখে সেই বীরপুরুষই বর্ত্তমান সভ্যতাকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে বুকে ধরতে পারেন, যিনি অর্থের লোভে কুরূপাকে বিয়ে করতে পারেন; ওরকম ইকনমিক বুকের পাটা সকলের নেই, সম্ভবত আপনারও নেই। তরলতার চাইতে সরলতাকে বেশি পছন্দ করার নাম যদি হয় হিঁদুয়ানি, তাহলে সে হিঁদুয়ানি অবশ্য সবুজ পত্রেরও ধর্ম্ম।

বীরবল।

পাঠকের কথা।

——:০:——

ভিতরে সত্যকারের প্রেরণা না থাকিলে কাহারও গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ লেখা উচিত নহে, এই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা অনায়াসে চলিতে পারে, যেহেতু সাহিত্যসৃষ্টির অপ্রেরণাই এ প্রবন্ধের প্রেরণা হইবে;—যেমন জাতীয় জীবনে আর আমাদের বক্তৃতার তিলমাত্র অবসর নাই, এই বিষয়ে তালপরিমাণ বক্তৃতাই সর্ব্বাপেক্ষা রসনাস্রাবী হয়। বক্তব্যটী নিশ্চয়ই পরিস্ফুট হইল না। কিন্তু তাহাই যদি উদ্দেশ্য থাকিবে, তবে উপমা দিলাম কেন? আমার সেটুকু ভাষাজ্ঞান আছে, যাহাতে আমি অনর্গল বলিয়া যাইব অথচ আপনারা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। অগভীর জল স্বচ্ছ হইলেই বিপদ, তাহার তল দেখা যায়। এলোমেলো ঘাঁটাইয়া তাহাকে নিয়ত ঘোলা না রাখিলে তাহা গভীর প্রতিপন্ন হয় না। যাহারা সাঁতার জানে না তাহারা ত ব্যাপার দেখিয়া তটস্থ হইয়াই থাকিবে; আর যে কয়জন সাঁতার জানেন, তাঁহারাই কাদার ভয় বেশী রাখেন। এতএব কোনদিক হইতে আশঙ্কার আর কারণ থাকে না।

আমি ভাবিয়া পাইনা এত লোক এত বাজে কথা কেন লেখে ও প্রকাশ করে। কণ্ডু গ্রস্তের নিজের দিক হইতে কণ্ডূয়ণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে স্বীকার করিলেও তাহা লোক-সমাজে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

আমার কথা অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক লেখকদের সম্বন্ধে খাটে না; কারণ অপ্রকাশিতকে প্রকাশিত করাই, অন্ধকার হইতে আলোকে আনাই তাঁহাদের ব্রত। তাঁহাদের রচনার গভীরতায় নামিতে নামিতে সকল আলো অন্ধকার হইয়া যখন কিছুই আর বুঝা যায় না, তখনই বেশ বুঝা যায় যে, তাহা প্রকৃত গবেষণামূলক ও অন্তঃপ্রেরণা সঞ্জাত। কেবল তাঁহাদের নিকট আমার সানুরোধ প্রস্তাব এই যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি সংক্ষেপে পর পর ফিরিস্তি করিয়া একসঙ্গে বলিয়া দেন, তাহা হইলেই আমরা বিশ্বাস করিয়া লইব। চরক ঋষি যে চরকার আবিষ্কারক এবং বাদরায়ণ যে দাক্ষিণাত্য হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রথম বাঁদর আনয়ন করেন, এসব আমরা তাঁহাদের মুখ হইতে শুনিলেই মানিয়া লইব; তাঁহারা যেন আর যুক্তিপ্রমাণের অছিলায় সমগ্র শিলালিপি নিরীহ পাঠকদের স্কন্ধে না চাপান। তবে তাঁহাদের স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রবোধার্থ 'হিমালয়' বা 'কিউনলুন্' নামে পৃথক 'মাসিক শিলালিপিকা' বাহির করিতে পারেন।

অধিকাংশ গল্পলেখক গল্প লিখিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা না করিয়া বাড়ীর ছেলে মেয়ে অথবা মেয়েছেলের নিকট নিজের বাহাদুরীর গল্প করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। আমি বুঝিতে পারি না প্রতিমাসে এত ভাল ভাল লোক এত বস্তা বস্তা মিথ্যা কথা লেখেন কেন? 'সদা সত্য কথা কহিবে' বলিয়াই, প্রায় একই নিশ্বাসে যেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণ স্বরূপ "গোপাল নামে এক বালক ছিল" এই ঘোরতর মিথ্যার অবতারণা করিলেন,—(কারণ বিদ্যাসাগরের গোপাল কখনও কোথাও ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপের অপেক্ষাও

সে মিথ্যা,)—সেই দিনই বোধহয় বাঙ্গালী সত্যের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল। তারপর হইতে চিরন্তন সত্য ফুটাইবার ছলে অজস্র মিথ্যাভাষণের আর অন্ত রহিল না। বিষ্ণুশর্ম্মা "কথাচ্ছলেন বালানাং" যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কি পাপে বালানাং পিতারা সেই ফল ভোগ করিতেছে, তাহা পরমপিতাই জানেন।

কবিতার উপর বাণক্ষেপ করা একটু কঠিন মনে করি; কারণ কবির দল এখনও 'ভীষ্মাভিরক্ষিত';—স্বয়ং বিশ্বকবি তাঁহাদের চালনা করিতেছেন। তথাপি বলিতে হয় যে, যদিও তিনি এই বয়সেও মাঝে মাঝে অল্পবয়সী কবিতা লিখিয়া আমাদের ভক্তহৃদয়কে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ আমাদের নানারূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার নিজের মনের বয়স নাই, একথা তিনি ত বলিয়াছেন, আমরাও পুনঃপুনঃ তাহার পরিচয় পাইতেছি, আর তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। কিন্তু বাকী সকলের পক্ষে ত সে কথা খাটে না। তাঁহাদের মন বৃদ্ধ হইয়া তরুণী কবিতার ফরমাসে মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ভিতরে যে স্থবির হইল, বাহিরটা তাহার স্থাবর হইলেই সামঞ্জস্য থাকে, শোভন হয়। ভাবের দিক হইতে তাঁহাদের কবিতা যতদূর জরাগ্রস্ত হইবার তাহা হইয়াছে, অথচ তার ছন্দ, অলঙ্কার একেবারে নবীনার মত। রং পাউডার মাখিয়া এক একটী বৃদ্ধা ইংরাজ মহিলা 'ডিঙি' মারিয়া নৃত্যচ্ছন্দে চলিবার চেষ্টা করেন; ইঁহাদের কবিতা পড়িয়া আমার সেই হাস্যজনক দৃশ্য মনে পড়ে। অন্যপক্ষে তরুণ কবিদের বলিতে পারি যে, বিবাহ হইয়াছে বা হয় নাই বলিয়াই কবিতা লিখিয়া প্রকাশিত করিবার অধিকার তাঁহাদের জন্মায় নাই। একদিন বৎসরের প্রারম্ভে উপরের

ছবিখানি দেখিয়া ভুলবশতঃ ভি, পি, গ্রহণ করার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যদি সারাবৎসর ধরিয়া পাঠকদের এসব 'মনসার কাঁদুনি' সহ্য করিতে হয়, তবে লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইতেছে বলিতে হইবে। একে নানা কষ্টের মধ্য দিয়া পাঠকদের জীবন যাত্রা। দিনে মনিবের তাড়া, রাত্রিতে ছেলের কান্না, প্রভাতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই অপ্রত্যাশিত পাওনা-দারের তাগাদা, সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিবার পরেই 'অম্বলের ব্যথা'। ইহার মধ্যে [illegible]বচারী নিতান্ত পয়সা দিয়াছে বলিয়াই রস সাহিত্য চর্চ্চার যেটুকু অবসর করিয়া লয়, সেটুকু তিক্ত করিয়া তুলিবার অধিকার নবীন কবিদের কে দিয়াছে? ঝঙ্কার আমরা গৃহেই যথেষ্ট শুনি। তথাপি নিতান্ত নিরর্থক কথায় পূর্ণ, ছত্রের পর ছত্র সমতালে কেবলমাত্র ধ্বনি শুনিবার লোভ যদি কোন পাঠকের থাকে তবে তিনি ধুনারি ডাকাইয়া লইবেন। কর্ণের পরিতৃপ্তিও হইবে, সঙ্গে সঙ্গে লেপতোষক তৈয়ারের ব্যবস্থাও হইতে পারিবে। লোকে সেতারীর কাছে যায়,—সঙ্গীত শুনিবার অভিলাষে; 'ডারে ডা' বা টুং টাং এর কসরতের খাতিরে নয়।

এতদিন মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ভেদে কবিতা দুই রকম দেখিতাম। অমিত্রাক্ষরে প্রকাশ্যমিল নাই; কিন্তু তাহার রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, গোপন মিল ও ছন্দের লীলা যে অব্যাহত বহিয়া যায়, আমার ন্যায় অনধিকারীর কানেও তা ধরা পড়ে। কিন্তু নিতান্ত সম্প্রতি এক 'বিচিত্রাক্ষর' কবিতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে মিলের ত চেষ্টা বা ইচ্ছা পর্য্যন্ত নাই, ছন্দেরও কোন বালাই নাই। অথবা যে ছন্দে জনযানপূর্ণ লালবাজার রোডের উপর দিয়া 'মোটর-ব্যাস্' ছুটে;—হঠাৎ গতিবৃদ্ধি করিয়া, হঠাৎ ব্রেক কসিয়া, হঠাৎ বামে যাইবার ভঙ্গী

দেখাইয়াই ঝাঁকি দিয়া পূরাদমে দক্ষিণ ভেদ করিয়া, কেবলমাত্র মোড়ের মাথায় (বা পৃষ্ঠার শেষে) পুলিশের তর্জ্জনীসঙ্কেতে বোকার মত একবার থামিয়া;—এ কবিতাও ঠিক সেই ছন্দের অনুসরণ করে। পাঠকেরা জানিত গদ্যের সহিত পদ্যের একটা আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, যেমন নরের সহিত নারীর। সকল নারী না[illegible] পূর্ণ গৌরবের অধিকারিণী হইতে পারেন না, কিন্তু তবুও [illegible] নারী তাহা বুঝিতে নিতান্ত আনাড়ীরও কোন দিন [illegible] হয় না,—সকলেরই কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত কোমল, সকলেই কিছু না কিছু অলঙ্কার বন্দন-প্রিয়, সকলেরই গমন অন্ততঃ শারীর বিদ্যার নিয়মেও, অল্পবিস্তর ছন্দোবদ্ধ। সেইরূপ কবিতা ভাল বা মন্দ হউক তাহাকে কবিতা বলিয়া চিনিতে এতদিন কোন কষ্ট ছিল না। কিন্তু এই বিচিত্রাক্ষর কবিতায় মাসিক বা সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় দুই পাশে অনেকটা স্থান বাদ দিয়া ছাপান হইয়াছে ছাড়া, কবিতার আর কোন চিহ্নই বর্ত্তমান দেখি না। 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' ইহা ভাল হউক মন্দ হউক, চিরদিন আমরা পদ্য বলিয়াই বুঝিয়া আসিতেছি। যেহেতু 'পাখীসব' তবুত 'করে রব'! এবং 'কাননে কুসুম কলি' একটিমাত্র অতিরিক্ত মিলের লোভে সত্যের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কবির ফরমাসে একেবারে 'সকলি ফুটিল'। উচ্চাঙ্গের না হইলেও এই সকলেই ইহার পদ্য প্রকৃতি ধরা পড়ে। কিন্তু বিচিত্রাক্ষর একটি কবিতাকে আমার এক বন্ধু cross word puzzle ঠিক করিয়া বাম হইতে দক্ষিণে পড়িয়া, পুনরায় উপর হইতে নীচে পড়িয়াছিলেন, তথাপি অর্থবোধের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এই 'বিচিত্রাক্ষর' মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বকবি একটু তাড়া

দিলে এখনও কাঁদিয়া উঠিতে পারে;—তাহা হইলেই পাঠকেরা সহ্য করিতে পারিবে, কারণ ছেলেকান্নার মধ্যেও তবু একটা ছন্দ আছে, *এবং পাঠকদের সেটা সহ্য করা অভ্যাস আছে।*

প্রবন্ধের সহিত নিবন্ধের কি পার্থক্য, তাহা পাঠকেরা ঠিক অবগত নহেন। তবে শুম্ভ ও নিশুম্ভের মধ্যে ঠিক প্রভেদ না জানিলেও দেবী-মাহাত্ম্য বুঝিবার বিশেষ ব্যাঘাত হয় না। প্রবন্ধের আমরা শেষের দিক প্রথমে পাঠ করি, অর্থাৎ লেখকের নাম দেখিয়া পছন্দ হইলে তবে পাঠ করি। সেইজন্য প্রায়ই আমাদের পাঠের কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। আর সময়ের ও ধৈর্য্যের অভাবে সব সময় পছন্দসই প্রবন্ধও শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া উঠিতে পারি না; তাহার ফলে মধ্যে মধ্যে 'আধকপালে' ধরিয়া কষ্টও পাই। তবে পলিটিক্সের গন্ধ থাকিলেই পলাণ্ডুযুক্ত ব্যঞ্জনের ন্যায় প্রবন্ধমাত্রেই অপেক্ষাকৃত স্বাদু হয়। সেই জন্যই ভাদ্রের সবুজ পত্র আমাদের ভাল লাগিয়াছে; কারণ, চরকাই বলুন আর হিন্দু-সভাই বলুন, এখন এ সবই পলিটিক্স। তথাপি স্বয়ং রবীন্দ্র নাথ যে তুচ্ছ চরকা লইয়া ২১ পৃষ্ঠা ধরিয়া উল্টা দিকে ঘুরাইবেন, তাহা আমরা কখনই প্রত্যাশা করি নাই। তিনি কি সত্যই আশঙ্কা করিয়াছেন যে, সমস্ত বাঙ্গালী জাতি বর্ণ ধর্ম্ম রুচি নির্ব্বিশেষে হয়ত একদিন চরকা কাটিতে বসিয়া যাইবে? আশঙ্কা বলিতেছি এইজন্য যে, বিপ্লবপন্থীর নিকট হইতে আশঙ্কার কারণ না হইলে, যেমন অর্ডিন্যান্স্ বাহির হইতে পারে না, তেমনি চরকা চলনের কিছু ভয় না থাকিলে চরকা দমনের প্রবন্ধও বাহির হইতে পারিত না। রবীন্দ্র নাথ চিরদিনই বলিয়া আসিতেছেন, এবং আমরাও আমাদের মত করিয়া বরাবর বুঝিয়া আসিতেছি যে, কোন একটী নিয়ম তা যত

ভালই হউক, সকলের পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না; তাহা প্রকৃতির অভীষ্টও নহে। বৈচিত্র্যই জীবন। সকলকে একই নিয়মে বাঁধিতে গেলে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার প্রতিক্রিয়া আসিয়া সমস্ত ব্যর্থ করিয়া দেয়। এরূপ চেষ্টা বিফল হওয়াই বরং শুভ, সফল হওয়া মৃত্যুরই নামান্তর। জগত যে বৈচিত্র্য ছাড়িয়া কিছুতেই এক নিয়মের বাঁধনে ধরা দিতে চাহে না, তাহার প্রমাণ চিরদিনই পাওয়া যাইতেছে এবং বাঙ্গালীও তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে জানে। বৈচিত্র্য রক্ষার খাতিরেই আমরা সকলে সত্যকথা কহি না, দুই ভাই এক অন্ন গ্রহণ করি না। একই স্ত্রীতে চিরদিন অনুরক্ত থাকিবার পক্ষেও এই বৈচিত্র্য জ্ঞানই বোধ হয় বাধা প্রদান করে। রসনা-বৈচিত্র্য জন্য সকলে অহিংস হইয়া উঠিতে পারিল না; রুচি-বৈচিত্র্য হেতু একই দেশে প্রস্তুত একই রকম মোটা কাপড় পরিতে পারিল না। তরুণ বিদ্যার্থীরা একবার হুড়মুড় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়াই পরক্ষণে তেমনি সশব্দে পুনঃ প্রবেশ করিল। এ সমস্তই বৈচিত্র্যের লীলা বলিয়াই আমরা বুঝি। ভাবের ক্ষেত্রে সকলে অহিংস হইয়া নির্ভয়ে সত্যকথা কহিতে থাকিবে। আর কর্ম্মের ক্ষেত্রে নিজের নিজের চরকা লইয়া তাহাতে তেল দিবে; সঙ্গে সঙ্গে চাষা ও বিদ্বানের মধ্যে ঐক্যসূত্র কাটিয়া উঠিবে, এরূপ বৈচিত্র্যহীন জীবন প্রকৃতই কখনও আসিতে পারে, এ আশঙ্কা বাঙ্গালী কোনদিন করে নাই। তাহার উপর সত্য কথন বা হিংসা বর্জ্জনের ন্যায় চরকা-কাটন কখনই একটা চিরন্তন সত্য নহে;—যেহেতু কোনও কারণে বস্ত্রের আমদানি বন্ধ হইলেও আমাদের যে চিরকাল বস্ত্র ব্যবহার করিতেই হইবে, তাহা কে বলিল? সুতরাং যদিবা কখনও সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধে সকলে একমতও হয়, চরকা

সম্বন্ধে যে আমরা কখনও ঐক্য লাভ করিব, এ ভয় মোটেই ছিল না। স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রবীন্দ্র নাথের নিকট ঠিক কি আশা করিয়াছিলেন ও তাহাতে নিরাশ হইয়া ঠিক কি বাক্যে রবীন্দ্রনাথকে এই প্রবন্ধের প্রেরণা প্রেরণ করিলেন, তাহা আমরা সম্যক অবগত ছিলাম না। স্যর প্রফুল্ল কি মনে করিতেছিলেন যে, বিশ্বকবির উচিত ছিল, বিশ্ব-সাহিত্যের উপযোগী করিয়া মাঝে মাঝে 'চরকার গান' লেখা? পাঠকদের কেহ কোনদিন তাহা আশা করেন নাই। এই বয়সে ও এই শরীরে তাঁহার মত লোক যে সভা করিয়া চরকার উপকারীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবেন, ইহাও কেহ মনে করিতে পারে না। গল্প বা উপন্যাসের উপাদান হইতে, 'চরকার' আরও কিছু দেরী লাগিবে, ইহাও সকলেই বুঝিতেছে। বাকী থাকে প্রবন্ধ লেখা। ২১ দিন উপবাসে থাকিয়াও যিনি নিয়মিত চরকা কাটা হইতে বিরত হন নাই, তাঁহার লিখিত পঠিত ও কথিত অসংখ্য প্রবন্ধেও যদি চরকা চলনের কোন সহায়তা না হইয়া থাকে, তবে বিশ্ব-কবির সুচতুর উপমাবহুল যুক্তিতে ও অসাধারণ রচনা নৈপুণ্যে প্রতারিত হইয়া যে সমস্ত লোক চরকা লইয়া বসিয়া যাইত, এই একান্ত দুরাশা স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র করিয়া-ছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু পাঠকদের মধ্যে কেহ কোনদিন তাহা পোষণ করেন নাই। কারণ বাঙ্গালী পাঠক বেশ জানে, ছাপার অক্ষরে পড়িতে যাহা যত ভাল লাগে, কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে তাহাই তত অনুপযোগী। সবুজ পত্রের প্রথম সংখ্যায় পাঠকেরা রবীন্দ্র নাথের প্রবন্ধ পড়িবার আশায় কিছুদিন হইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া-ছিল। সামান্য কারণে স্যর প্রফুল্লর নিকট কৈফিয়ৎ দিবার হিসাবে লিখিত এই দীর্ঘ অথচ অপ্রয়োজনীয় প্রবন্ধের দ্বারা আমরা নিজেদের

বঞ্চিত মনে করিতেছি। বিশেষতঃ রবীন্দ্র গান্ধীর মত বিভেদের মূলে রামমোহন রায় ও চরকা যে সমান স্থান অধিকার করিতেছে, এ কথার প্রাসঙ্গিকতাও আমাদের নিকট একান্ত অস্পষ্ট রহিয়া গেল। তবে মহাত্মার খাতিরে একবার চরকা কিনিয়া সুতা কাটিবার ভার সযত্ন পালিত মাকড়সার হাতে দিয়া আমরা যে একটু বৈচিত্র্য দেখাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কি যেন একটী লজ্জা ছিল। অথচ এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ নির্লজ্জ হইবার যে সব সুসঙ্গত কারণ ও অকাট্য যুক্তি সমস্ত জাতির পেটে গজ্‌গজ্‌ করিতেছিল কিন্তু প্রকাশ-কৌশল আয়ত্ত না থাকায় মুখে ফুটিতেছিল না স্বয়ং রবীন্দ্র নাথ মুখপাত্র হইয়া আমাদের সে লজ্জা নিবারণ করিলেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি।

সামান্য মক্ষিকা হইয়া ষট্‌পদোপদবী পাইবার দুরাশা আমার না থাকায়, যে সমস্ত লেখা পাঠকদের প্রকৃত আনন্দ দান করে, তাহার উল্লেখ করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। সুতরাং এই প্রবন্ধ বা নিবন্ধ যদি এইখানেই শেষ করি, তবে কি তাহাকে কেহ কবন্ধ বলিবেন? আমি তাহাতেই খুসি হইব, কারণ কবন্ধের সুবিধা অনেক;—চক্ষুলজ্জার দায় থাকে না, গালে চূণ কালী পড়িবার উপায় থাকে না, কপালে মার থাকে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

সম্পাদকের কথা।

——:০:——

ভাদ্র মাসের সবুজ পত্র পড়ে "মরীচিকা"র কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রস-পিপাসা যে পরিতৃপ্ত হয় নি, তার কারণ, তিনি ও-পত্রের প্রবন্ধনিবন্ধের ভিতর পলিটিক্‌সের গন্ধ পেয়েছেন। এর জন্য তাঁর দুঃখিত হওয়া উচিত নয়, কেননা তিনি ঐ গন্ধে আকৃষ্ট হয়েই চরকা ও হিন্দুসভা গলাধঃ করেছেন। ও দুটি যে "পাখী সব করে রব"-এর মত নিছক রস-সাহিত্য নয়, তা' তাঁর মত রসজ্ঞ মাত্রেই জানেন। কিন্তু যতীন বাবু একটু ধীরভাবে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতেন যে, যে গন্ধে তিনি প্রথমে আকৃষ্ট হয়ে পরে বিকৃষ্ট হয়েছেন, সে গন্ধ এ যুগে সাহিত্যে অপরিহার্য্য। পলিটিক্সের কাছে সাহিত্য অস্পৃশ্য হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের কাছে পলিটিক্‌স্ অস্পৃশ্য নয়। সাহিত্য মনের জিনিষ, পলিটিক্‌স্ জীবনের। জীবন ও মন, এ দুই অবশ্য এক জিনিষ নয়। প্রমাণ, মানুষে চিরকাল বিশ্বাস করে' এসেছে যে, জীবন গেলেও মন থাক্‌বে। আর এ বিশ্বাসের গোড়া এত শক্ত যে, দর্শন বিজ্ঞানের উপর্য্যুপরি প্রচণ্ড ধাক্কায় সে বিশ্বাসকে একেবারে উন্মূলিত করতে পারে নি। অপরপক্ষে এই দুটী বিভিন্ন পদার্থ ইহলোকে যে বিচ্ছিন্ন নয়, এ সত্যও প্রত্যক্ষ।

মনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হ'লে জীবন ফূর্ত্তি করে লম্ফ প্রদান করতে পারে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত-হলে মন অনেকটা পঙ্গু হয়ে

পড়ে, যদি তার কুম্ভকবিদ্যা আয়ত্ত না থাকে। ফলে পলিটিক্‌স্ *সাহিত্য হতে যত সহজে মুক্ত হতে পারে, সাহিত্য পলিটিক্‌স্ থেকে তত সহজে পারে না।* যতীন বাবুকে আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই দুটো মুখ আছে। তার একটা মুখ কর্ম্মের দিকে, আর একটা মর্ম্মের দিকে। যতীন বাবুর উপমার সাহায্যে কথাটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব। কেউ যদি বলে যে ঐ ঘোলা জল গভীর নয়, তাহলে তার সঙ্গত উত্তর এ নয় যে, "কে ঐ জলে ডুবে মরতে যাচ্ছিল" ?

যতীন বাবু বলেছেন যে, "চরকার" উপর প্রবন্ধ লেখবার রবীন্দ্র নাথের কোন প্রয়োজন ছিল না। কোন্ বিষয়ে লেখবার প্রয়োজন আছে, আর কোন বিষয়ে প্রয়োজন নেই, তা স্থির করবে কে ? লেখক না পাঠক ? পাঠক যে নয়, সে বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত নেই। কারণ পাঠকের সম্পূর্ণ এক্তিয়ার আছে, তাঁর কাছে যা অপ্রয়োজনীয় তা' না পড়বার; লেখককে ফরমায়েস দেবার অধিকার পাঠকের এ যুগে নেই। সম্ভবত যতীন বাবু, যে লেখা তাঁর মনোমত নয় তাকেই অপ্রয়োজনীয় বলেন। রবীন্দ্র নাথ যে চরকাকে একুশ পাতা ধরে উল্টো পাকে ঘুরিয়েছেন, এ ত যতীন বাবুরই কথা। এতে একদলের পলিটিসিয়ান-দের মাথা ঘুরে যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকদের কেন যে "আধকপালে ধরবে", সেকথা বুঝতে পারছিনে। যতীন বাবু বলেছেন যে, "চরকা" অতি তুচ্ছ পদার্থ। চরকা যদি অত তুচ্ছ পদার্থ হত, তাহলে পলিটিসিয়ানরা অনেকে চরকাসূত্র ছিঁড়ে পালিয়ে স্বরাট হতেন না, আর যতীন বাবুও তার উত্তর মীমাংসা করতে ব্রতী হতেন না। তিনি প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিদ্রূপ করে' বলেছেন যে, তাঁরা আবিষ্কার

করেছেন যে, চরকার উদ্ভাবন করেছেন চরক ঋষি। প্রত্নতত্ত্ব আমার খুব প্রিয় জিনিষ নয়, এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভয়ে অনেক সময় আমার কলম সরে না। হারাপ্পা ও মহেঞ্জ দারো আমার মনের সব সাজানো তাস ভেস্তে দিয়েছে। কিন্তু চরক ঋষি যে চরকার স্রষ্টা, প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের এ আবিষ্কার খুব সম্ভবত সত্য। কারণ চরকা হচ্ছে আমাদের সর্ব্বরোগের মহৌষধ।

চরকা যদি একটা যন্ত্রমাত্র থাক্‌ত, যা' পৃথিবীতে আবহমান ছিল আর আজও আছে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের সে বিষয়ে কিছু বলবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু চরকা যে এখন কর্ম্ম-জগত থেকে ধর্ম্ম-জগতে প্রমোশান পেয়েছে। এখন ত চরকা আর কর্ম্মের কল নয়, ধর্ম্মের কল হয়ে উঠেছে, তাই তা' নড়ছে এখন আমাদের মুখ-মারুতে। যখনই কোনও বস্তু matter-এর অধিকার থেকে বেরিয়ে spirit-এর রাজ্যে ঢোকে, তখনই তা' সাহিত্যের আমলে আসে। সুতরাং সবুজ পত্র চরকার বিচারে স্বাধিকারপ্রমত্ততার পরিচয় দেয় নি।

যতীন বাবুর উপমাতেই আবার ফিরে যাওয়া যাক্। চরকা নামক আধ্যাত্মিক মতটা যে এলোমেলো ঘাঁটিয়ে অতিশয় ঘোলা করা হয়েছে, সে বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং এই ঘোলা জলের গভীরতা কত, তা জানবার কৌতূহল কিছু অস্বাভাবিক নয়,—বিশেষতঃ সাহিত্যিকদের পক্ষে, কেননা তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা ঘোলা জলে মেটে না। বাঙালী বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিচারে সব চরকা কাট্‌তে বসে যাবে, এ আশঙ্কা যে রবীন্দ্রনাথের মনে উদয় হয়েছিল, তার প্রমাণ তাঁর একবিংশতি পত্রব্যাপী প্রবন্ধের এক ছত্রেও নেই। চরকার সূতো কাটায় তিনি কাউকে রত কি বিরত করতে চান নি—এই উপলক্ষ্যে

মনোজগতে যে সূতো কাটা হয়েছে, সে সূতো যে মানসিক লুতাতন্তু, এই হচ্ছে তাঁর বক্তব্য। অন্ততঃ আমি ত তাই বুঝেছি।

যতীন বাবু তাঁর ঘরের চরকা মাকড়সার হাতে সঁপে দিয়ে সলজ্জ ভাবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, কিন্তু মনের চরকাকে সকলে সমান খোস-মেজাজে মনোজগতের উর্ণনাভদের হস্তে ন্যস্ত করতে পারে না, নাভীপদ্ম থেকে অন্তঃপ্রেরণার বলে শারীরিক সূত্র বার করবার জন্য। রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে এ প্রবন্ধ লেখা যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ হওয়া।

এই সূত্রে যতীন্ বাবু একটা মহা দার্শনিক সমস্যা তুলেছেন। তাঁর মতে মানুষের পক্ষে নিয়মের অধীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ; অবশ্য সে নিয়ম যদি ভাল হয়। নিয়মটা ভাল কি মন্দ সেটা কিন্তু বিচার সাপেক্ষ। অতএব দাঁড়াল এই যে, নির্বিবিচারে কোনও নিয়ম মানাই মানুষের পক্ষে ভাল নয়, এবং অনেকের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু নিয়মওয়ালারা যা' একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না, সে হচ্ছে বিচারবুদ্ধি। তাঁরা মুখে যাকে নিয়ম বলেন, তার আসল নাম হচ্ছে আদেশ। আমরা যদি সবাই একের হুকুমের দাস হই, তাহলে সামাজিক জীবন যে নিখিরখিচে চলে যাবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? এ স্থলে একটা সেকেলে কথার উল্লেখ করি। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের মত law and order-এর পক্ষপাতী লোক পৃথিবীতে বোধহয় আর কোথাও ছিল না, কারণ তাঁরা ধর্ম্ম অর্থে বুঝতেন শুধু বিধি ও নিষেধ। কিন্তু ধর্ম্মকে তাঁরা অপৌরুষেয় বলেই জানতেন। অপৌরুষেয়ের মানে হচ্ছে যা' কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নয় এমন কি মহাপুরুষ কর্ত্তৃকও নয়।

কেননা তাদের মতে একের ভ্রান্তিতে জগৎ ভ্রান্ত হতে পারে না। মানবসমাজের law এবং order-কে তাঁরা বিশ্বের law এবং order-এর আনুষঙ্গিক মনে করতেন। প্রকৃতির law এবং order আমরা সবাই মানি, কেননা পেয়াদায় মানায়। আমরা সশরীরে উড়তে গেলে আমরা সশরীরে ধরাশায়ী হব, যেমন মাদক দ্রব্যের উত্তেজনায় মানুষ কখনো কখনো হয়ে থাকে। এই সৌর জগৎটা নিয়মে ঘুরপাক খাচ্ছে, আর যতীন বাবুর কবিতার ভাষায় "মাখন-মাখানো" পথে বেমালুম ঘুরছে। এর একমাত্র কারণ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ কারও দেহে মন নামক বালাই নেই। মানুষের পক্ষে হয়ত ঐরূপ মাখন-মাখানো পথে জীবনে বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাওয়াটা আইডিয়াল। দুর্ভাগ্যের বিষয় মানুষের অন্তরে মন নামক একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আছে, যা' তাকে জড়ের আইডিয়ালকে জীবনে পরিণত করতে দেয় না। মানুষকে যে জড়পদার্থ করে' গড়া হয়নি, তার জন্য দোষী তার সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং বাঙালীজীবনের ছন্দ যদি সত্যই বিচিত্রাক্ষর হয় (যা বস্তুগত্যা মোটেই নয়), তাহলে তার স্বচ্ছন্দতা প্রমাণ করে যে তার মন আছে। এ প্রমাণ পেয়ে সাহিত্যিকরা আনন্দ লাভ করে, পলিটিসিয়ানরা তাতে যতই নিরানন্দ হউন। যার ভিতর মন নেই, তা' মিত্রাক্ষরই হোক্ আর বিচিত্রাক্ষরই হোক্, সমান নিরক্ষর। জীবনেরও একটা মানে আছে, তা শুধু ছন্দোবদ্ধ ডারে ডা টুং টাং নয়।

যতীন বাবু "সবুজ পত্রের" চরকাবহির্ভূত অন্য কোনও লেখা স্পর্শ করেন নি। তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোকের বাঙলা করে' তার সবিনীত কারণ বলে' দিয়েছেন। তিনি বলেন তিনি মক্ষিকা, ষট্‌পদ হবার

দুরাশা তাঁর নেই, কেননা মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদা। কিন্তু এর আসল কারণ, অপর সব লেখা তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, কেননা তাদের ভিতর পলিটিক্সের পিঁয়াজের গন্ধ ছিল না। সবুজ পত্র নিরামিষ, সুতরাং পিঁয়াজ রশুনের "সাহিত্য" তাতে বেশি পাবার আশা করলে অহিংস রাজসিক রসনা তার অভ্যস্ত ও স্পৃহনীয় রসে বঞ্চিত হবে। যতীন বাবুকে স্মরণ করিয়ে দিই যে, পলিটিক্সেও মরীচিকা আছে, আর তা'ও সাহিত্যের বিষয়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

স্বরাজ সাধন

——:০:——

আমাদের দেশে বিজ্ঞ লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন যে, যত খুসি কথায় বল, লেখায় লিখোনা। আমি এ উপদেশ মানি নি, তার ভূরি প্রমাণ আছে। কিছু পরিমাণে মেনেওছি; সে কেবল উত্তর লেখা সম্বন্ধে। আমার যা বলবার তা বলতে কসুর করিনে; কিন্তু বাদ যখন প্রতিবাদে পৌঁছয়, তখন কলম বন্ধ করি। যতরকম লেখার বায়ু আছে ছন্দে এবং অছন্দে, সকলেরই প্রভাব আমার উপর আছে—কেবল উত্তর বায়ুটাকে এড়িয়ে চলি।

মত বলে যে একটা জিনিষ আমাদের পেয়ে বসে, সেটা অধিকাংশ স্থলেই বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে গড়া নয়, তার মধ্যে অনেকটা অংশ আছে যেটাকে বলা যায় আমাদের মেজাজ। যুক্তি পেয়েছি বলে' বিশ্বাস করি—সেটা অল্প ক্ষেত্রেই; বিশ্বাস করি বলে'ই যুক্তি জুটিয়ে আনি—সেইটেই অনেক ক্ষেত্রে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতই খাঁটি প্রমাণের পথ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; অন্য জাতের মতগুলো বারো আনাই রাগ বিরাগের আকর্ষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এ কথাটা খুবই খাটে যখন মতটা কোনো ফললোভের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই লোভ যখন বহুসংখ্যক লোকের মনকে অধিকার করে। সেই বহু লোকের লোভকে উত্তেজিত করে' তাদের তাড়া লাগিয়ে কোনো একটা পথে প্রবৃত্ত করতে যুক্তির প্রয়োজন হয় না,

কেবল পথটা খুব সহজ হওয়া চাই, আর চাই দ্রুত ফললাভের আশা। খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছুদিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেচে। গণ মনের এইরকম ঝোড়ো অবস্থায় এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বাদ প্রতিবাদ উত্তর প্রত্যুত্তর কেবলমাত্র বাগবিতণ্ডার সাইক্লোন আকার ধরে, সেই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে কোনো মতকে কোনো বন্দরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ; এমন সময়ে যেই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুবই সহজ এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয়, তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে' দিতে পারে, এ কথায় যারা মেতে ওঠে, তারা বুদ্ধি নেই বলে'ই যে মাতে তা' নয়, লোভে পড়ে' বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলে'ই তাদের এত উত্তেজনা।

অল্প কিছুদিন হ'ল স্বরাজ হাতের কাছে এসে পৌঁচেছে বলে' দেশের লোক বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তারপরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কথা উঠ্‌ল সর্ত্ত পালন করা হয়নি বলে'ই আমরা বঞ্চিত হয়েচি। এ কথা খুব অল্প লোকেই ভেবে দেখ্‌লেন যে, আমাদের সমস্যাই হচ্ছে সর্ত্ত প্রতিপালন নিয়ে। স্বরাজ পাবার সর্ত্ত আমরা পালন করিনে বলে'ই স্বরাজ পাইনে, এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দু মুসলমানে যদি আত্মীয়ভাবে মিলতে পারে, তাহলে স্বরাজ পাবার একটা বড় ধাপ তৈরি হয়, কথাটা বলাই বাহুল্য। ঠেক্‌চে ঐখানেই যে, হিন্দু মুসলমানের মিলন হল না; যদি মিল্‌ত তবে পাঁজিতে প্রতি বৎসরে

যে ৩৬৫টা দিন আছে, সব ক'টা দিনই হ'ত শুভদিন। এ কথা সত্য যে, পাঁজিতে দিন স্থির ক'রে দিলে নেশা লাগে, তাই ব'লে নেশা লাগলেই যে পথ সহজ হয়, তা বল্‌তে পারিনে।

পাঁজির নির্দ্দিষ্ট দিন অনেক কাল হ'ল ভেসে চলে গেছে, কিন্তু নেশা ছোটে নি। সেই নেশার বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন। একটি বা দুটি সঙ্কীর্ণ পথই তার পথ। সেই পথের অন্তর্গত হয়ে পড়েচে চরকা।

তাহলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়—স্বরাজ জিনিষটা কি? আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সুতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটিনে তার কারণ কলের সুতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সুতো পাল্লা রাখ্‌তে পারে না। হয় ত পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনা মূল্যের অবসর-কাল সুতো কাটায় নিযুক্ত ক'রে চরকার সুতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা যে সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশে যাঁরা চরকার পক্ষে লেখনী চালাচ্চেন, তাঁরা অনেকেই চরকা চালাচ্চেন না।

দ্বিতীয় কথা হচ্চে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে। কিন্তু সেও স্বরাজ নয়। না হোক, সেটা অর্থ বটে ত। দারিদ্র্যের পক্ষে সেই বা কম কি? দেশের চাষীরা তাদের অবসরকাল বিনা উপার্জ্জনে নষ্ট করে; তারা যদি সবাই সুতো কাটে, তাহলে তাদের দৈন্য অনেকটা দূর হয়।

স্বীকার করে' নেওয়া যাক্ এও একটা বিশেষ সমস্যা বটে। চাষীদের উদ্বৃত্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে। কথাটা শুনতে যত

সহজ, তত সহজ নয়। এই সমস্যার সমাধান ভার যদি নিতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে বুদ্ধির দুরূহ সাধনা দরকার। সংক্ষেপে বলে' দিলেই হ'ল না—ওরা চরকা কাটুক।

চাষী চাষকরা-কাজের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েচে। চাষের পথই তার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখনই সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে' কাজ করে না, এ অপবাদ তা'কে দেওয়া অন্যায়। যদি সম্বৎসর তার চাষ চল্‌তে পারত, তাহলে বছর ভরেই সে কাজ করত।

চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এই যে, তা'তে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আরেকটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা চাই। কিন্তু চাষ প্রভৃতি মজুরীর কাজ লাইন-বাঁধা কাজ। তা' চলে ট্রামগাড়ির মত। হাজার প্রয়োজন হ'লেও লাইনের বাইরে নতুন পথ তার পক্ষে সহজ নয়। চাষীকে চাষের বাইরে যে-কাজ করতে বলা যায়, তা'তে তার মন ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে যায়। তবু ঠেলে ঠুলে তাকে হয়ত নাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তা'তে শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে।

বাংলাদেশের অন্তত দুই জেলার চাষীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন, তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এক জেলা এক-ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপন্ন করতে চাষীরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। তারপরে তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসরকালে সব্‌জি উৎপন্ন করতে

পারত। উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাই নি। যারা ধান চাষের জন্য প্রাণপণ করতে পারে, তারা সব্‌জি চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সব্‌জির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।

আরেক জেলায় চাষী ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকলরকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু যে জমিতে এ সব শস্য সহজে হয় না, সে জমি তাদের বৃথা পড়ে' থাকে, তার খাজনা বহন করে' চলে। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চল থেকে চাষী এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে' নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষী এই অনভ্যস্ত ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে চাষী পাটের ফলন করে, তা'কে স্বভাবত অলস বলে' বদনাম দেওয়া চলে না। শুনেছি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কোথাও পাট উৎপন্ন করা কঠিন নয়, কিন্তু সেখানকার লোকেরা পাট প্রস্তুত করার দুঃসাধ্য দুঃখ বহন করতে নারাজ। বাংলাদেশে-যে পাট একচেটে, তার একমাত্র কারণ এখানকার জমিতে নয়, এখানকার চাষীতে। অথচ আমি দেখেচি এই চাষীই তার বালু জমিতে তরমুজ ফলিয়ে লাভ করবার দৃষ্টান্ত বৎসর বৎসর স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও এই অনভ্যস্ত পথে যেতে চায় না।

যখন কোনো একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয়, তখন মানুষের মনকে কি করে' এক পথ থেকে আর এক পথে চালানো যায়, সেই শক্ত কথাটা ভাবতে হয়; কোনো একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাৎলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয়, তা বিশ্বাস করিনে,—মানুষের

মনের সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করাই হ'ল গোড়ার কাজ। "হিন্দু মুসলমানের মিলন হোক্", বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষ্যে হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কেননা সেরকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন কি নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে; সেটা দুরূহ সন্দেহ নেই—তবু "এহ বাহ্য।" কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মিলনের উদ্দেশে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানেই ঠেকেচে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজ প্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয়পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজিনবীশের কথা জান্‌তেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর সমস্তই রুচিপূর্ব্বক আহার করতেন, কেবল গ্রেট্ ঈষ্টারণের ভাতটা বাদ দিতেন—বলতেন মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠ্‌তে চায় না। যে-সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে, সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিল্‌তে তাঁর বাধবে। ধর্ম্মনিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত, সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দুমুসলমান-বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে, খিলাফতের আনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগস্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।

আমাদের দেশের এই সকল সমস্যা আন্তরিক বলে'ই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বল্‌লে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কারণে একটা

অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুন্‌লেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ঠিক পথে অর্থ উপার্জ্জনের বাধা যার অন্তরের মধ্যে আছে, সেই ব্যক্তিই জুয়ো খেলে রাতারাতি বড়মানুষ হবার দুরাশায় নিজের সর্ব্বনাশ কর্‌তেও প্রস্তুত হয়।

চরকা কাটা স্বরাজ সাধনার প্রধান অঙ্গ, এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে, তবে মান্‌তেই হয় সাধারণের মতে স্বরাজটা একটা বাহ্য ফললাভ। এই জন্যই, দেশের মঙ্গলসাধনে আত্মপ্রভাবের যে-সকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে, সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিস্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায়। এমন অবস্থায় ধ'রেই নেওয়া যাক যে, চাষীরা তাদের অবসর-কাল যদি লাভবান কাজে লাগায়, তাহলে আমাদের স্বরাজ লাভের একটা প্রধান অন্তরায় দূর হতে পারে; ধ'রেই নেওয়া যাক্ এই বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সব চেয়ে আজ পরম চিন্তনীয়।

তাহলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে চাষীদের অবকাশকালকে সম্যকরূপে কি উপায়ে খাটানো যেতে পারে। বলা বাহুল্য চাষের কাজে খাটাতে পারলেই ঠিক রাস্তাটা পাওয়া যায়। আমার যদি কঠিন দৈন্যসঙ্কট ঘটে, তবে আমার পরামর্শদাতা হিতৈষীকে এই কথাই সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে যে, আমি দীর্ঘকাল ধরে' সাহিত্য রচনাতেই অভ্যস্ত। বাগ্‌ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর যতই অশ্রদ্ধা থাক্, আমার উপকার করতে চাইলে এ কথা তিনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। তিনি হয়ত হিসাব খতিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারেন যে, ছাত্রদের জন্যে কলেজ-পাড়ায় যদি চায়ের দোকান খুলি, তাহলে

শতকরা ৭৫ টাকা হারে মুনফা হতে পারে। হিসাব থেকে মানুষের মনটাকে বাদ দিলে লাভের অঙ্কটাকে খুব বড় করে দেখানো সহজ। চায়ের দোকান করতে গিয়ে আমি-যে নিজেকে সর্ব্বস্বান্ত করতে পারি তার কারণ এ নয় যে, সুযোগ্য চা-ওয়ালার মত আমার বুদ্ধি নেই, তার কারণ চা-ওয়ালার মত আমার মন নেই। অতএব হিতৈষী বন্ধু যদি আমাকে ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখ্‌তে বা স্কুল-কলেজপাঠ্য বিষয়ের নোট্‌ লিখ্‌তে বলেন, তবে নিতান্ত দায়ে ঠেক্‌লে হয় ত সেটা চেষ্টা দেখতে পারি। আমার বিশ্বাস চায়ের দোকান খোলার চেয়ে তা'তে আমার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা কম হবে। লাভের কথায় যদিবা সন্দেহ থাকে, অন্তত এ কথাটা নিশ্চিত যে, সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেক্‌টিভ গল্পের লাইনে সুইচ্‌ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।

চিরজীবন ধরে' চাষীর দেহমনের যে-শিক্ষা ও অভ্যাস হয়েছে, তার থেকে তা'কে অকস্মাৎ ঠেলে ফেলে দিয়ে তা'কে সুখী বা ধনী করা সহজ নয়। পূর্ব্বেই বলেছি, মনের চর্চ্চা যাদের কম, গোঁড়ামি তাদের বেশি—সামান্য পরিমাণ নূতনত্বেও তাদের বাধে। নিজের প্ল্যানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অনুরাগ বশত মনস্তত্ত্বের এই নিয়মটা গায়ের জোরে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করলে, তা'তে মনস্তত্ত্ব অবিচলিত থাকবে, প্ল্যানটা জখম হবে।

চাষীকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অন্যান্য কোন কোন কৃষিক্ষেত্রবহুল দেশে চলেচে। সে সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তর উন্নতি করেচে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জমি

থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করচে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই পথ আবিষ্কারে মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। চাষের উৎকর্ষ উদ্ভাবনের দ্বারা চাষীর উদ্যমকে ষোলো আনা খাটাবার চেষ্টা না করে' তা'কে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তিহীনতার পরিচয়। আমরা চাষীকে অলস বলে' দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তা'কে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই, তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।

এতক্ষণ এই যা আলোচনা করা গেল, এটা এই মনে করে'ই করেচি যে, সুতো ও খদ্দর বহুল পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হ'লে, তা'তে একদল শ্রমিকের অর্থকষ্ট দূর হবে। কিন্তু সেও মেনে-নেওয়া কথা। এ সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করে'ও থাকেন। আমার মতো আনাড়ির সে তর্কে প্রবেশ করে' কাজ নেই। আমার নালিশ এই যে, চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত ক'রে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্চে।

দেশের কল্যাণ বল্‌তে যে কতখানি বোঝায়, তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোট করে' দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবী কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জ্জীব হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণ সাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে' তোলবার উপায়। দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে' রাখলে দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয়

ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোট করি, আমাদের সাধনাকেও ছোট করা হবে। পৃথিবীতে যারা দেশের জন্যে মানুষের জন্যে দুঃসাধ্য ত্যাগস্বীকার করেছে, তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাটরূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই, তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার। বহুল পরিমাণ সুতো ও খদরের ছবি দেশের কল্যাণের বড় ছবি নয়। এ হ'ল হিসাবী লোকের ছবি, এ'তে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবী শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না, যা' বৃহতের উপলব্ধিজনিত আনন্দে কেবল যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।

শিশু আনন্দের সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে। কেননা সে আপন বাপের মুখে মায়ের মুখে সর্ব্বদাই ভাষার সমগ্র রূপটা দেখ্‌তে পায়। যখন সে স্পষ্ট করে' বুঝতেও পারে না, তখনো এইটেই তা'কে কেবলি আকর্ষণ করে। তাই এই প্রকাশের পূর্ণতা লাভের জন্য নিয়তই তার একটি আনন্দময় চেষ্টা জেগে থাকে। শিশুর মনকে বেষ্টন করে' যদি এই পরিপূর্ণ ভাষা সর্ব্বদা বিরাজ না করত, যদি তার চারদিকে কেবলি ঘুরতে থাকত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র, তাহলে বেতের চোটে কাঁদিয়ে তাকে মাতৃভাষা শেখাতে হ'ত, এবং তাও শিখতে লাগ্‌ত বহু দীর্ঘকাল।

এই কারণে আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজ সাধনায় সত্য ভাবে দীক্ষিত করতে চাই, তাহলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ-গোচর করে' তোলবার চেষ্টা করতে হবে। অল্পকালেই সেই মূর্ত্তির

আয়তন যে খুব বড় হবে, এ কথা বলিনে; কিন্তু তা' সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবী করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিষের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে' চলে। তা' যদি না হ'ত, তাহলে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত—তারপরে সেটা ধীরে ধীরে হ'ত হাঁটু পর্য্যন্ত পা; তারপরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে—তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই। সেই আনন্দে তাকে মানুষ করে' তোলবার কঠিন দুঃখও মা বাপ স্বীকার করতে পারে। নইলে যদি একখানা আজানু পা নিয়েই তাদের চার পাঁচ বছর কাটাতে হ'ত, তাহলে সেই আংশিকের দাসত্ব তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ত।

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো আকারেই দেখতে থাকি, তাহলে আমাদের সেই দশাই হবে। এইরকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মত লোক হয়ত কিছুদিনের মত আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে' গণ্য করে। আমি মনে করি, এরকম মতি স্বরাজ লাভের পক্ষে অনুকূল নয়।

স্বদেশের দায়িত্বকে, কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্ ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোট ছোট আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিষটা অনেক-গুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে' নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের

সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তা'তে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো না কোনো আকারে গ্রহণ ক'রে একটি সুস্থ জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কা'কে বলে, সে আমরা সুতো কেটে, খদ্দর পরে', কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিষটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই, ভারতবর্ষের কোনো একটা ক্ষুদ্র অংশে তা'কে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়, তাহলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। তাহলে আত্মপ্রভাবের যে কি মূল্য তা' বুঝতে পারব ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্ম-শক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে, তাহলেই স্বদেশকে স্বদেশ রূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে—কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালবাসতে পারে।' আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্চে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে' তুলচে না, এই জন্যে তাদের পরস্পর মিলনের কোনো গভীর উপলক্ষ্য নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের

অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্ম্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন। নানা পথে এক লক্ষ্য অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশসৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ করে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। যদি এইরকম উদ্যোগকে আমরা আয়তনে ছোট বলে' অবজ্ঞা করি, তবে গীতার সেই কথাটা যেন মনে আনি,—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সত্যের জোর আয়তনে নয়, তার আপনাতেই।

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চ্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরব-বোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হ'লে, তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব, আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জন-সঙ্ঘের এই চিত্তদৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এ দেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে,—তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে' আনে। বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে, সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ—অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি ক'রে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষ সাধন হয়। বেঁচে থাকবার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, আমার

প্রাণ আছে। কেউ কেউ হয়ত বল্‌তেও পারেন যে, সুতো কাটাও সৃষ্টি। তা' নয়। তার কারণ, চরকায় মানুষ চরকারই অঙ্গ হয়; অর্থাৎ যেটা কল দিয়ে করা যেত, সে সেইটেই করে। সে ঘোরায়। কল জিনিষটা মনোহীন বলেই সে একা, নিজের বাইরে তার কিছুই নেই। তেমনি যে-মানুষ সুতো কাটচে সেও একলা, তার চরকার সূত্র অন্য কারো সঙ্গে তার অবশ্যযোগের সূত্র নয়। তার প্রতিবেশী কেউ যে আছে, এ কথা তার জানবার কোনো দরকারই নেই। রেশমের পলু যেমন একান্ত ভাবে নিজের চারদিকে রেশমের সুতো বোনে, তারও কাজ সেইরকম। সে যন্ত্র, সে নিঃসঙ্গ, সে বিচ্ছিন্ন। কন্‌গ্রেসের কোনো মেম্বর যখন সুতো কাটেন, তখন সেই সঙ্গে দেশের ইকনমিক্‌স্‌-স্বর্গের ধ্যান করতেও পারেন, কিন্তু এই ধ্যানমন্ত্রের দীক্ষা তিনি অন্য উপায়ে পেয়েছেন---চরকার মধ্যেই এই মন্ত্রের বীজ নেই। কিন্তু যে মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্যোগ করচে, তাকে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিতে ও অন্তে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারি কাজে স্বরাজ সাধনার সত্যকার আরম্ভ বটে। তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয়, তাহলেই বুঝব গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে যথার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্চে। এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজ লাভ। পরিমাণ হিসেবে কম হলেও, সত্য হিসাবে কম নয়। অর্থাৎ শতকরা একশো'র হারে লাভ না হলেও হয়ত শতকরা একের হারে লাভ;—

এই লাভই শতকরা একশো'র সগোত্র, এমন কি, সহোদর ভাই। যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্ন উপার্জ্জনে, আনন্দ বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে, সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের পথে প্রদীপ জেলেছে। তারপরে একটা দীপের থেকে আরেকটা দীপের শিখা জালানো কঠিন হবেনা, স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

নবম বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

ম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শেষ বর্ষণ।

রাজা। পারিষদবর্গ।

নটরাজ। নাট্যাচার্য্য ও গায়ক-গায়িকা।

গান আরম্ভ।

রাজা।

ওহে থামো তোমরা, একটু থামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালা গানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।

নটরাজ।

(পুঁথি দিয়া) এই নিন্ মহারাজ।

রাজা।

তোমাদের দেশের অক্ষর ভাল বুঝতে পারিনে। কি লিখ্‌ছে? "শেষবর্ষণ"।

নটরাজ।

হাঁ মহারাজ।

রাজা।

আচ্ছা বেশ ভাল। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ।

কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তারপরে জগতে তার মত অদরকারী আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না। তাই সে পালিয়েছে।

রাজা।

পরিহাস ব'লে ঠেকচে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালালো কেন?

নটরাজ।

পাছে মহারাজ ব'লে বসেন, ভাব, অর্থ, সুর, তান, লয়, কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা সেই ভয়ে। লোকটা বড় ভীতু।

রাজ-কবি।

এ তো বড় কৌতুক! পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলো ঝাপ্‌সা।

রাজা।

তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ।

ক্ষতি হবে না,—গানগুলো সুদ্ধ পালান নি। অস্তসূর্য্য নিজে লুকিয়েচেন কিন্তু মেঘে মেঘে রং ছড়িয়ে আছে।

রাজ-কবি।

তুমি বুঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড় সাদা।

নটরাজ।

ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রং খুলতে থাকবে।

রাজা।

কিন্তু আমার রাজবুদ্ধি, কবির বুদ্ধির সঙ্গে যদি না মেলে? আমাকে বোঝাবে কে?

নটরাজ।

সে ভার আমার উপর। ইসারায় বুঝিয়ে দেব

রাজা।

আমার কাছে ইসারা চলবেনা। বিদ্যুতের ইসারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা নেই। আমি স্পষ্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কি দিয়ে ?

নটরাজ।

বর্ষাকে আহ্বান ক'রে।

রাজা।

বর্ষাকে আহ্বান ? এই আশ্বিন মাসে ?

রাজ-কবি।

ঋতু-উৎসবের শব সাধনা ? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে তুলবেন! অদ্ভুত রসের কীর্ত্তন।

নটরাজ।

কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তারপরে আলো।

রাজা (পারিষদের প্রতি)

মানে কি হে ?

পারিষদ।

মহারাজ, আমি ওঁদের দেশের পরিচয় জানি। ওঁদের হেঁয়ালি বরঞ্চ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজ-কবি।

যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, টান্‌লে আরও বাড়্‌তে থাকে।

নটরাজ।

বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তাহলেই সহজে বুঝবেন। জুঁই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা।

বোসো বোসো। বর্ষাকে ডাকা কি রকম? বর্ষা ত নিজেই ডাক দিয়ে আসে।

নটরাজ।

সেত আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা।

গানের সুরগুলো কি কবিশেখরের নিজেরি বাঁধা?

নটরাজ।

হাঁ মহারাজ।

রাজা।

এই আর এক বিপদ।

রাজ-কবি।

নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্ত্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্ব্বদলকে খবর দিন না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক্ তাহলে কবির পক্ষে "শেষ বর্ষণ" নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ।

রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উল্টে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খৎ দিয়ে চলতে থাকে তবে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অন্তত আমার দেশের চাল এ রকম নয়।

রাজা।

ওহে নটরাজ, রস জিনিষটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিষটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা নাই পাই, রাগিণীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলেন তাহলে তো আমার মতো লোকের মুস্কিল।

নটরাজ।

মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাত্মা।

পারিষদ।

অলমতি বিস্তরেণ। তোমাদের ধর্ম্ম যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মত সহ্য করব।

নটরাজ। (গায়ক গায়িকাদের প্রতি)

ঘন মেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী, কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে,
এস কর স্নান নবধারা জলে॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পর দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্ম্মরে।
ঘন বরিষণে জল-কলকলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

নটরাজ।

মহারাজ এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা।

ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সবচেয়ে দুর্গম।

নটরাজ।

গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করচেন কি, প্রাণের আকাশে পূব হাওয়া মুখর হয়ে উঠ্‌ল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝর ঝর'।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর
বিরহকাতর শর্ব্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্ম্মরি॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি॥

নটরাজ।

শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারার একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না। ঐ শুনুন মহারাজ মেঘমল্লার।

কোথা যে উধাও হ'ল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে ॥

রাজা।

পূব দিকটা আলো হয়ে উঠ্‌ল যে, কে আসে?

নটরাজ।

শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজ-কবি।

শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে ইসারায়।

রাজা।

নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও ত বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ।

মহারাজ, বসন্ত পূর্ণিমাই ত অপূর্ণ! তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমার জিৎ, কান্না বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালা বদল। ওগো কলস্বরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো, ও কী আনলে?

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল ॥

বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল ॥
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপন লোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে
জানে না সে পাবে কারে,
আসা যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল ॥

রাজা।

বেশ, বেশ এটা মধুর লাগল বটে।

নটরাজ।

কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর? সেও তো অসম্পূর্ণ?

রাজা।

ঐ দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই বুঝি?

নটরাজ।

মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্ব্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা ॥

তোমার মন্ত্র বলে
পাষাণ গলে ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা ॥
মর মর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে ?
সবুজ সুধার ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী
বন্যা মরণ ঢালা।

রাজা।

সব রকমের ক্ষ্যাপামিই ত হল। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইল কী ?

নটরাজ।

বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখ্‌লে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ", সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আন্‌মনা, তারই গান হবে।' নাট্যাচার্য্য, ধর হে,—

পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী ॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী ॥

ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিল্‌বে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী ॥

নটরাজ।

বিরহীর বেদনা রূপ ধরে দাঁড়ালো, ঘন বর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেলো কিন্তু ওর বাণীটি আছে, তোমার কণ্ঠে মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা ॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা ॥

রাজা।

আর নয় নটরাজ বিরহের পালাটাই বড় বেশী হয়ে উঠ্‌লো, ওজন ঠিক থাক্‌চে না।

নটরাজ।

মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারদিকে ছল ছল করচে, মিলন পদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।

রাজ-কবি।

তাই না হয় হোলো। কিন্তু অশ্রু বাষ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে, একেবারে লুকিয়ে ফেল্‌লে ত চল্‌বেনা।

নটরাজ।

মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড় মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য্য একবার শুনিয়ে দাও ত।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে ॥
উৎসব সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে ॥

রাজা।

আঃ, এতক্ষণে একটু উৎসাহ লাগলো। থাম্‌লে চল্‌বে না। দেখ না, তোমাদের মাদলওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়েছে, ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ।

বলি ও ওস্তাদ, ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুট্‌লো, ওরা যে ক্ষ্যাপার মত চলেচে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলো না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বুক ফুলিয়ে যাত্রা জমে উঠুক্ না সুরে, কথায়, মেঘে, বিদ্যুতে, ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে।
মনরে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে॥
দিক-হারানো দুঃসাহসে,
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে॥
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে;
সর্ব্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে কর্‌বি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস্ আপ্‌নারে তুই
প্রলয় রাতের ক্রন্দনে॥

রাজ-কবি।

ঐরে আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজ্ঞানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। মহারাজ, আর দেরী নেই, আবার কান্না নামলো বলে।

নটরাজ।

ঠিক ঠাউরেচ। বোধ হচ্চে চোখের জলেরই জিৎ। বর্ষার রাতে সাথী-হারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো; আজ বুঝি বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা, ভৈরবীতে করুণ সুর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে॥
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে॥

বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে ॥

রাজা।

কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই ত খণ্ড খণ্ড করে হোলো এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ।

ভাল কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য্য, তবে ঐটে সুরু করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল-চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।

ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥

আন মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় কর নবগীত রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ কর সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁক নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকসিত বয়নে;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে॥

এসেছে বরষা এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেকযুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা ॥

রাজা।

বাঃ বেশ জমেচে। আমি বলি আজকের মত বাদলের পালাই চলুক।

নটরাজ।

কিন্তু মহারাজ দেখ্‌চেন না, মেঘে মেঘে পালাই-পালাই ভাব। শেষ কেয়াফুলের গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ায় ভ'রে উঠ্‌লো। ঐ যে, "এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী।

একলা বসে বাদল শেষে শুনি কত কী।
"এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী ॥
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তা'রে
ডেকে গেল আকাশ পারে,
তাইতো সে যে উদাস হ'ল
নইলে যেত কি ॥
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠ্‌ত কেঁপে তড়িৎ আলোর চকিত ইসারায়।

শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি ॥

রাজা।

নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।

নটরাজ।

তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করচে।

রাজা।

তুমি তো দেখি বিদ্রোহী দলের একজন, কবির কথাই মানো রাজার কথা মানো না? আমি যদি বলি যেতে দেব না।

নটরাজ।

তাহলে আমিও তাই বল্‌ব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো করুণিকা, বাদলের শ্যামল ছায়া কোন্ লজ্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য্য।

নটরাজ, ও বলচে ওর সময় গেলো।

নটরাজ।

গেলোই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনি ত সুরু হয় অকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেল্‌তে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগল মিলন।

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে ॥

পূব হাওয়া কয়, "ওর যে সময় গেলো চ'লে,"
শরৎ বলে, "ভয় কি সময় গেলো ব'লে,
বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে ॥"
কালো মেঘের আর কি আছে দিন ?
ও যে হ'ল সাথীহীন।
পূব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো,"
শরৎ বলে, "মিল্‌বে যুগল কালোয় আলো,
সাজ্‌বে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে ॥"

নটরাজ।

শরতের প্রথম প্রত্যুষে ঐ যে শুকতারা দেখা দিলো অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ দয়া করবেন, কথা কবেন না।

রাজা।

নটরাজ, তুমিও ত কথা কইতে কসুর করো না।

নটরাজ।

আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা।

আর আমার হোলো তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার না হয় হোলো নুড়ি, দুইয়ে মিলেই তো ঝরণা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ। যে-বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁরই সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ।

এবার বুঝেছি আপনি ছদ্মরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইলো না। গীতাচার্য্য গান ধরো।

দেখ শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়॥
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টীপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়॥
জাগো জাগো, সখি,
কাহার আশায় আকাশ উঠিলো পুলকি'।
মালতীর বনে বনে
ঐ শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়
আয় আয় আয়॥

নটরাজ।

ঐ দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌচেছে। আকাশে আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিলো ঐ শেফালি। সে লেখার শেষ নেই তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্ত্ত্যে, তার ব্যথা ক'জন বোঝে? সেই করুণার গান সন্ধ্যার সুরে তোমরা ধরো।

ওলো শেফালি,

সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি ॥

তারার বাণী আকাশ থেকে

তোমার রূপে দিলো এঁকে

শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি ॥

বুকের খসা গন্ধ আঁচল রইলো পাতা সে

কানন বীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।

সারাটা দিন বাটে বাটে

নানা কাজে দিবস কাটে,

আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি ॥

রাজা।

নটরাজ, অমন করে শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে ?

নটরাজ।

আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে-মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়া-রূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ারূপিণীর নূপুর বাজলো, কঙ্কণ চমক দিলো কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে-ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ

আজ সে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন ॥

আকাশে যার পরশ মিলায়

শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়

আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুর গুঞ্জন ॥

অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত' গোপন আসা-যাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ॥

নটরাজ।

শুভ্র শান্তির মূর্ত্তি ধ'রে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল থেমে যাক্—আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে
দিবা যামিনী আকুল সমীরে॥

(বাদল লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

রাজা।

ও কী হল নটরাজ, সেই বাদল লক্ষ্মীই ত ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন! রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ।

চিনতে সময় লাগে মহারাজ; ভোর রাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখীর কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে তাই আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা !
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছো মিলায়ে পবনে পবনে ?
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া ?
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছো লুকায়ে আপন মায়াতে ?
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো না ॥
আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লব-বীজনে,
নামো জলে ছায়া-ছবি সৃজনে,
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না ॥
ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা !
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথ তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা ॥

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
ঐ বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা, শ্বেতচন্দন তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিলো কে ?
আহা বরিলো তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা॥

নটরাজ।

প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদল লক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎ প্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলি বনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হোলো॥
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্ম্মর গানে তব মর্ম্মের বাণী বোলো॥
গোপন অশ্রুজলে মিলুক সরম হাসি—
মালতী বিতানতলে বাজুক বঁধূর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ-মিলনে গাঁথা নব
প্রণয়-দোলায় দোলো॥

(অবগুণ্ঠন মোচন)

নটরাজ।

অবগুণ্ঠন ত খুললো। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরি মধ্যে, না আমার চোখেরই সাম্‌নে?

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎ প্রাতের আলোর বাণী॥
সারা বেলা শিউলি বনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি॥
আমি যা বলিতে চাই হোলো বলা,
ঐ শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি॥

রাজা।

শরৎশ্রী কা'কে ইসারা করে ডাকচে? এলো তো এবার কে আস্‌বে?

নটরাজ।

উনি ডাক্‌চেন সুন্দরকে। যা ছিলো ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটলো আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

(সুন্দরের প্রবেশ)

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিলো মোর প্রাণে?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা॥

শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয় কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা ॥

রাজা।

নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরি মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন ?

নটরাজ।

শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া আসায় স্বর্গ মর্ত্ত্যের মিলন-পথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া ॥
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া ॥
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া ॥

নটরাজ।

এইবার করিব বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে॥
তোমার বুকে বাজ্‌লো ধ্বনি
বিদায়-গাথা, আগমনী, কত যে,
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে॥
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।
সময় যে তার হোলো গত
নিশিশেষের তারার মত
তারে শেষ করে দাও শিউলি ফুলের মরণ সাথে॥

রাজা।

ওকি! একেবারেই শেষ হয়ে গেলো নাকি? কেবল ছুদণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হোলো, গান সারা হোলো! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা, —তারপরে।

নটরাজ।

"তারপরে" প্রশ্নের উত্তর নেই, সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা। এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিত ব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশীতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তারপরে? কেউ চুপ করে শোনে, কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে, কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায়?

গান আমার যায় ভেসে যায়।
চাস্‌নে ফিরে দে তারে বিদায়॥
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধূলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়॥
কাঁদন হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেলো চলে কতই তরী
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥

রাজা।

উত্তম হয়েছে।

রাজ-কবি।

আরও অনেক উত্তম হতে পারত।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ধর্ম্ম-শাস্ত্র।

পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বলেন প্রাচীন হিন্দুর বুদ্ধিটা ছিল ঘোলাটে। যে-সব জিনিষ পরস্পর থেকে অতি স্পষ্ট তফাৎ, এরা তাদেরও ঘুলিয়ে এক করে' ফেলেছে। যেমন ধর্ম্ম আর আইন। এর একের সঙ্গে অন্যের কিছু সম্পর্ক নেই। এর একটি হ'ল ইহলোকের, অন্যটি পরকালের। একটির স্থান ধর্ম্মমন্দির, অন্যটির আদালত। একটির কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিত, ধর্ম্ম-যাজক; অন্যটির জজ কৌঁসিলি। অথচ প্রাচীন হিন্দু বলে, তার আইন তার ধর্ম্মেরই অঙ্গ। তার আদালত হচ্ছে ধর্ম্মাধিকরণ, তার জজ-জুরী হ'ল ধর্ম্মপ্রবক্তা। উত্তরে আমরা নব্যহিন্দুরা বলি—ঐ ত ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিশেষত্ব। ঐ-খানেই হিন্দুর হিন্দুয়ানী। অন্য সব জাতির স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে ভেদ আছে—কিন্তু হিন্দুর নেই। হিন্দুর যা 'অমুত্র' তাই 'ইহ'। তার সংসারযাত্রার প্রতি খুঁটিনাটি ধর্ম্মশাসিত। দাঁতমাজা থেকে ব্রহ্মধ্যান, সবই তার ধর্ম্মাচরণ। হিন্দু ধর্ম্মৈকপ্রাণ, ধর্ম্মসর্ব্বস্ব।

গল্প আছে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ নবপ্রতিষ্ঠিত 'রয়াল সোসায়টির' মুরব্বি হয়ে তার সভ্যদের প্রশ্ন করেছিলেন—বাঁচা মাছের চেয়ে মরা মাছ ওজনে ভারী কেন? সমিতির পণ্ডিতেরা ভেবে চিন্তে নানা জনে নানা কারণ দর্শালেন, কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাই সকলের তেমন মনঃপূত হ'ল না। শেষে একজন পণ্ডিত একটা বাঁচা মাছ এনে ওজন করে', মেরে তাকে আবার ওজন করলেন; ওজন বেশী দেখা গেল

না। প্রাচীন হিন্দুকে নিয়ে পশ্চিমের পণ্ডিতের সঙ্গে নব্যহিন্দুর যে বিচার বিতর্ক, সেও এই ধরণের। প্রাচীন হিন্দু' সভ্যতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে-সব তথ্য প্রচার করেন, সেগুলি সত্য কি মিথ্যা, তা পরখ্ করে' দেখা আমরা দরকার মনে করি নে। মনে মনে বিশ্বাস আছে, এ সম্বন্ধে তাঁদের বাক্য আপ্তবাক্য। আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে সেই সব তথ্য থেকেই নানা তত্ত্ব বের করি, এবং তার বলে প্রমাণ করি, যে-সব কারণে তাঁরা হিন্দুসভ্যতাকে বলেন খাটো, ঠিক সেই কারণেই হিন্দু সভ্যতা সব চেয়ে উঁচু। তাঁরা বলেন প্রাচীন হিন্দু-যে ধর্ম্ম থেকে আইনকে তফাৎ কর্‌তে পারে নি, তা'তেই প্রমাণ এ বিষয়ে তাদের সভ্যতা আদিম অবস্থা ছাড়িয়ে বড় বেশীদূর এগোতে পারে নি; কারণ সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ও দুই জিনিষ একসঙ্গেই মিশে থাকে, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে মানুষ ক্রমে তাদের পৃথক করে' নেয়। আমরা বলি প্রাচীন হিন্দুরা-যে ধর্ম্ম থেকে আইনকে তফাৎ করে নি, তা'তেই প্রমাণ এ বিষয়ে তাঁরা সভ্যতার একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন; কারণ সভ্যতার চরম অবস্থায় মানুষ আইনের ধারা মান্‌বে ধর্ম্মবুদ্ধিতে, 'ল' যাবে 'মরালিটিতে' মিশে। এখন যদি প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন হিন্দুরা ধর্ম্ম ও আইন মোটেই মিশিয়ে ফেলে নি, ও দু-জিনিষকে খুবই তফাৎ করে' দেখেছে, এমন কি এত তফাৎ করে' যে বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের আইনেও ধর্ম্ম ও আইনের তফাৎ তত বেশী নয়,* তবে মুস্কিল হয় এই যে, তা'তে কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য আঘাত পায় না, নব্যহিন্দুর হিন্দুয়ানীতেও ঘা লাগে।

* জুলাই মাসের The Visva Bharati Quarterly পত্রিকায় The Spirit of Hindu Law প্রবন্ধে এ কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি।

হিন্দুর আইন-যে হিন্দুর ধর্ম্ম থেকে পৃথক ছিল না, আর দন্তধাবন ও সত্যভাষণ দুইই যে তার ধর্ম্ম—পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও নব্যহিন্দুর এই বিশ্বাসের মূল একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সে প্রমাণ হচ্ছে, প্রাচীন হিন্দু একই শাস্ত্রে আইন, দন্তধাবন ও সত্যভাষণের ব্যবস্থা দিয়েছে; এবং সে শাস্ত্রের নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে যা আছে তাই যে হিন্দুর ধর্ম্ম, এতে আর কথা চলে না। এবং গর্ভাধান থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের এমন কোনও অবস্থা নেই, যার ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে নেই। সুতরাং হিন্দুর জীবনের প্রতি কাজ যে ধর্ম্ম এতে আর সন্দেহ কি। তাই বঙ্কিম বাবু অনেক আগেই বলেছেন হিন্দুর 'ধর্ম্ম' খৃষ্টানের 'রিলিজান' নয়। হিন্দুর ধর্ম্ম বড় ব্যাপক জিনিষ। এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 'ধর্ম্ম' মানে 'কাল্‌চার'। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম মানে 'হিন্দু কাল্‌চার'। কিন্তু 'ধর্ম্ম' কথাটা 'রিলিজান'-এর প্রতিশব্দ নয়, 'কাল্‌চারের' প্রতিশব্দ, এই আভিধানিক তথ্য নিয়ে ত হিন্দুসভ্যতার ভালমন্দ বিচারের কোনও তর্ক ওঠে না। তর্ক যে উঠেছে তার কারণ, এ কথার মধ্যে একটু ইঙ্গিত আছে; এর অভিধা ছাড়িয়ে একটা ব্যঞ্জনা রয়েছে। হিন্দুর 'ধর্ম্ম' 'রিলিজান' নয়, 'কাল্‌চার'; কিন্তু তার সমস্ত 'কালচার'-টাই তার 'রিলিজান'। অর্থাৎ খৃষ্টানের গির্জায় গিয়ে হাঁটুগাড়ার সঙ্গে যে মনোভাব রয়েছে, হিন্দুর শৌচাচারের সঙ্গে সেই মনোভাবেরই যোগ রয়েছে। হিন্দুর 'রিলিজাস্' ও 'সেকুলার'-এর মধ্যে ভেদ নেই, কারণ সমস্ত সাংসারিক কাজও তাকে করতে হবে 'রিলিজাস্' মনোভাব নিয়ে। হিন্দু সভ্যতার যদি এই আদর্শ হয়, তবে সেটা ভাল কি মন্দ তা নিশ্চয়ই তর্কের বিষয়।

কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যা। প্রাচীন হিন্দু 'সেকুলার' ও

'রিলিজাস্', ঐহিক ও পারত্রিক—এর মধ্যে প্রভেদ করে নি, এ তথ্য সম্পূর্ণ অমূল, টীকাকারদের ভাষায় 'শশবিষাণের মত অলীক'। ও দুয়ের মধ্যে যে ভেদের গণ্ডী তাঁরা টেনেছেন তা গভীর, যে প্রাচীর তুলেছেন তা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের নব্য-হিন্দুদের যদি তা চোখে না পড়ে, সে আমরা চোখ বুজে আছি বলে'। এবং চোখ চেয়ে দেখ্‌লে হয়তো বা মনঃক্ষুণ্ন হব।

ধর্ম্মশাস্ত্রে 'ধর্ম্ম' কথার অর্থ কি, এ আমাদের মাথা ঘামিয়ে বের করতে হবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাচীন ভাষ্য ও টীকাকারেরা তা খোলা-খুলিই বলে' গেছেন। তাঁরা বলেছেন, "ধর্ম্ম শব্দঃ কর্ত্তব্যতাবচনঃ" (১), যা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম শব্দ তারি বাচক। "ধর্ম্ম শব্দঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যয়োর্বিধি প্রতিষেধয়োঃ······দৃষ্টপ্রয়োগঃ" (২), যা কর্ত্তব্য এবং যা অকর্ত্তব্য তার বিধি ও তার নিষেধ অর্থেই ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম মানে কর্ত্তব্য। মানুষের যত কিছু কর্ত্তব্য—পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ব্যক্তিগত ও 'রিলিজাস্'—এ সকলের সাধারণ নাম 'ধর্ম্ম'। এ সব বিভিন্ন কর্ত্তব্যের যে এক নাম, এবং এক শাস্ত্রে যে তাদের ব্যবস্থা, তার কারণ ভিন্ন হলেও একই মানুষের ব্যক্তিত্বের অদ্বয় যোগ-সূত্রে তারা একসঙ্গে বাঁধা আছে। এ সব কর্ত্তব্যই একই মানুষের নানা সম্বন্ধ ও নানা সম্পর্কের কর্ত্তব্য। কিন্তু যেমন তাদের ঐক্য আছে, তেমনি ভেদও আছে। সব কর্ত্তব্যের মূল এক নয়, প্রমাণ এক নয়। সব কর্ত্তব্যই 'রিলিজাস্' নয়, কারণ 'রিলিজাস্' কর্ত্তব্য নানারকম কর্ত্তব্যের মধ্যে একরকমের কর্ত্তব্য মাত্র।

(১) মেধাতিথি; ৭।১

(২) মেধাতিথি; ১।২

এই ভেদ সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের 'থিওরি' সংক্ষেপে এই :— মানুষের যা সব কর্ত্তব্য, তার দুটো ভাগ। একভাগ বেদমূল, অন্যভাগ ন্যায়মূল। যে কর্ত্তব্যের মূল বেদ, তা' অন্য কোনও প্রমাণে জানা যায় না। বেদের বাক্যই তা' জানার একমাত্র উপায়। স্মৃতি বা সদাচার থেকে যে এরকম কর্ত্তব্য জানা যায়, তারও মূল বেদ; কারণ স্মৃতির বচন থেকে বা সাধুদের আচার দেখে সেইরূপ বেদবাক্যের বা বিধির অনুমান করা যায়। কিন্তু মানুষের যে-সব কর্ত্তব্য প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণে জানা যায়, সে-সব কর্ত্তব্য বেদমূল নয়, ন্যায়-মূল। সেখানে বেদের প্রসার নেই, কারণ তারা বেদের বিষয় নয়। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বল্‌ছেন ;—"ধর্ম্ম নামে মানুষের যে পুরুষার্থ অন্য কোনও প্রমাণ থেকে জানা যায় না, তাদের জানিয়ে দেয় বলেই বেদের নাম বেদ। এই ধর্ম্ম শ্রেয়ঃসাধন করে বলেই মানুষের কর্ত্তব্য, কিন্তু কেমন করে' যে সে শ্রেয়ঃ সাধন করে, তা প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় না। আরও সব কাজ আছে যা শ্রেয়ঃ সাধন করে বলে' মানুষের কর্ত্তব্য, যেমন কৃষি। কৃষি যে কেমন করে' মানুষের শ্রেয়ঃ সাধন করে, তা সাধারণ অন্বয়ব্যতিরেক প্রমাণেই (induction by agreement and difference) জানা যায়। এবং কেমন করে' কৃষি সাধন করলে যে ফসল পাওয়া যাবে, তাও প্রত্যক্ষ ও অনুমানেই জানা যায়। কিন্তু যাগযজ্ঞ কেমন করে' সাধন করতে হবে, এবং তার সাধনফলে পরকালে কি করে' যজমানের সুখ কি স্বর্গলাভ হবে, সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও লৌকিক জ্ঞানের প্রণালী দিয়েই পাওয়া যায় না। এ ধর্ম্ম কেবল জানা যায়

বেদের ব্রাহ্মণ অংশের বিধিবাক্য থেকে, এবং ক্বচিৎ মন্ত্র অংশ থেকে (৩)।

এই 'থিওরি' অনুসারে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বলেছেন, রাজধর্ম্ম বা 'পলিটিক্স্' বেদমূল নয়, ন্যায়মূল (৪)। আইন বা ব্যবহারস্মৃতি, তাও বেদমূল নয়—ন্যায়মূল (৫)। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা যদি অন্য কথা বলেন, এবং আমরা যদি সেই কথাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বলে' চালাই, তার দায়ী প্রাচীন হিন্দু নয়।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের এই 'থিওরিতে' অনেক নবীন হিন্দু খুব সম্ভব বেজার হবেন। কারণ এ 'থিওরিতে' হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, এবং বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, এ দুয়েরই পথ বন্ধ। শাস্ত্র-কারেরা বলেন, যা অলৌকিক তা লৌকিক যুক্তি ও বিচার দিয়ে

---

(৩) বিদ্যাস্তনন্য প্রমাণবেত্তং ধর্ম্মলক্ষণমর্থমস্মাদিতি বেদঃ।......যৎ পুরুষস্য কর্ত্তব্যং প্রত্যক্ষাদ্যবগম্য বিলক্ষণ স্বভাবেন। শ্রেয়সাধনং কৃষিসেবাদি ভবতি পুরুষস্য কর্ত্তব্যত্বস্য চ তৎসাধন স্বভাবোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে। যাদৃশেন ব্যাপারেণ কৃষ্যাদের্ব্রীহ্যাদিসিদ্ধিঃ যাপি প্রত্যক্ষাদ্যবগম্যৈব। যাগাদেস্তু সাধনত্বং যেন চ রূপেণা পূর্ব্বোৎপত্তি ব্যবধানাদিনা তন্ন প্রত্যক্ষাদ্যবগম্যম্।..............
অয়ং ধর্ম্মো ব্রাহ্মণবাক্যেভ্যোঽবগম্যতে লিঙাদিযুক্তেভ্যঃ, ক্বচিচ্চ মন্ত্রেভ্যোঽপি। (মেধাতিথি—মনুভাষ্য ২।৬)

(৪) প্রমাণান্তরমূলা হ্যত্র ধর্ম্মা উচ্যন্তে। ন সর্ব্বে বেদমূলাঃ। (মেধাতিথি—মনুভাষ্য, ৭।১)

(৫) অন্যত্রাপি ব্যবহারস্মৃত্যাদৌ যত্র ন্যায়মূলতা তত্র যথাবসরং দর্শয়িষ্যামঃ। (মেধাতিথি, ২।৬)

বুঝ্‌বার চেষ্টা পণ্ডশ্রম; আর যা লৌকিক, তা লৌকিক যুক্তি বিচারেই বুঝ্‌তে হবে, তার মধ্যে অলৌকিককে টেনে আনা মূর্খতা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হ'ল অলৌকিককে লৌকিক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা; আর বিজ্ঞানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হ'ল লৌকিকের মধ্যে অলৌকিককে এনে ফেলা। হিন্দুধর্ম্মের কোনও অংশের যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের 'থিওরি' মতে সে অংশটা বেদমূল ধর্ম্ম অর্থাৎ 'রিলিজান' নয়, ন্যায়মূল লৌকিক কর্ত্তব্য মাত্র। তার ভালমন্দ যুক্তি দিয়ে বিচার কর্‌তে হবে, কারণ শাস্ত্র-বাক্যের সেখানে প্রসার নেই। অর্থাৎ প্রত্যূষে ফুলতোলা ও একাদশীতে উপবাস যদি স্বাস্থ্যের জন্য হয়, তবে তার ব্যবস্থা নিতে হবে ভট্‌চাযের কাছে নয়, কবিরাজের কাছে। এবং এতে যার স্বাস্থ্য ভাল না থাকে, তার পক্ষে এ সব কর্ত্তব্য নয়; এ নিয়ে শাস্ত্রের বচন তুলে ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া বৃথা। আর যাগযজ্ঞে মানুষের মঙ্গল হয়, শাস্ত্রের বচনে যদি এতে বিশ্বাস জন্মে—ভাল কথা। যদি না হয় ত ফুরিয়ে গেল। যুক্তি তর্ক দিয়ে তা আর প্রমাণ করা যাবে না।

আমার এক শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বন্ধু তুলসীদাসী রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে' বাল্মীকির উপর অশেষ ভক্তিমান ছিলেন। এবং রামায়ণের সব মহৎ চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে' নব্য বাঙ্গালীর প্রায়ই কঠোর সমালোচনা করতেন। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে বর্ষা সমাগমে রামের যে বিরহ বর্ণনা আছে, একদিন তাঁর পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল স্ত্রীর জন্য ওরকম বিলাপ একালের কলেজের ছেলেদের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর মনে যে আদর্শ ছিল, বাল্মীকির রামায়ণ তা'তে একটা প্রচণ্ড ঘা দিল। আমার

আশঙ্কা হয়, প্রাচীন হিন্দুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হ'লে, নবীন হিন্দুর মনে এমনি অনেক আঘাত লাগ্‌বে।

যে মনোভাবের বশে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা অলৌকিককে লৌকিক থেকে একেবারে পৃথক করে' দেখেছিলেন, সে 'র‍্যাশানালিজ্‌ম্‌' বা যুক্তিতন্ত্রতা প্রাচীন আর্য্যমনোভাবের একটা প্রধান লক্ষণ। যা চোখ মেল্‌লে স্পষ্ট দেখা যায়, চোখ অর্দ্ধেক বুজে তা'কে ঝাপ্‌সা করে' দেখা তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যেটা যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্র, তাকে আধ্যাত্মিকতার মোহ, কি হৃদয়াবেগের কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাঁরা দেখতে রাজি ছিলেন না; বুদ্ধির উজ্জ্বল সূর্য্যালোক সেখানে ছিল তাঁদের একমাত্র কাম্য। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ও তার টীকাকারদের লেখার প্রতি পাতায় এই 'র‍্যাশানালিজমের' পরিচয় রয়েছে। যা বিচার ও যুক্তির ব্যাপার, সেখানে যুক্তি ও বিচার যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে পৌঁছতে তাঁদের বিন্দুমাত্র ভয় কি দ্বিধা ছিল না। বিচার বিতর্ক আমরাও কিছু কম করিনে। কিন্তু তর্কে হেরে কে কবে নিজের ধর্ম্ম ছেড়ে প্রতিবাদীর ধর্ম্ম নিয়েছি, নিজের মতকে প্রকাশ্যে মিথ্যা স্বীকার করে' প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্য হয়েছি। বরং এ কাজ যে করে, তাকে বলি কাণ্ডজ্ঞানহীন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুর পণ্ডিতসমাজে এ ঘটনা যে নিত্য ঘট্‌ত, জনশ্রুতি তার সাক্ষী দিচ্ছে। প্রাচীন আর্য্যেরা যুক্তিকে কেবল মুখে নয়, জীবনে স্বীকার কর্‌তেন।

কিন্তু যুক্তিতন্ত্রতা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান কথা নয়। আর্য্য মন যুক্তি-তন্ত্রী বলে' ধর্ম্মশাস্ত্রেও তার ছাপ লেগেছে। 'ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে গঠন ও শাসনের শাস্ত্র। এখানে যে মনোভাবের মুখ্য পরিচয়, সে হচ্ছে শিল্পী ও শাসকের, organiser ও administrator-এর মনোভাব।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের চোখের সামনে ব্যক্তি ও সমাজের একটি স্পষ্ট ও পূর্ণ আদর্শমূর্ত্তি ছিল। তাদের বিধিব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজকে ঠিক সেই আদর্শের মত মূর্ত্তি দিয়ে গড়ে' তোলা। এবং এ কাজে তাদের সাহসের অন্ত ছিল না। মানুষের জীবনকে তারা মনে করত শিল্পীর মূর্ত্তিগড়ার উপাদান। সহস্র বিধিনিষেধের অস্ত্রে কেটে যে একে মনের আদর্শ মূর্ত্তির সঙ্গে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায়, তা'তে তাদের সন্দেহ ছিল না। এবং ব্যক্তি ও সমাজের জীবনের কোনও অংশ অনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ অগঠিত থাক্‌বে, তাদের মন ছিল এ মনোভাবের বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে প্রাচীন আর্য্য মন ছিল যাকে এখন আমরা বলি 'বুরক্রেটিক' মন। ধর্ম্ম শাস্ত্রকারদের চেষ্টার ফলে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার হিত হয়েছে বেশী, না অহিত হয়েছে বেশী, এ অবশ্য তর্কের কথা। মানুষের জীবনকে কতটা হাতে গড়ে' তোলা যায়, আর প্রাণবস্তু বলে' কতটা ছাড়া রাখ্‌লে তবে সে নিজে গড়ে' ওঠে—এ বিচারের হয়ত কোনও চরম মীমাংসা নেই। বাঁধনের বাধায় ক্লিষ্ট হয়ে একবার সে চাবে মুক্তি, আবার ছন্দহীন মুক্তিতে হাঁপিয়ে উঠে খুঁজবে নূতন বন্ধন। সে যাহোক্, জীবনের প্রাণপন্থা ও শিল্প-পন্থার বিচারে প্রাচীন আর্য্যেরা ছিলেন শিল্প-পন্থী। যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ, তারা যে বিধিনিষেধের এত শাসন মানবে না, ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের তা অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন আচার্য্য গৌতম বলেছেন, "দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্", যারা মহৎ তাঁদের সাহস আছে, তাঁরা ধর্ম্মবিধিকে অতিক্রম করে' থাকেন। কিন্তু বুদ্ধি ও মনে যারা মধ্যবিৎ, বিধিনিষেধ অতিক্রম করে' চলার অধিকার তাদের দিতে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের সাহস ছিল না। প্রাচীন হিন্দুরা

ব্যাকরণের জটিল বন্ধনে ভাষাকে বেঁধেছিলেন। ঋষিদের বাক্য এ জটিলতাকে মানবে না, মহাকবিরা যে এ বন্ধন ছাড়িয়ে যাবে, তা তাঁরা জানতেন। কিন্তু যারা ঋষিও নয়, কবিও নয়, তাদের স্বেচ্ছাচারকে তাঁরা অত্যাচার বলে'ই মনে করতেন।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

প্রাইজ।

আপিসের ফেরতা কাপড় ছাড়চি, গৃহিণী এসে বল্‌লেন—ওকি আবার কাপড় ছাড়চ যে? যাবে না নাকি?

—কোথায়?

—আজ অমলদের প্রাইজ, সে কথা ভুলে গিয়েচ?

—ওঃ তাইত! আজ বিস্যুদ্‌বারই ত বটে। কিন্তু—

—আর কিন্তু করো না, যাও একবার বেড়িয়ে এস। আহা, তোমায় দেখলে বাছার আমার কত আহ্লাদ হবে!

—বড্ড দেরী হয়ে গিয়েচে যে এদিকে—

—কিচ্ছু দেরী হয়নি। এই নাও, টিকিট রেখে গিয়েচে তোমার জন্য।

বলে' তিনি একখানা শিরোনামা-লেখা খাম আমার হাতে দিলেন।

—টিকিটের জন্য ত ভাবচিনে—

—তা ভাব্‌বে কেন—কিসে না যেতে হয় সেই ছুতো খুঁজচ যে—

—ছুতো নয়, সত্যি দেরী হয়েচে। এই দেখ টিকিটে লেখা রয়েচে সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হবে, আর ঘড়ির দিকে চেয়ে বোঝ ক'টা বেজেচে।

—নাহয় আধ ঘণ্টা দেরীই হবে। এ ত আর লাট সাহেবের দরবার নয়, যে ঢুকতে দেবে না।

—এ তারো বাড়া।

—অর্থাৎ তুমি যাবে না। কেমন, এই ত? আচ্ছা, আমার ঘাট হয়েচে তোমায় যেতে বলেচি। কি করব, আমাদের যাবার জো নেই, নইলে—বল্‌তে বল্‌তে গৃহিণী চলে' গেলেন।

আমাকেও তাই সঙ্গে সঙ্গে বেরতে হল। স্কুলের সামনে গিয়ে বুঝলাম রীতিমত ব্যাপার একটা কিছু হচ্চে বটে—রাস্তার দু'ধারে মোটর দাঁড়িয়ে গিয়েচে এবং লোকও জমেচে বিস্তর। যাহোক্ টিকিটের জোরে এবং কতকটা গায়ের জোরেও বটে কোনরকমে ভিতরে ঢোকা গেল, কিন্তু বসবার জায়গা একেবারে নেই।

বেশ জমকালো-গোচের একটা সামিয়ানা টাঙিয়ে স্কুলের উঠানেই সভার জায়গা করা হয়েচে। গাছপালা ফুলমালা দিয়ে জায়গাটী মনোরম করে' সাজানো। মাঝখানে সভাপতির জন্য বেদী। তারই একপাশে বেশ একটু তের্‌চা ভাবে বানানো একটী ছোট ষ্টেজ, আর অন্যপাশে এই ষ্টেজেরই কায়দায় মেয়েদের বসবার জায়গা।

সভার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আমি দেখলাম সম্পাদক মশায় তাঁর সুদীর্ঘ বিবরণ প্রায় শেষ করে এনেচেন। শুনলাম মাঙ্গলিক বেদগানটী আগেই হয়ে গিয়েচে।

সম্পাদক বসলে নানা বেশে নানা বয়সের ছেলেরা নানা ভাষায় নানা কবিতা ও নাট্য আবৃত্তি ও অভিনয় করে' গেল। দেখতে শুনতে তাদের কোনটীই মন্দ হয়নি— তবে গেরুয়া পরিধান ও উত্তরীয় নিয়ে জটাভার মাথায় ঋষি-বালকরূপে সুঠাম সুন্দর যে ছেলে ক'টী সংস্কৃত

বন্দনা গান করেছিল, তারাই বোধহয় সব চেয়ে বেশি হাততালি পেয়েছিল। আমাদের পিছন থেকে কে একজন 'এন্‌কোর' বলে' চেঁচিয়ে পর্য্যন্ত উঠেছিল।

তারপর প্রাইজ দেওয়ার পালা। বই খাতা থেকে আরম্ভ করে' ঘড়ি, ফুট্‌বল এমন কি হারমোনিয়াম পর্য্যন্ত ছেলেরা সব হাসতে হাসতে নিয়ে গেল দেখলাম; আর শুনলাম যারা এ সব কিছু পেল না, তাদের জন্যও রীতিমত ব্যবস্থা আছে। উপস্থিত মান্য-ব্যক্তিদের মধ্যে দু' তিনজন অতঃপর দু'কথা না বলে' ছাড়লেন না—একজন ত রীতি-মত গুরুগিরি আরম্ভ করে' দিলেন এবং ঝাড়া আধঘণ্টা ধরে' ছেলের বাপদের পর্য্যন্ত নীতি-কথামালা শুনিয়ে দিলেন। শেষে যখন বক্তৃতা থাম্‌ল, তখন গুমোটে, গরমে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, অবসাদে ও ততোধিক বিরক্তিতে মন আমাদের একেবারে খিঁচে গিয়েচে। ভাবগতিক বুঝেই বোধহয় সভাপতি মশায় সামান্য দু'কথায় তাঁর কাজ সেরে নিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ দেবার কথাটা উঠতে না উঠতে সকলে হুটোপুটি করে' উঠে পড়ল।

বাইরের খোলা জায়গায় বেরোবার জন্য তারপর কি ঠেলাঠেলি, কি গুঁতোগুঁতি! দেখে আমি পাশ্ কাটিয়ে দাঁড়ালাম।

যাঁরা যাচ্ছিলেন, তাঁরা রীতিমত বক্তৃতা করতে করতেই যাচ্ছিলেন। তাঁরা যা' বল্‌ছিলেন শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কারণ একটার সঙ্গে আর দশটা কথা আসছিল বলে' কানে বাজ্‌ছিল শুধু একটা কোলাহল।

ক্রমে ভিড় পাতলা হ'য়ে গেল দেখে আমিও বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে এসে প্রাণটা যেন জুড়ল। হাওয়াটা এমন মিঠে লাগ্‌ল যে, গোলদিঘির মধ্যে দু'চক্র না দিয়ে যেতে পারলাম না।

বাড়ী ফিরতে তাই বেশ একটু রাত হয়ে গেল।

সদর দরজা ভেজানো ছিল—ঠেল্‌তেই দেখি অমলকে ঘিরে তার চারদিকে দাঁড়িয়ে রয়েচে পাড়ার ছেলে ও বাড়ীর সকলে। অমল কি বল্‌ছিল, আমায় দেখে হঠাৎ থম্‌কে গেল।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—যাওনি তুমি!

—বাঃ! এই ত সেখান থেকেই আসচি বরাবর।—ইচ্ছা না করলেও শেষের এই মিথ্যা বিশেষণটি বেমালুম বেরিয়ে এল বুঝে আমি চুপ করে' গেলাম। কিন্তু গৃহিণী ধরে' ফেল্‌লেন—মিথ্যা কথা! তুমি যাওনি ওখানে—এই ত অমল বল্‌চে—

এত বড় প্রমাণের উপরে কোন কথা বলতে স্বভাবতই আমি ইতস্ততঃ করছিলাম, এমন সময়ে অমল তার বরফ-খেয়ে-ভাঙা গলায় জেরা আরম্ভ করে' দিল—

—আচ্ছা বাবা, গিয়েছিলে ত বল দেখি আমি কি সেজেছিলাম?

অমলের মুখের দিকে চেয়ে আমি উত্তর করলাম—সাজবি আবার কি, তুই কি থিয়েটার করতে গিয়েছিলি?

—যাওনি ত কি করে' বুঝবে কি করতে গিয়েছিল ও—বলে' ফোড়ন দিয়ে গৃহিণী তাঁর সাধ্যা সুরে আরম্ভ করলেন—আমার মন-বোঝানো বেরতে হয়, তাই একবার ইত্যাদি।

তার মায়ের কথার মধ্যেই অমল আবার বলে' উঠ্‌ল—না বাবা, তুমি নিশ্চয় যাওনি—আচ্ছা দেখাও ত দেখি সোনার জলে ছাপানো আমাদের প্রোগ্রাম?

আর কে কি বুঝ্‌ল জানিনে, কিন্তু আমি বুঝ্‌লাম এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আর চলবে না, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেঁট করে' ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ঘোষ।

নব কমলাকান্ত।

——:০:——

—প্রিয়ে, শোন শোন।

প্রস্থানোদ্যত প্রিয়া ফিরে দাঁড়ালেন, বল্‌লেন—কি ?

আমি সুর করে' ধরলেম—"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়"—

প্রিয়া চাবির গোছায় মৃদু ঝঙ্কার তুলে বল্‌লেন—তোমার গান শোনবার এখন আমার সময় নেই।

আমি গাইলেম—"সেহ পিরীতি অনুরূপ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।"

আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে প্রিয়া তাঁর আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছাটা কাঁধের উপর দিয়ে পিঠের দিকে ফেলে দিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই মেঝেতে বসে' পড়লেন। এমন গানের এমন শ্রোতা পেয়ে আমার উৎসাহের ধারা নায়গ্রা জলপ্রপাতের মতো সহস্রমুখী হয়ে ঝর্‌তে লাগ্‌ল। আমি গানটী আদ্যোপান্ত গাইলেম—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীতি অনুরূপ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহ মধুর বোল শ্রবনহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

আমার গানের সুরের শেষ ঝঙ্কার না মিলাতে মিলাতে প্রিয়া উঠে দাঁড়ালেন, বল্‌লেন—"জান ঘরে চাল বাড়ন্ত, কোথাও থেকে চার্‌টি চাল জোগাড় ক'রে আনতে না পার্‌লে আজ আর রান্না চড়্‌বে না,—তোমার আফিসে যেতে হবে না খেয়ে।" তারপর প্রিয়া তাঁর ললিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় দেহলতাকে কঠিন করে' তাঁর চতুর্বিংশতি বর্ষের স্থিরযৌবনের আভা গুটিয়ে নিয়ে প্রতিবেশীর গৃহাভিমুখে চলে' গেলেন। হায় প্রিয়া!

আজ এই নববর্ষার প্রভাতে যখন মেঘেরা তাদের কপিশ নিবিড় জটা দুলিয়ে দিয়ে সারা আকাশকে 'অশ্রুভারাক্রান্ত করেছে; কদম কেয়া তাদের মৃদু গন্ধ বিছিয়ে জলধারাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে—"এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে;" যখন বিরহী কান্তকান্তার চিত্ত-বিলাপ সহজ হ'য়ে উঠেছে; বুঝি কত কত গিরিগুহায় যক্ষ-হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে; কত বনে বনে কলাপী তার বর্হ মেলে দিয়ে নৃত্য সুরু করেছে;—তখন তোমার ঐ ললিত লবঙ্গলতিকার ন্যায়

দেহলতার মধ্যে যে একটি মন আছে, ওই স্থিরযৌবনশ্রীর অন্তরে যে একটি প্রাণ আছে, সেই মন সেই প্রাণের কাছে কি না "ঘরে চাল বাড়ন্ত" এই কথাটাই সবার চাইতে প্রধান হ'য়ে রইল! এর চাইতে নৃশংসতা আর কি আছে? আজ দু' দণ্ড কি প্রতিদিনকার হিসেব-গুলো, আফিসের খাতাপত্রগুলো বিস্মৃতির কালো পর্দ্দা ঢাকা দিয়ে, চিত্ততলে এই কথাটাকে প্রধান করে' তোলা যায় না—

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়—

আজ এই আসন্ন বর্ষার মেঘমেদুর অম্বরতলে যখন চারিদিকে ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে, চিত্ততলে কোন্ প্রদীপ জ্বলে উঠেছে, মানস-লোকের রঙীণ স্বপ্নের জালের সূক্ষ্ম তন্তুরাজি কোন্ দূরদূরান্তরে বিছিয়ে গেছে;—তখন মর্ম্মতলে এই অনুভবটাই যে সবার আগে সবার চাইতে আনন্দ ও ব্যথা নিয়ে জেগে উঠেচে,—সখি কি পুছসি অনুভব মোয়। এই অনুভবের মধ্যে চাওয়াপাওয়ার কোন দাবী নেই, লাভ লোকসানের কোন হিসেব নেই, অতীত ভবিষ্যতের কোন অনুসন্ধান নেই। এ অনুভব স্বরাট অহৈতুকী—এর সুখ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের গুরু গুরু ডাকের তালে তালেই, এর বেদনা কদম কেয়ার বিচ্ছুরিত গন্ধের সাথে সাথেই; মানুষের সকল সুখদুঃখের অনুভবের সার্থকতা সেই অনুভবের মধ্যেই—তার বাইরে নয়। মানুষের জীবন থেকে যদি অনুভবগুলো উঠিয়ে দেওয়া যায়, তবে তার জীবনের আর কি থাকে?

এই অনুভব!—মানবমানবীর অনুভবসামর্থ্যের মধ্যেই যে তাদের জীবনের সকল রহস্যের বাসস্থান। পশু মানুষ, কবি অকবি, কর্ম্মী জ্ঞানী, দেবতা দানব, প্রণয়বান প্রেমহীন, বীর কাপুরুষ, এদের

মধ্যে প্রভেদ ত কেবল ঐ অনুভবসামর্থ্যের। কাব্যে নানা সুর, দর্শনে নানা মত, জীবনে নানা ভঙ্গিমা; এর পিছনে আছে কেবল অনুভব বৈষম্য। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই একটা বিরাট অনুভব-সমষ্টি—আর কিছু নয়।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই অনুভবসমষ্টির ইতিহাস। গ্রীস্, রোম, বাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, চীন, এদের সভ্যতার নিরিখ আমরা সেইখানে সেইখানে খুঁজি, যেখানে যেখানে পাই এদের অনুভবের চিহ্ন অঙ্কিত। এদের কাব্য, এদের সাহিত্য, এদের ভাস্কর্য্য চিত্রকলা, এদের দর্শন, পুরাণ, যার যার পিছনে এদের অনুভূতির মহিমা চির উজ্জ্বল হ'য়ে আছে; যে যে বস্তুকে আশ্রয় ক'রে' এদের অন্তরলোকের সাধনা আনন্দলোকের স্পর্শলাভ ঘোষণা করেছে; সেইখান দিয়ে ব'য়ে এসেছে এদের ইতিহাসের ধারা। জার্ম্মান জাতির ইতিহাসে তার বিশ্ব-বিজয় আকাঙ্ক্ষা একটা ঘটনামাত্র, কিন্তু তার গ্যেটে হাইনে, তার নিট্‌শে সোপেনহার, তার বিটোভেন ওয়াগ্‌নার তার লাভের ঘরে আসল অঙ্কপাত। এইখানেই বিশ্ব জার্ম্মানীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এইখানেই বিশ্বমানব-সভ্যতার ধারায় জার্ম্মানী আপনার সব দান অর্পণ করেছে। জার্ম্মানীর বিশ্ব-বিজয়-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ নাস্তিমূলক। কিন্তু তার অন্তরানুভূতির সাধনা যেখানে, সেখানে সারা বিশ্ব সাগ্রহে এসে মিলেছে—বলেছে জার্ম্মানী বিশ্বশৃঙ্খলার একটী নিয়ম, তার অনুভবের ধারা বিশ্ব-মানবের অনুভূতির একটী তরঙ্গ; তার কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, বিজ্ঞান আমাদের আনন্দ দিয়েছে, মৃত্যু দেয় নি। এইখানেই বিশ্বের শুভেচ্ছা জার্ম্মানী লাভ করেছে, আর জার্ম্মানীর আত্মার আনন্দ-স্পর্শ বিশ্ব অনুভব

করেছে। সত্য ও মঙ্গল এইখানে আপনার আসন পেয়েছে। ক্রুপের কারখানার হাতুড়ির ঠক্ ঠক্, পট্স্‌ডামের যুদ্ধদামামা আটিলার রণ-হুঙ্কারের চাইতে কিছুমাত্র সুশ্রাব্য নয়। কিন্তু বিটো-ভেনের সঙ্গীতরাগ সভ্য জগতকে যে বন্ধনে জার্ম্মানীর সঙ্গে বেঁধেছে, তা' ছিন্ন করবার ক্ষমতা সভ্য মানুষের হাতে নেই। প্রবুদ্ধ জার্ম্মানী আমাদের আত্মীয়, প্রযুদ্ধ জার্ম্মানী নয়।

মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, আধ্যাত্মিক সাধনা সমস্ত তার এই অনুভব সামর্থ্যের উৎকর্ষতার আয়োজন। এই অনুভবসামর্থ্যের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্জ্জিত আনন্দের রূপ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে থাকে। সাধারণ মানুষের থেকে কবির একটা বিশেষ অনুভব সামর্থ্য আছে। এই বিশেষ অনুভবসামর্থ্যই তার চোখে একটা বিশেষ দৃষ্টির সৃষ্টি করেছে। তাই বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে, শিশুর হাসি থেকে, কিশোরীর যৌবনশ্রী থেকে যে আনন্দ আহরণ করে' সে নেয়, তার নিশানা সাধারণ মানুষ কোথায়ও খুঁজে পায় না। শরৎ ঊষার আকাশে কি আছে,—যা' সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না? বর্ষার মেঘের দুরু দুরু ডাকে কি আছে, যা সাধারণ মানুষের কানে লাগে না? বসন্তের স্পর্শে, আম্রমুকুলের সৌরভে, সামান্য অলিকুলের পক্ষতাড়নে কি আছে, যার নিরিখ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোয় না? কিশোরীর গ্রীবাভঙ্গীতে এমন কি আছে যা' কবিচিত্তে আকাঙ্ক্ষার মত্ত আবিলতাকে সহজে ছাপিয়ে ওঠে? কিন্তু প্রাকৃত মানুষ তার সন্ধান পায় না। তাই প্রাকৃত মানুষ বলে—কবি, তুমি যা' দেখ্‌ছ তার প্রকৃত অস্তিত্ব কোথাও নেই, এক তোমার উর্ব্বর কল্পনায় ছাড়া। কবি হেসে উত্তর দেয়—আমি যা' দেখছি সেইটেই বিশেষ করে' বাস্তব।

এ বাস্তবতাকে তোমার দেখবার দৃষ্টি নেই, কারণ তোমার অন্তরলোক এই বিশেষ অনুভবের স্তরে পৌঁছোয় নি। তাই বিশ্ব প্রকৃতি তোমার কাছে মূক, বিশ্ব-মানব প্রাকৃত জীবনের সহজ আকাঙ্ক্ষার সমষ্টিমাত্র, বিশ্বসংসার একটা সনাতন চক্রের আবর্ত্তন। তাই তোমার জীবনের পাত কেবল জমাখরচের ছোট বড় নানা অঙ্কে ভরে' উঠ্‌ল; কিন্তু সেখানে সেই রাগিণীর সুর একটিও নেমে এল না, যা' জীবনকে জীবনাতিরিক্ত করে' তোলে, দৈনন্দিন আকাঙ্ক্ষার শাসন নত করে' দেয়, মানুষ যেখানে পুলকবিহ্বল হ'য়ে বলে—"কি পুছসি অনুভব মোয়।" সাধারণ মানুষ অবিশ্বাসের সুরে বলে—ছোঃ, বিকৃত মস্তিষ্কের স্বপ্ন, গঞ্জিকাসেবীর প্রলাপ! অনুভবসামর্থ্যের অভাবে বৃহত্তর আনন্দের অবদান এখানে মিথ্যা হ'য়ে আছে।

কিন্তু তবুও আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার অতিরিক্ত অনুভবের এই প্রভাবকে আমরা এড়িয়ে চল্‌তে পারি নে। তাই শিল্পের এবং শিল্পীর, কাব্যের এবং কবির, চিত্রের এবং চিত্রকরের আসন আমরা উঁচুতে স্থাপন করেছি। এরা যে আমাদের মুক্তি দেয় আমাদের প্রতিদিনের আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন থেকে, আমাদের মনের নানা তর্কবিতর্ক থেকে, আমাদের বুদ্ধির নানা প্রশ্ন নানা সন্দেহ থেকে। শিল্পী কবি আমাদের চোখের সামনে মনের সামনে যা ধরে, সে যে একটা অনুভবের সুষমাগঠিত সাকার মূর্ত্তি। তাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে পারি, কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই। সে যে আপন মহিমাতেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের হিসেবের খাতার অঙ্কগুলোকে ছাপিয়ে ওঠে, বলে—দেখ আমি কোন্ দিব্যলোক থেকে নেমে এসেছি সহজ সুষমায়, স্বতঃউচ্ছ্বসিত

সঙ্গীতে, লীলায়িত রেখায় ছন্দে বর্ণে গন্ধে; এই সহজসুন্দরকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বে কি দিয়ে?—তোমার ঐ জীবন-যাত্রার কোলাহল দিয়ে? তোমার ঐ দৈনন্দিন কাড়াকাড়ির সংগ্রাম দিয়ে? তোমার ঐ বিশ্বগ্রাসী জড় বস্তুর ক্ষুধা দিয়ে?—সুন্দরকে তোমার বুদ্ধি মন প্রাণ অবিশ্বাস কর্‌তে পারে, কিন্তু তোমার অন্তরাত্মা যে জানাবেই আমি নেমে এসেছি জীবনের বৃহত্তর আনন্দের অবদান সঙ্গে নিয়ে। আমার পিছনে আছে সেই বস্তু যা অনির্ব্বচনীয়, যা প্রশ্নের অতীত, সুতরাং তা'তে সন্দেহের অবসরই নেই; যা ব্যাখ্যার বাইরে, সুতরাং তা'তে প্রমাণ অপ্রমাণের স্থানই নেই; যা একমাত্র অনুভবগম্য। ভগবদ্-ভক্তিই হোক্, ব্রহ্মানন্দই হোক্, সব এই অনুভবেরই এক এক প্রকারভেদ।

এই অনুভব সাধনা মানবজাতির কেন্দ্রগত গোপন রহস্য বলে' আমাদের জীবনে তথ্যের চাইতে তত্ত্ব, ব্যাকরণের চাইতে কাব্য, ইতিহাসের চাইতে রূপকথা, রয়টারের তারের খবরের চাইতে উপন্যাস বড়। কারণ তথ্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, তারের খবর কতকগুলো ঘটনাসমষ্টি মাত্র, যে ঘটনাগুলো ঘটে' যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে আমাদের যে যোগ, সে হচ্ছে কানের ও মনের। এর মধ্যে সেই রস নেই, যে রস আমাদের অন্তরাত্মাকে সঞ্জীবিত করে, বৃহৎ করে, আমাদের অনুভবের রাজ্যে বুদ্ধির টানা কঠিন সীমা-রেখাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের গভীরতম আমিকে মুক্তি দেয়। কিন্তু কাব্যে ও উপন্যাসে, তত্ত্বে ও রূপকথায় আছে একটী অন্তরাত্মার সেই অনুভব, যার সীমারেখা আমাদের মনের মন্দিরে এসেই ঠেকে থাকে না, যার সঙ্গে আমাদের অন্তরাত্মার কোন

ব্যবধানই নেই। তাই এর স্পর্শে আমরা বলি—পেয়েছি সেই বস্তু, যা' আমার জীবনে বিশেষ করে' প্রয়োজন; যে বস্তু ইতিহাসের আলোচনায়, ব্যাকরণ-সূত্রের গবেষণায়, রাশি রাশি তথ্যের বোঝার মাঝে খুঁজে পাই নি। আজ একটী অন্তরের অনুভূত আনন্দ আমার অন্তরকেও আনন্দাপ্লুত কর্‌ল; একটী অন্তরাত্মার উচ্ছ্বসিত রস-ধারা আমার অন্তরাত্মাকে রসে অবগাহিত কর্‌ল। তখন আর আমরা তর্ক করি নে, ব্যাখ্যা কর্‌তে বসি নে, প্রমাণ চাই নে। তখন পুলকবিহ্বল হয়ে শুধু বলি—কি পুছসি অনুভব মোয়।

এই অনুভব-সাধনা মানব-জাতির কেন্দ্রগত গোপন রহস্য বলে' শাস্ত্র-বাক্যের চাইতে মানুষের জীবন-কাব্য বড় হয়ে রইল। মানুষ জীবন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি পাদক্ষেপটী কি করে ফেল্‌বে, শাস্ত্র-বাক্য তারই বিধি কঠিন করে' বসে' আছে। কিন্তু জীবন-কাব্য হঠাৎ একদিন নবীন উষায় পুলক-কম্পিত কণ্ঠে বলে' ওঠে—আমি নতুন পথের অনুভব পেয়েছি—নতুন পথের নবীন রাগিণী আমাকে ডাক দিয়েছে, আমার অন্তরাত্মা স্পর্শ করেছে, সেই স্পর্শ আমাকে সঞ্জীবিত কর্‌ছে, আনন্দাপ্লুত করছে। ওই পথেই আমাকে চল্‌তে হবে, কারণ ওইখানেই আমার জীবনের অনুভব সত্য হ'য়ে উঠেছে, ওইখানেই আমি সত্য হ'য়ে উঠ্‌ছি। ও পথে কি আছে জানি নে। হয়ত সুখ আছে, দুঃখ আছে, হাসি আছে, অশ্রু আছে, আঘাত আছে, আশীর্ব্বাদ আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে—ওখানে নির্ব্বিঘ্নতা নেই, নিশ্চিন্ততা নেই, প্রতিদিনের পরিচিত সহজ গতিভঙ্গী নেই; কিন্তু ওই সুখদুঃখে, হাসিঅশ্রুতে, আঘাত আশীর্ব্বাদে আছে জীবনের উচ্ছ্বসিত রস-ধারা, যা আমার সঞ্জীবনী সুধা। ওর ছন্দ ও সুর, বর্ণ ও গন্ধ আমার

কাঠিন্য দূর করে' আমাকে লীলায়িত করবে, অভ্যাস-চক্র থেকে মুক্তি দিয়ে আমার মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুল্‌বে, আমার সামর্থ্যকে সাকার করে' তুল্‌বে; তাই শাস্ত্রের অনুশাসন আমার মান্‌বার উপায় নেই। শাস্ত্র-বাক্য যেখানে সমাপ্তি টেনে শেষ হয়ে থাকে, মানুষের অনুভব সেখানে আবার নবীন আরম্ভের সুর তুলে নব যাত্রার আয়োজনে জীবনের অন্তরবাহির গতিশীলতার লক্ষ্মী শ্রীতে পূর্ণ করে' তোলে, বৃহৎ করে' তোলে, স্বরাট করে' তোলে, যুগে যুগে লোকে লোকে।

তাই এই অনুভব-রাজ্যের স্বর্ণ-দুয়ার যাদের পক্ষে রুদ্ধ হয়ে গেছে, জীবনে বেদনা ও আনন্দের স্পর্শকেও তারা হারিয়েছে। অভ্যাসের চক্রে তারা যত ঘুর্‌তে থাকে, অমৃতত্বের কাছ থেকে তারা তত দূরে সরে যায়। এই অভ্যাসের চক্র তাদের কেবলই খর্ব্ব করতে থাকে। তাদের আত্মাকে খর্ব্ব করে', তাদের মনকে প্রাণকে বুদ্ধিকে খর্ব্ব করে। তাদের সমাজকে, আশা আকাঙ্ক্ষাকে, কর্ম্মানুষ্ঠানকে, তাদের আত্মশক্তিকে খর্ব্ব করে। মৃত্যুকে তারা আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না।

কিন্তু বল্‌ছিলেম আমার প্রিয়ার কথা। "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়" —বৈষ্ণব সাহিত্যের এই অতুলনীয় গানটীর উত্তরে প্রিয়ার "ঘরে চাল বাড়ন্ত" এই বাক্যের বিসদৃশতার কথা। হায় প্রিয়া!

তবে এ কথা মানি যে, মানব-জাতির আহার করবার একটা বিধি আছে। অন্ন যে ব্রহ্ম—এটা সেকালের কথা হলেও, একালেও এ সত্য কিছুমাত্র মলিনতা প্রাপ্ত হয়নি। বরং এই কলিকালে এ সত্য অতিরিক্ত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। এবং ঐটেই আপত্তি। ওই অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা।

অন্ন ব্রহ্ম—মানুষের জীবনে এ সত্যের বিধি-নির্দ্দিষ্ট একটা স্থান আছেই। কিন্তু এ সত্য যদি সেই স্থানকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে মানুষের জীবন-কাব্যের সকল পৃষ্ঠাগুলিকেই অধিকার করে' বসে, যদি পুরু-ভুজের মতো ভুজ মেলে দিয়ে মানুষের মন প্রাণ বুদ্ধি আত্মাকে জড়িয়ে আপনার বেষ্টনীর মধ্যে কেবলই পিষ্ট করতে থাকে, তবে কোথায় থাকবে মানুষের জীবনে বৃহত্তর আনন্দের আয়োজন? কোথায় থাকবে তার কণ্ঠে সেই রাগিণী, যা' তারার সুরে সুর মেলায়, মেঘের ডাকে ডাকে রূপ পায়? এই রাগিণীই না সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানুষের সহজ আত্মীয়তা স্থাপন করেছে? এই রাগিণীই না প্রতি মুহূর্ত্তের সমাপ্তির ভিতরে প্রতি মুহূর্ত্তের আরম্ভের জন্ম দিয়েছে? এই রাগিণীই না মানুষকে প্রতি নিমেষে বল্‌ছে—মানুষ, তোমার শেষ তোমাতে নয়—তোমাকে অতিক্রম করে'? এই রাগিণীতেই না মানুষ প্রতি নিমেষে আপনাকে অতিক্রম করে' করে' চলেছে? অন্নের অত্যাচারের নীচে যদি এই রাগিণী চাপা পড়ে' যায়, তবে বিশ্ব-মানব কেবলমাত্র বৈশ্যমনের আধার হয়ে উঠবে। তখন আর বর্ষার জল-ধারা, বসন্তের নবকিশলয়, জ্যোৎস্নার সঙ্গীত, সন্ধ্যার রাগিণী মানুষকে সেই বস্তু দিতে পারবে না, যে বস্তু তার অন্তরকে সুন্দর করে, আনন্দাপ্লুত করে' তাকে অতিরিক্ত করে। তখন আর মানুষ দেবতার সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াবে না, তখন সে আপনার মাঝেই আপনি নিঃশেষ হয়ে থাকবে।

প্রতি মানুষের মধ্যেই একটা কবি আছে। অন্নের অত্যাচার যদি এই কবিকে নত করে, তবে আর কোন নব-যৌবনা প্রেয়সীর রূপরাশিই আঁধার ঘরে আলো জ্বালবে না; তার আঁখির আলো আনন্দ-তরঙ্গ

ভুল্‌বে না; তার ঠোঁটের হাসি, গ্রীবার ভঙ্গী, তার দেহের রেখা, ছন্দ, সুর কোন স্বপ্ন-লোকেরই সৃষ্টি কর্‌বে না। তখন পুরুষ নারী দুইই জীবনের সেই এক পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে—যার পাওনা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হিসেবের খাতা খুঁজে কোথায়ও মিল্‌বে না।

অতএব অয়ি প্রিয়ে! অয়ি দীর্ঘ-কুঞ্চিত-কুন্তলে! অয়ি দুগ্ধ-চম্পক-বর্ণ-সন্নিভে! অয়ি চাবিগুচ্ছবদ্ধ-অঞ্চলে! এসো—আজ আর কিছু নয়। এসো—আজ এই নববর্ষার প্রভাতে যখন মেঘেরা তাদের কপিশ নিবিড় জটা দুলিয়ে দিয়ে সারা আকাশকে অশ্রু-ভারাক্রান্ত করেছে; কদম কেয়া তাদের মৃদুগন্ধ বিছিয়ে জলধারাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে—"এস হে এস সজল ঘন বাদল বরিষণে";—যখন বিরহী কান্তকান্তার চিত্ত-বিলাপ সহজ হ'য়ে উঠেছে; বনে বনে কলাপী তার বর্হ মেলে দিয়ে নৃত্য সুরু করেছে; তখন এসো—আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একসঙ্গে ওই গীত গাই—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নর্ম্মাল।

——:o:——

সবুজ পত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমি শুনতে পাচ্ছি যে, গত মাসের সবুজ পত্রে প্রকাশিত আমার পত্রখানিতে পণ্ডিতি বুদ্ধির সমালোচনা এবং হট্টমনের উপর আক্রমণ একটু পণ্ডিতিধরণের হয়েছে। মাষ্টারি করতে গেলে পড়তে হয় বটে, কিন্তু আপনার কৃপায় আমি পণ্ডিত হওয়া থেকে খুব সাম্‌লে গিয়েছি। আগে সাহেব-লোক যা' ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতেন তাই প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে পড়তুম এবং তাই বিশ্বাস করতুম। তাই পূর্ব্বে হট্টমনের উপর আস্থা ছিল, এখন আর নেই।

আমার বর্ত্তমান রুচিবিকারের একটি ইতিহাস আছে। যখন সেকেণ্ড ক্লাসে হেয়ার স্কুলে পড়ি, তখন হঠাৎ সাহিত্যিক হয়ে উঠি। রসজ্ঞানের বিকাশ হ'ল কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে কম নম্বরে। অমনি আমরা জনকয়েক রসিক মিলে এমন কয়জন মহাজনের তালিকা প্রস্তুত করলুম, যাঁদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন অঙ্কশাস্ত্রে কাঁচা হয়েও জগতের মহৎ উপকার সাধন করে গিয়েছেন। অঙ্কের মাষ্টারমহাশয়কে ঐ তালিকাটি দেখাবার পরের দিনই তিনি আর একটি তালিকা প্রস্তুত করে' এনে দেখালেন, যার মধ্যে শতকরা একশ' জন মহারথীই অঙ্কের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ে যে, আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ তালিকাটি দেখে নীরব

হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কি ঐ দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত মহারথীদের জীবন-রচয়িতার সাক্ষ্য সন্দেহ করবার সাহস পর্য্যন্ত কারো হয় নি। কিন্তু তখন থেকে মনে এই একটা খট্‌কা র'য়ে গেল যে, একটি তালিকার সিদ্ধান্ত অন্য তালিকার সিদ্ধান্ত হতে পৃথক কেন, এবং আমার ইচ্ছার প্রতিকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার বাধ্যবাধকতা কোথায়?

যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ করি, তখন ভেবেছিলাম যে, বড় বড় পণ্ডিতের কাছে আমাদের ছেলেমানুষী সন্দেহের নিরাকরণ হবে। অঙ্কে কাঁচা হয়েও বিজ্ঞান পড়তে উদ্যত হই, যেমন সকলে করে। প্রথম দিনই বিজ্ঞানের অধ্যাপক বল্লেন, "বিজ্ঞান পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সৃষ্টি করা। বাঙ্গালী জাতি বড় ভাবপ্রবণ। প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবকই সাহিত্য, দর্শনের দোহাই দিয়ে মিথ্যা কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করে। তাদের মুখে তত্ত্বকথাই শোনা যায়। সেই জন্য এই জাতীয় দুর্ব্বলতার উচ্ছেদকল্পে বিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা এই যে, সাহিত্যে দর্শনে একটি এমন বৈজ্ঞানিক মান নেই, যার দণ্ডে ভালমন্দের ওজন হতে পারে। রবি বাবু ভাল কিম্বা মন্দ কবিতা লেখেন, তা নির্ণয়ের মানদণ্ড কোথায়? আর সেইটি না থাকার দরুণই তর্কের মেরুদণ্ড থাকে না। ফলে জাতিও দুর্ব্বল এবং কল্পনাশীল হয়ে পড়েছে। আমাদের বিজ্ঞান কিন্তু এলোমেলো তর্কের প্রশ্রয় দেয় না।" তারপর শিক্ষক মহাশয় বল্লেন, "এই দণ্ডকেই আমরা নর্ম্মাল বলি। রসায়ন শাস্ত্রে যেমন এতখানি আয়তনের বস্তুতে জল মিশিয়ে হাজার C. C. আয়তনে পরিণত করলে সেই জলীয় পদার্থকে নর্ম্মাল সলিউসন বলা যায়। যখন তোমরা হাতে কাজ করতে আরম্ভ করবে, তখন

সব দ্রব পদার্থকেই তার নর্ম্মালের সঙ্গে তুলনা করতে হবে।” এখনও বুঝতে পারিনি কোন্ খেয়ালে বৈজ্ঞানিক নর্ম্মালের সৃজন হ’ল।

তারপর কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়ে বি, এ, ক্লাসে অর্থনীতি এবং রাজ-নীতি নিলাম। অর্থশাস্ত্রের প্রথম কথাই আবার সেই নর্ম্মাল মূল্য। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখলাম যে, নর্ম্মাল মূল্যের অস্তিত্ব শুধু Marshall সাহেবের মাথায়, নচেৎ দর কষাকষিতেই দাম ধার্য্য হয়, এবং সেই কার্য্যে অনেকখানি মনের ক্রিয়া আছে। রসায়ন শাস্ত্রে যখন প্রত্যেক বস্তুর নিজের নর্ম্মাল আছে, তখন বাজারে কেন প্রত্যেক মানুষের নিজের নর্ম্মাল থাকবে না? মার্শাল সাহেব উত্তর দিলেন যে, “সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই অভাব আছে, সে অভাব পূর্ণ করবার চেষ্টায় সে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই অভাবগুলিকে এবং অভাবপূরণের পন্থাগুলিকে থরে থরে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকভাবে সাজালে একটি ল, সা, গু, পাওয়া যাবে, সেটি একটি স্বার্থপর জীব এবং তার নাম স্বার্থাভিসন্ধি। এই জীবটির সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, তিনি সর্ব্বদা নর্ম্মাল মূল্যে পণ্যদ্রব্য কিনছেন এবং বেচ্ছেন।” অর্থাৎ নর্ম্মাল মূল্য নর্ম্মাল জীবেরই মূল্যনির্দ্ধারণ, রক্তমাংসের জীবের নয়।

নর্ম্মাল কথাটির মানে কি?—এর খানিকটা গড়পড়তা, খানিকটা স্বাভাবিক এবং খানিকটা আদর্শ। প্রথমেই প্রত্যেকের বিশিষ্ট অ-স্বাভাবিকত্বটুকু বর্জ্জন করতে হবে। তারপর প্রত্যেকের পারি-পার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে একত্র সাজাতে হবে। তখন অবস্থাভেদে ব্যবহার

ভিন্ন হবে বটে, কিন্তু সে বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যেও একটি কার্য্যগত সামঞ্জস্য টের পাওয়া যাবে। অতএব এর ভিতর ধর্ম্ম নেই, নীতি নেই; আছে শুধু ক্ষেত্রকর্ম্মানুসারে বিধান এবং নিয়ম। এই হ'ল বৈজ্ঞানিকের প্রথম নির্ব্বাচনের ফল। এখন অনেকগুলি নর্ম্মাল আছে। পরে বহু নর্ম্মালের সামান্যীকরণে 'একটি' বৃহৎ নর্ম্মালের সৃজন হবে, যার পরে আর কোন কথা নেই। কিন্তু যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আলোচনা নিবদ্ধ থাকবে, তখন সেই অবস্থার নর্ম্মালই সেই অবস্থার ব্রহ্ম।

যথা, Anatomy-তে রোগা মোটা হাড়ের অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু 'হাড়ের'; অর্থশাস্ত্রে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন বন্ধুর স্থান নেই; ডাক্তারীতে যেমন কেবল রোগী আছেন, সুস্থসবল কেউ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র হাড়, কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং কেবলমাত্র অসুস্থ ব্যক্তি চোখে পড়ে না। চোখে যা পড়ে সেটি হয় রোগা নয় মোটা হাড়, এবং একই ব্যক্তি কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী, কখনও সহায়, কখনও রুগ্ন, কখনও সবল। বাস্তব জগতে নর্ম্মালের অস্তিত্ব নেই। 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা' বলে আমরা নর্ম্মালকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছি শুনে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন 'নেই তাই পাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে?' অবশ্য নর্ম্মালের আবশ্যক আছে, যদিও সেটি বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন। এ না হ'লে জ্ঞানের দানা বাঁধে না। প্রত্যক্ষ অস্তিত্বই শেষ কথা নয়, পরোক্ষ উদ্দেশ্যকেও মানতে হবে।

জ্ঞানই শক্তি। সে শক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে চিরজীবি হয়ে থাকা। জ্ঞানের দ্বারা যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, তাহলেই জ্ঞান সার্থক হল। মাঝিমাল্লারা জোয়ার ভাঁটা, মেঘ ঝড় রোজ লক্ষ্য করে'

বলতে পারে কখন্ জোয়ার ভাঁটা আসবে এবং কখন্ নৌকা ছাড়লে ঝড়ের আগেই নদীর ওপারে পৌঁছতে পারা যাবে।

দৈবজ্ঞ রাজার হাত গণনা করে বলে' দিলেন যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত। জয়লাভ যদি হ'ল, ব্রাহ্মণ হলেন মন্ত্রী; হার যদি হ'ল, ব্রাহ্মণ টুলো পণ্ডিতই রয়ে গেলেন। আজকালকার বৈজ্ঞানিক সেই পুরাতন দৈবজ্ঞেরই বংশধর, তাই কত বৎসর পরে কোন্ মুহূর্ত্তে ধূমকেতু আসবে, এখন থেকেই অঙ্ক কষে বলে' দিতে পারেন। সোনারূপার দাম বাড়বে কি পড়বে, অর্থশাস্ত্রীর দল এক বছর আগেই তা' কাগজে ছাপিয়ে দিতে পারেন। আবার জনকয়েক সমাজতত্ত্ব-বিশারদ কোন বিশেষ সমাজের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং হ্রাসের হার দেখে সেই সমাজের পতন, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত বাৎলে দিতে পারেন। তবে এঁদের কথাগুলি ঠিক ফল্‌ছে না, তাই খাঁটি বৈজ্ঞানিক এখনও সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌কে বিজ্ঞানের আসরে রূপার আসনেই বসিয়ে রেখেছেন, সোনার সিংহাসন দেন নি।

প্রকৃতিকে বশ করাই হচ্ছে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সেই বশীকরণের মন্ত্র হ'ল নর্ম্মাল। জোয়ারভাঁটার গতি যে মোটে একশ' বার লক্ষ্য করেছে তার ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা, যে হাজার বার লক্ষ্য করেছে তার বাণীই সফল হবার সম্ভাবনা বেশী। যে আবার আরো বেশী বার লক্ষ্য করেছে, সে-ই জোয়ারভাঁটার স্বাভাবিক, সাধারণ গতি বলে' দিতে পারে, কেননা সে-ই জোয়ারভাঁটার অসাধারণ, অস্বাভাবিক আচরণগুলি সচ্ছন্দে বাদ দিতে পারে। তারপর যে নিয়মটি নির্ণীত হ'ল, সেইটি নর্ম্মাল গতি। অতএব নর্ম্মাল সৃষ্টির পূর্ব্বে একটি মাদ্রাজী হিসাবনবীশকে ডাকতে হবে সট্‌কে পড়বার

জন্য, যোগবিয়োগ করবার জন্য। নর্ম্মাল সৃষ্টির পরও তাঁর কাজ আছে। তাঁকে গুণতে হবে কয়টি বস্তু কিম্বা কার্য্য নর্ম্মালের সঙ্গে মিলছে। অবশ্য কতখানি মিল গরমিল হ'ল ওজন করা কিম্বা গরমিলকে খাতির করা তাঁর কাজ নয়। বৈজ্ঞানিক তাঁকে অতখানি বিশ্বাস করেন না, যদিও তাঁর কাজ বিজ্ঞানগঠনের পূর্ব্বে এবং পরেও ছিল এবং আছে। যে বিজ্ঞান যত উৎকৃষ্ট, সেটি তত সংখ্যামূলক।

কিন্তু নর্ম্মাল সৃজনে এবং সংখ্যা গণনে কতখানি যে বাদ পড়ে' গেল, তা' বৈজ্ঞানিক না বুঝলেও প্রত্যেক মানুষেই বোঝে। এক ছাঁচে গল্‌তে গিয়ে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য হারালো, প্রত্যেক খামখেয়ালী, অবিবাহিত যুবকেরই মতন। খেয়ালও গেল। অথচ বৈচিত্র্য এবং খেয়াল, সৃষ্টির এক একটি প্রধান উপকরণ। বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে হয়ত সনাতনকে পাওয়া যায় কখন কখন। কিন্তু সনাতনের সন্ধানে সত্যের আভাস হারিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রয়েছে। সনাতনের খাতিরে সত্যের অঙ্গহানি করবার অধিকার বৈজ্ঞানিকের নেই। তারপর এই সত্যরূপী সাধারণ সনাতনকে আদর্শ মানতে গিয়ে, প্রত্যেকের কর্ম্মের ভিতর, জীবনের পরতে পরতে যে আদর্শ ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে, তা'কে কি অবমাননা করা হ'ল না? বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য হয়ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অন্তর্নিহিত আদর্শের পরিপন্থী নাও হতে পারে। তখন সেই নর্ম্মাল পদার্থটি কেবল বৈজ্ঞানিকেরই দেবতা হবার উপযুক্ত, কিন্তু সত্য উপলব্ধির পক্ষে অপদেবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংখ্যার আধিক্য দেবত্বের দিকে নর্ম্মালকে সাধারণকে এগিয়ে দেয়, এবং ব্যক্তিগত মোটা মোটা পার্থক্যকে মিহিন্ করে দেয়।

যে সব বিজ্ঞান কেবলমাত্র সংখ্যামূলক এবং নিরালম্ব, সংখ্যাই তাদের নর্ম্মাল, বিশেষ করে' একক এবং শূন্য। কিন্তু বস্তুবাচক বিজ্ঞানে, যেমন পদার্থবিদ্যা কিম্বা রসায়নশাস্ত্রে, একটি নর্ম্মাল বস্তুর প্রয়োজন হয়, যদিও সেটির সৃজন এবং উদ্দেশ্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে—সংখ্যাই তার শৃঙ্খল। এই দুই প্রকার বিজ্ঞানেই নর্ম্মাল কেবলমাত্র ক্রিয়াসাধক যন্ত্র মাত্র। এ ইন্দ্রিয়রহিত inorganic জগতের কথা। কিন্তু ইন্দ্রিয়রাজ্যে ওঠবার মুখেই যে সব বিদ্যার প্রয়োজন হয়, যেমন প্রাণিতত্ত্ব,—তখনই গোলমাল বাধে। এখানে অন্ততঃ দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির নর্ম্মাল চাই। কেননা জীববিদ্যা রসায়ন শাস্ত্র এবং দেহতত্ত্বের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বিপদ আরো ঘনিয়ে ওঠে সেই সব বিদ্যায়, যেখানে ব্যক্তি নিয়ে, প্রাণ নিয়ে কারবার। ব্যক্তির ক্রিয়াপদ্ধতি প্রথমে তার মনের এবং দেহের উপর, দ্বিতীয়তঃ তার দেশ এবং দেশস্থ জীবজন্তু, মাটি, আবহাওয়ার উপর, এবং তৃতীয়তঃ তার কালের এবং ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশ কালের প্রাণ নেই, সেই জন্য সমাজতত্ত্ববিদ্‌, অর্থশাস্ত্রী ও রাজনৈতিক এই জড়ের নর্ম্মাল তৈরী করতে তত গোলে পড়েন না, যত গোলে পড়েন একটি নর্ম্মাল মানুষ গড়তে। আমরা অর্থনৈতিক জীবটির সহিত পরিচিত হয়েছি। রাজনৈতিক জীবটিও ঠিক একই উপায়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে এ জীবটি পৃথক, কেননা অন্যান্য ব্যক্তি ভোট দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ করে; কিন্তু রাজকীয় ব্যক্তির একমাত্র ক্রিয়া ভোট দেওয়া এবং নেওয়া। রাজকীয় জীবটি তাহলে রাজকীয় কার্য্যের পক্ষে নির্গুণ, অন্ততঃ বৈশিষ্ট্য, উন্নতিশীলতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণের ধার এ জীবটি ধারে না। এর বুদ্ধি বিবে-

চনার লক্ষণ শুধু প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে,তবে অনেক বুদ্ধিমানের দেশেও এ কাজটি টিকিট দিয়েই হয়। এই নির্গুণ জীবটির সঙ্গে যাচিয়ে নিতে হবে রক্তমাংসের জীবকে। এই সাংঘাতিক পরীক্ষায় যত সংখ্যক ব্যক্তি পাস হলেন, তাদের একটি দল হ'ল; সঙ্গে সঙ্গে .ফেল করার দলও আর একটি হ'ল। যদি পূর্ব্বোক্ত দলের সংখ্যা পরোক্ত দলের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে কেবলমাত্র সেই নর্ম্মাল নির্ব্বাচিত সংখ্যার আধিক্যই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি কার্য্যের উপযুক্ত হলেন। এখন নর্ম্মাল কি করে' দল বাঁধতে পারে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। নর্ম্মাল ত নির্গুণ এবং অবাস্তব। কিন্তু দল একটি খাঁটি বাস্তব জিনিষ, এবং দলের গুণের বালাই নিয়ে আমরা সকলেই মরে' আছি। নর্ম্মালের প্রাণ চাই। এখন ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ, বৈজ্ঞানিক নিরহঙ্কার, তাঁর অহঙ্কার সংখ্যার খুরে পেতে দিয়েছেন। তাই তিনি বল্লেন—এই যে নর্ম্মালে আবদ্ধ দলটি, এটি আমার রচনা নয়, এর নিজের প্রাণ মন সব কিছুই আছে। সবই সংঘমনের সৃষ্টি, তবে সাধারণ মানুষ নিজের গর্ব্বে স্ফীত হয়ে সংখ্যাকে তাচ্ছিল্য করে, এবং সংঘমনকে বুঝতে না পেরে নিজের মনকেই প্রধান করে' দেখে। কিন্তু বস্তুতঃ সংঘমন টালার চৌবাচ্ছার মতন, ব্যক্তি এক একটি কলতলার নল বইত নয়। •অবশ্য এ সব সমাজতত্ত্ববিদের কথা, বাস্তব জগতে তিনি হয়ত অতখানি বিনয়ী নাও হতে পারেন। মন প্রাণ যখন পাওয়া গেল, তখন সেই নর্ম্মাল হট্টমনের নর্ম্মাল পদ্ধতি পাওয়া শক্ত কথা নয়। সমস্ত বিজ্ঞানের নর্ম্মাল বস্তু এবং নর্ম্মাল কার্য্যগত সম্বন্ধগুলিকে একত্র করে' তার ল, সা, গু, করে' নিলেই সংঘমনের কার্য্যপদ্ধতি টের পাওয়া যাবে।

সেই পদ্ধতিই হবে আদর্শ, এবং তার থেকে বিচ্যুত হবে শুধু পাষণ্ডের দল।

সম্পাদক মহাশয়, আমাদের সমাজে আমরা এতদিন নর্ম্মাল মন্ত্রটি জপ করে এসেছি। আমাদের ঋষিরা ছিলেন একাধারে পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক। তাঁদের রচিত সমাজ 'জার্ম্মান-পসন্দ্'। সে বন্দোবস্ত একটি নর্ম্মালের উপরই স্থাপিত। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর থেকে আমরা—অর্থাৎ B. Sc. M. Sc.-র দল এবং সেই পুরাতন আর্য্য বৈজ্ঞানিকদের বংশধর,- সকলে অতি গম্ভীরভাবে রাজনীতির ছাত্র হয়ে উঠেছি। এতদিন পরে আমরা একটি রাজকীয় নর্ম্মাল আবিষ্কার করেছি। এর পূর্ব্বে আমরা শুধু মানুষের মাথাই গুণে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আজ দল পাকা হ'ল, কেননা সেই দলের একটি মনও আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই দলের একটি নেতা বলছেন এই সংঘমনের কাছে আত্মসমর্পণ কর—দু'দিন পরে অবশ্য বলবেন যে, সংঘমনই একমাত্র মন। কিন্তু সে সাহস এখনও হয় নি। এখন তিনি উপায়মাত্র বলে' দিচ্ছেন যে কি করে' আত্মবলি দিতে হবে। তার নাম discipline, অর্থাৎ জার্ম্মান-ড্রিল্।

কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, আমার মনে হয় যে, হট্টমন-রূপ নতুন একটি মন্ত্র জপ করার ফল অন্যান্য নামজপের মতনই সুখের হবে—অর্থাৎ সেই নাম জপ্‌তে জপ্‌তে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।*

—:০:—

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বাণীতে যে প্রেরণা এবং জীবনসাধনায় যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা চিরকাল ভারতের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে মানবজাতি ও মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্যের পথে চালিত করিবে। রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত তিনিও আধুনিক ভারতের অন্যতম সৃষ্টিকর্ত্তা। এই অমরত্রয়ীর প্রত্যেকেই বর্ত্তমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠভাগ হইতে অনেক আলোক অনেক শিক্ষা এবং অনেক প্রাণশক্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের স্বকীয় সভ্যতার সারাংশের সহিত সে সব মিশাইয়া লইয়াছিলেন এবং এককালে তাঁহাদের জন্মভূমি যে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাকে পুনরায় সেই উচ্চপদে উন্নীত করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবন এমন বিচিত্র ঘটনাপরিপূর্ণ যে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার যে জীবনস্মৃতি প্রকাশকেরা "একটি জাতির অভিব্যক্তি কাহিনী" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার নিজের কথা অতি অল্পই আছে। যে অদ্ভুতকর্ম্মা রাষ্ট্রশিল্পী স্বজাতির পুনরুদ্ধারকে জীবনের

* শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের "কলিকাতা উইক্‌লি নোট্‌সে" প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুসরণে ও তাঁহার সহকারিতায় লিখিত।

ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিস্তারিত জীবন-চরিত লিখিতে হইলে গ্রন্থের পর গ্রন্থেও কুলাইবে না। ভারতে আর কেহই স্বীয় আদর্শকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াসে এত দীর্ঘকাল এমন নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুশয্যার একপার্শ্বে জীবনের চিরসঙ্গী অতি সাধারণ রূপার ঘড়িটি পড়িয়া ছিল, উহার সাহায্যে তিনি তাঁহার দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনের প্রতি কাজ, এমন কি আহার বিশ্রাম এবং বিশ্রম্ভালাপ, নিয়ন্ত্রিত করিতেন। তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মচেষ্টার কাহিনী সুপরিচিত, তাহার পুনরুল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। ম্যাট্‌সিনির মত প্রথম বয়সেই স্বজাতিকে জাতীয়তার অক্ষয়সূত্রে সংবদ্ধ দেখিবেন, এই স্বপ্ন তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ নিপুণভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন, সুতরাং বিপ্লবের পথ পরিহার করিয়া সংস্কারের পথই বরণ করিলেন। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন যে, ভারত যদি একমত হইয়া উপনিবেশসমূহের আদর্শানুযায়ী স্বরাজপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে ইংলণ্ড কখনই সেই সঙ্কল্প প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। তাই তিনি একতা আনয়নের উদ্দেশ্যে এক ভারতব্যাপী আন্দোলনের সূচনা করিয়া নিজের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং জাতীয় মহাসভায় এমন একটি স্থান পাইয়াছিলেন যেখান হইতে তিনি অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে আপনার ধ্যানধারণা আদর্শের কথা সাধারণ্যেও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বঙ্গবিভাগের সময় তাঁহার এই একতান্দোলন অতি কঠিন পরীক্ষায় পড়ে, কিন্তু সেই আন্দোলন যখন সুদীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী

বিবিধ বিপত্তির মধ্য দিয়া অবশেষে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়, তখন তাঁহার নেতৃত্বকুশলতাই জয়যুক্ত হইল। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯.২ সাল পর্য্যন্ত তিনি বাংলায় এমন দৃঢ়সংবদ্ধ অপূর্ব্ব একপ্রাণতা বজায় রাখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড এবং এদেশের কর্ত্তৃপক্ষ যে বঙ্গবিভাগকে অপরিবর্ত্তনীয় বিধান বলিয়া বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন, অবশেষে সেই অপরিবর্ত্তনীয় বিধিই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

বঙ্গবিভাগ রহিত হইবার পর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সকল সুখ দুঃখের এবং সকল কাজ কর্ম্মের চিরসঙ্গিনী চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন। তিনি আদর্শ হিন্দুপত্নী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে, সেই কঠোরতম পরীক্ষার সময়—ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতসচিব তাঁহার উপর যে অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিকার-চেষ্টা সম্পূর্ণ নিস্ফল হইয়াছে; বিলাতের ইন্স্ অব কোর্টের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আইনব্যবসায়ে পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করায় তিনি নিঃস্ব হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন; অপরের চক্ষে যখন ভবিষ্যৎ শূন্যময় এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও দেশের গণ্যমান্য সকলে যখন তাঁহাকে চিরজীবনের মত অকৃতী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—সেই নিদারুণ দুর্দ্দিনে, জীবনের সন্ধিক্ষণে, এই পরমসাহসিকা নারী অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করতঃ, এবং তদপেক্ষাও যাহা মূল্যবান অকুণ্ঠ প্রেম, অবিচলিত শ্রদ্ধা ও অশেষ সহানুভূতি দান করতঃ, নিগৃহীত স্বজাতির উদ্ধার কল্পে জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্পে তাঁহাকে অকাতরে সাহস ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। শুধু সেই প্রথম জীবনের সঙ্কটকালে নয়, সুরেন্দ্রনাথের সমস্ত রাজনৈতিক জীবন ব্যাপিয়া এই পরমধর্ম্মপ্রাণা

রমণী তাঁহার অসাধারণ মনের বল ও অনুরূপ চরিত্রবল লইয়া সচিব, সখী এবং গৃহিণীরূপে স্বামীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। এই স্ত্রীশক্তির বলে, সুরেন্দ্রনাথের দুর্গম দেশসেবার পথে, দারুণ দুর্য্যোগ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও কোনদিন তাঁহার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটে নাই, এবং দৃঢ়তার সহিত সমস্ত বিপত্তি প্রতিকূলতা এমন ভাবে অতিক্রম করিতেন যে, দেশবিদেশে তিনি "সারেণ্ডার নট্" অর্থাৎ "নাছোড়-বান্দা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুতে সুরেন্দ্র-নাথ জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, এবং এই দুর্ঘটনায় যেন তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনধারায় একটা বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

সংস্কার-বিধান তাঁহারই আজীবন পরিশ্রমের ফল। ইহাকে তিনি মধ্যপথে একটা সাময়িক আশ্রয়মাত্র মনে করিতেন, এবং এই বিশ্বাস তাঁহার ধ্রুব ছিল যে, যেদিন আমরা আত্ম-কলহ ভুলিয়া এক হইতে পারিব, স্বগৃহে স্বাধিকার আমাদের সেইদিনই লাভ হইবে। তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক কটূক্তি তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ বিচারবিতর্কের পর যে সংস্কার বিধান তিনি অল্পদিনের অস্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া-ছিলেন, তাহার প্রয়োগ ও প্রবর্ত্তনে সাহায্য করিতে তিনি যে ন্যায়তঃ বাধ্য ছিলেন। মন্ত্রী হইয়া তিনি বাংলার জেলাবোর্ড ও মিউনিসি-প্যালিটীসমূহ স্বাধীন করিয়া দিয়াছিলেন; কলিকাতা কর্পোরেশনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রবল সরকারী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিনায়কপদে প্রথম একজন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিয়া আত্মমত রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং অনুরূপ

বিরুদ্ধতার মধ্যে চিকিৎসাবিভাগে ১৬ জন সুযোগ্য ভারতীয় চিকিৎসককে এমন কয়েকটি পদ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহাতে এতকাল ইংলণ্ডেনিযুক্ত আই, এম, এস্‌ কর্ম্মচারীদের অনন্যাধিকার ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার নব বিধানে সম্পূর্ণ সুফল ফলে। চাঁদপুরে কুলীবিভ্রাটের সময় তিনি উপযাচী হইয়া বিপন্ন ব্যক্তিদের ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া নানারূপে সহায়তা করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সাহায্যের ব্যবস্থা করা তাঁহার অধীনস্থ কোন বিভাগের কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। উত্তর বঙ্গে বন্যার সময় তিনি অসুস্থ দেহে, অনাহারে, প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে ট্রলি করিয়া প্লাবনক্লিষ্ট অঞ্চলে ঘুরিয়াছিলেন। ইহার সহিতও তাঁহার অধীনস্থ কোন শাসন-বিভাগের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই কঠোর পরিশ্রম শেষ করিয়া তিনি যখন দার্জ্জিলিংএ ফিরিলেন, তখন তাঁহার প্রবল জ্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রঙ্কোনিমোনিয়া হইয়াছে। তবুও শরীরের এই অবস্থায় ট্রেন হইতে নামিয়াই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির বিধান সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এবার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিল, এবং সেই যে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, তাহার আর পুনরুদ্ধার হইল না। যখন তিনি এই ভাবে সমগ্র দেহ মন দেশসেবায় নিয়োজিত করিতেছিলেন, তখন অন্যদিকে তাঁহার সমস্ত কার্য্যের নির্দ্দয় সমালোচনা চলিতেছিল—কিন্তু তিনি তাহাতে অসহিষ্ণু হন নাই বা আক্ষেপ করেন নাই।

কাজ করিয়া যাওয়া এবং কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল; জীবনের সায়াহ্নেও বলিতেন যে, ইহা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্ম কি আছে তিনি জানেন না। শেষ বয়সের নিভৃত নিবাসে তাঁহার স্বাস্থ্য

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু মনের বলে ও আত্মার স্ফূর্ত্তিতে তিনি সঞ্জীবিত ছিলেন—বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তিও পূর্ব্বের মতই প্রখর ছিল। দেহ অশক্ত হইলেও তাঁহার হৃদয়ের তেজ অথবা ভবিষ্যতে অটল বিশ্বাসের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। প্রায়ই বলিতেন যে, আরো দশ বৎসর বাঁচিতে সাধ যায়—খ্রীয়মান জীবন আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার জন্য নহে, পরন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মচেষ্টার পরম পরিণতি দেখিয়া যাইবার জন্য—ভারত পুনরায় একতাবদ্ধ হইয়া স্বায়ত্ত-শাসনের পথে দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে যাত্রা করিয়াছে ইহাই দেখিয়া যাইবার জন্য। যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে তিনি বারবার বলিতেন যে, যদি আমরা বিরোধবিসম্বাদ ভুলিয়া একবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই যাহা আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রতিরোধ করিতে পারে—বলিতেন যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অথবা ইংলণ্ড এবং ভারতের মধ্যে বিদ্বেষ মনান্তরের সৃষ্টি করিয়া কি ফল হইবে, তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য। তথাপি তিনি আশা পরিত্যাগ করেন নাই এবং বিশ্বাস করিতেন যে, বর্ত্তমানের কলহবিভেদ আমাদের জাতীয়-জীবনের একটা অস্থায়ী অধ্যায় মাত্র; আমাদের দেশের লোকে বুঝিতে পারিবে যে, একতা-বদ্ধ হইলেই আমাদের উন্নতি—অন্যথা বিচ্ছেদবিরোধে বিভ্রান্ত হইতে থাকিলে আমরা ক্রমশঃই দুর্দ্দশার অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইতে থাকিব।

তাঁহার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদের কাহিনী যখন লিখিত হইবে, তখন লোকে জানিবে এই মানুষটির চরিত্রে কত অসাধারণ মহত্ব এবং সৌন্দর্য্য ছিল। চিরজীবনই তিনি জনসাধারণের একান্ত আপনার

ছিলেন। কি বেঙ্গলী কার্য্যালয়ে, কি সেক্রেটেরিয়েট ভবনে মন্ত্রীশালায়, কি তাঁহার গৃহে, কি দুঃখদারিদ্র্যময় দুঃসময়ে, কি উত্তর-কালের সচ্ছলস্বচ্ছন্দ অবস্থায়, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, সকলেরই তাঁহার কাছে সমান আদর ছিল। কেহ দুঃখভার বহিয়া আনিয়াছে অথবা স্বদেশের জন্য নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে; এমন কাহাকেও তিনি কখনও ফিরাইয়া দিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ লিয়াকৎ হোসেনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। লিয়াকৎ ইংরেজী কি বাংলা কোন ভাষাই জানেন না; বিগত বিশবৎসরকাল স্বদেশী প্রচার ও ছেলেদের লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছেন এবং নিজের মনোভাব উর্দ্দু ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা ছেলেরা অল্পই বুঝিতে পারে; বঙ্গ-বিভাগের সময় হইতে রাজনৈতিক অপরাধের জন্য বারম্বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, অথবা মুচুলেকায় আবদ্ধ রহিয়াছেন; এবং লোকের স্বেচ্ছাদত্ত অনিশ্চিত দানের উপর নির্ভর করিয়া অভাবক্লিষ্ট দরিদ্র জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন। এই লিয়াকৎ হোসেনের জন্য সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে একটি পরম প্রীতির আসন ছিল, এবং তাঁহার জীবনস্মৃতিতে ইঁহার কথা তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের 'কৃপা' নামে একটি প্রাচীন ভৃত্য ছিল, প্রভুর পূর্ব্বেই সে পরলোক গমন করে; সুরেন্দ্রনাথের পরিচ্ছদ এবং অভ্যাসাদি লইয়া এই প্রাচীন পরিচারক কেবলই বিদ্রূপ করিত, এবং সুরেন্দ্রনাথ, ভব্যতা ও শালীনতা সম্বন্ধে তাঁহার পুরাতন ভৃত্যের বিচিত্র ধারণাদি লইয়া কৌতুকহাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেন। কঠোর পরিশ্রমের পর যখন দেহমন বিশ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া পড়িত, তখন তিনি এই ভৃত্যকে লইয়া রহস্যালাপ করিতেন; সেই চিরসঙ্গী

ভক্তকে হারাইয়া তাহার অভাব তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অনুভব করিয়াছিলেন। রঙ্গরস ও কৌতুক করিতে তিনি ভালবাসিতেন সত্য; কিন্তু যখন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন তখন নিকটতম আত্মীয় বা প্রিয়তম বস্তুও তাঁহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিতে পারিত না। আবার যখন বিশ্রামসুখোপভোগে মতি হইত, তখন যৌবনসুলভ আনন্দউৎফুল্লতার সহিত নানাবিধ বাক্যালাপ করিতেন। তাঁহার ন্যায় হাস্যরসিক, তাঁহার ন্যায় উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্ত হাসি হাসিতে কম লোককেই দেখা যায়।

শ্রীযুক্ত বিপীনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আদি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত, সুবক্তা, সুলেখক ও কর্ম্মীদের সহিত তাঁহার সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বক্তৃতায় বা সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধে সময়ে সময়ে তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। কিন্তু তাহার দরুণ ইঁহাদের মধ্যে কোন স্থায়ী মনমালিন্য ঘটিত না। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নায়ক পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অনেক ব্যঙ্গ, কৌতুক, রহস্য ও নিন্দাবাদ অতি সরস ও শ্রুতিমধুর ভাষায় প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেন—"গুরুদেব; আজ নায়কে আপনাকে অনেক মিঠেকড়া গালি দিয়াছি। কি করি, সময়ে সময়ে আপনাকে গালি না দিলে লেখা বড় একঘেয়ে হয়ে পড়ে ও কাগজ কাটতির সুবিধা হয় না। পেটের দায়ে এই কুকার্য্য করি; ত্রুটি গ্রহণ করবেন না।" তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিতেন—"বেশ করেছ"। শ্যামসুন্দর যখন তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার উপর আদেশ ছিল, অসত্যের প্রতিবাদ করবে কিন্তু কেউ গালি দিলে

তার উত্তর দেবে না। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে "বেঙ্গলীর" বর্ত্তমান অন্যতম সম্পাদক শর্ম্মাকে পত্র লেখেন যে, যদি বেঙ্গলীতে তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কোন ব্যক্তির উপর কটূক্তি করা হয়, তাহলে তিনি বেঙ্গলীর সহিত কোন সংশ্রব রাখবেন না। আমাদের সব সর্ব্বনাশের মূল দলাদলি ও আত্মকলহ (সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত) ও তাহাই দূর করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধিকে প্রধানতঃ এই কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করেন।

গোখ্‌লে যে বলিতেন "বাঙ্গালা আজ যাহা ভাবে, কাল সমগ্র ভারত সেই এক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়," সে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের সময়। সম্প্রতি "টাইমস" প্রমুখ বিলাতের সংবাদ পত্র যে বলিয়াছেন যে সুরেন্দ্রনাথের সহিত একমাত্র গ্লাডষ্টোনের তুলনা চলে, সেও বড় কম কথা নয়। যশ এবং সাধারণের শ্রদ্ধাপ্রীতি তিনি অযাচিতভাবে লাভ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার ভাষার ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধির প্রাখর্য্য, হৃদয়ের বৃত্তি এবং ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ শক্তি তিনি দেশ এবং দেশবাসীর সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও যশ অনুসন্ধান করিয়া ফিরেন নাই। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সত্যনিষ্ঠা। এ কথা তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, জ্ঞাতসারে স্বজাতিকে ভ্রান্ত নির্দ্দেশ তিনি কখনই দিবেন না, কিম্বা বিপথে চালিত করিবেন না। লোকের অপ্রিয় হইবার আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়াও, যাহা তাহাদের পরমার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিতেন। শেষজীবনের সুগভীর প্রশান্তিতে তিনি নিজেকে সকল বিক্ষোভ বাসনা মোহ অভিমান হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এই

সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যতদিন শেষদিন না আসে, ততদিন তাঁহার চিরজীবনের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবেন; যতদিন সামর্থ্যে কুলাইয়াছিল, তিনি একনিষ্ঠভাবে এই সঙ্কল্প পালন করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় যেমন আধুনিক ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তিমন্ত্রের ঋষি, তেমনই সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের মন্ত্রগুরু; তিনিই ভারতবাসীকে জগতের উন্নতিশীল জাতিসমাজে একটি গৌরবের আসন অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান আদর্শের অনুযায়ী কর্ম্মপথে চালিত করেন। রামমোহন রায় যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এখনকার শিক্ষিত সমাজের সকলেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী না হইতে পারেন, কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, সেই ধর্ম্মের পরম প্রভাবে আমাদের চিন্তা কল্পনা শিক্ষা দীক্ষা আলোকিত হইয়াছে, প্রসারিত হইয়াছে? সেই ভাবে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান ভারতের সৃষ্টিকার্য্যে সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তদপেক্ষা ন্যূন নহে। দীর্ঘজীবনের শেষে পরম বিরামের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহার দেশসেবা লইয়া কোন উত্তেজনাপূর্ণ অভিনয় দেখিবার বাসনা ছিল না। তাঁহার চিত্ত পরম শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কারণ তিনি অনুভব করিতেন যে, ব্যক্তিই হউক বা জাতিই হউক, একমাত্র কর্ম্মেই তাহার মুক্তি—এবং ভগবান ও মানুষের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। জীবনে কর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল।

তাঁহার আবাস ছিল গঙ্গাতীরে। কতবার বলিয়াছেন যে, তাঁহার চিতাভস্ম গঙ্গাসলিলে বাহিত হইয়া তাঁহার পরমারাধ্যা মাতৃভূমির

ক্রোড়ে অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিবে; এবং তাঁহার আত্মা মানুষের সেই মনোমন্দিরে পরম আশ্রয় লাভ করিবে, যেখানে জাগ্রত ভগবান স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করেন। ৬ই আগস্ট, যেদিন স্বদেশী আন্দোলনের ও ভাঙ্গা বাঙ্গলা জোড়া দিবার সঙ্কল্পের বিংশতি বৎসর পূর্ণ হয়— সেই স্মরণীয় দিনের সন্ধ্যায়, যখন অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম-চ্ছটায় পশ্চিম গগন ভাস্বর, তখন তাঁহার চিতানলের উদ্দীপ্ত শিখা ঊর্দ্ধে আকাশ এবং নিম্নে তাঁহারই উদ্যানতলবাহিনী বর্ষার ভরাগঙ্গার উপর করাল রশ্মিপাত করিল। তারপর নদীতে সন্ধ্যার জোয়ার আসিল, উদ্বেল জলস্রোত নশ্বর দেহের ভস্মাবশেষ ধৌত করিয়া লইয়া গেল, ও গগন ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া স্নিগ্ধকর বারিবর্ষণে চিতার প্রধূমিত অঙ্গারাগ্নি নিভাইয়া দিল। স্নেহময়ী প্রকৃতিজননী এইরূপ গম্ভীর শান্তি ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে অপার করুণাভরে ধরণীর মুখমণ্ডল ক্রমে নিশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া এই মহৎ ও জ্যোতির্ম্ময় জীবনের যবনিকা ধীরে ধীরে টানিয়া দিলেন।

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

নবম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

"'পাঠকের কথার' জের।

—::०::—

যেদিন ভাদ্রের 'সবুজ পত্রে' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' পড়া শেষ হয়েছিল, সেইদিন থেকেই আশ্বিন সংখ্যার জন্য কতকটা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম; কারণ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ভাগ্যচক্র যে চক্রের তাড়নায় ভীমবেগে ঘূর্ণ্যমান, তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তারই বিরুদ্ধে অত বড় অপ্রিয় সত্য ব'লে যে কবিবর অক্ষত শরীরে ফিরে যাবেন, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। যা'হোক, আশ্বিন সংখ্যায় পাশাপাশি 'পাঠকের কথা' ও 'সম্পাদকের কথা' প'ড়ে ঔৎসুক্য নিবারণ ত হ'লই, উপরন্তু কিছু 'যাস্তি'ও মিল্‌ল। যাস্তি মিল্‌ল এই হিসেবে যে, দেখে প্রীত হলাম আমাদের সত্যপ্রিয় কবি যতীন্দ্রনাথ তাঁর 'পাঠকের কথায়' স্বয়ং সব্যসাচীকেও অতিক্রম করেচেন, যেহেতু তিনি বর্ত্তমান কালের নবীন কবি, গল্পলেখক এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলকেই যুগপৎ আক্রমণ করেচেন, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে এবং গরিষ্ঠ ভাষায়। তাঁর নির্ভীক লেখনীচালনা এবং সাহিত্যে সত্যপ্রিয়তার অজস্র প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছি নে, এবং না করলেও গুণের ও গুণীর অনাদর করা হবে। যদিচ এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করা, সাহিত্য-জগতে আমার মত অজ্ঞাতকুলশীলের মুখে শোভন হবে না জানি, তথাপি যতীন বাবু স্বয়ংই যখন দেখিয়ে দিয়েচেন, নিজের ধারণায় যা' সত্য বলে' মনে হবে, তা' নির্ভয়ে বলা বা লেখা যেতে পারে,—তা' যে মহারথীর বিরুদ্ধেই

হোক্,—তখন আমার এ দুঃসাহসে আশঙ্কার কারণ নেই। অবশ্য সম্পাদক মহাশয় যদি তাঁর 'কথাটা' আর একটু আগে থেকে আরম্ভ করতেন, তাহলে এ প্রবন্ধের প্রয়োজনই হ'ত না।

যতীন বাবু নাকি ভেবে পান নি, "এত লোক এত বাজে কথা কেন লেখে ও প্রকাশ করে।" না পাবারই ত কথা, কারণ কবিগুরু বাল্মীকি থেকে আরম্ভ করে' কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি মহাকবিদের অমর লেখা সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র-পুঞ্জের মত বর্ত্তমান রয়েচে প্রত্যক্ষ করে'ও যখন ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র মনে লেখার প্রবৃত্তি জন্মে—শুধু তাই নয়, আবার সেই লেখা প্রকাশ করবার অমার্জ্জনীয় আকাঙ্ক্ষাও সে অন্তরে পোষণ করে—তখন যতীন বাবুর ও-কথা লেখবার সঙ্গত কারণ আছে বলতে হবে। কিন্তু কথা হচ্চে এই যে, যুগ যুগ ধরে' সকল দেশেই যখন মানুষ এই অপরাধটা সমান ভাবেই করে' আসচে, তখন মনে হয় এ দুরাকাঙ্ক্ষার জন্য শুধু তা'কেই দোষী করলে নিরপেক্ষ বিচার হবে না; এই দুরাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, বোধ করি তাঁরও এতে দোষ যথেষ্ট রয়েচে, কিন্তু তাঁকে ত আর শোধরাবার উপায় দেখি নে, কাজেই যে সব 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' সাহিত্যচর্চ্চায় অনধিকার চর্চ্চা করতে যাচ্চে, তাদের সংশোধন এবং সংযমন করবার জন্য একজন Censor বা Censorial প্রতিষ্ঠান করা আবশ্যক, যা'তে ক'রে 'অপ্রেরণা'ঘটিত কোন লেখা প্রকাশিত হ'তে না পারে; অথবা সাহিত্যব্যবস্থাপক সভায় এমন সকল আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক, যা'তে ক'রে 'কাজের কথা' প্রকাশ করবার মত ক্ষমতা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন লেখক কোন লেখা প্রকাশ করলে তা'কে সোপর্দ্দ করা যায়, এবং এই অনর্থকারী স্রোতও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

নতুবা কালের দোষে বা গুণে দেশে যখন সাহিত্য-প্লাবতরণ আরম্ভ হয়েচে, তখন ঐরকম একটা কোন ঐরাবতকে দাঁড় করাতে না পারলে আবর্জ্জনাসংস্পর্শে ভাগীরথী-বারি অপবিত্র ও 'ঘোলা' হওয়ার সম্ভাবনা।

যতীন বাবু লিখচেন, তিনি বুঝতে পারেন নি "এত ভাল ভাল লোক প্রতিদিন এত বস্তা বস্তা মিথ্যা কথা লেখেন কেন।" প্রমাণ স্বরূপ তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিষ্ণুশর্ম্মা এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে হাজির করেচেন। তাঁর এ কথায় আমরা যুগপৎ বিস্ময় ও চিন্তায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছি, কারণ সাহিত্যকে এই মিথ্যা-কল্পনা-বহুলতার দোষ হ'তে মুক্ত করতে হ'লে, যে বনিয়াদের উপর এই যুগযুগান্তের মিথ্যা সাহিত্যকে দাঁড় করানো হয়েচে, সর্ব্বাগ্রে সেই বনিয়াদ নষ্ট করতে হবে,—অর্থাৎ মূর্ত্তিমতী মিথ্যা-কল্পনাদেবীকে সাহিত্যক্ষেত্র হ'তে নির্ব্বাসিত করতে হবে; এবং আবিলতাহীন স্বচ্ছ-সুগভীর নিছক সত্যপূর্ণ লেখা-বহুল সাহিত্য সৃষ্টি করতে হ'লে প্রথমতঃ যে সব রোম্যান্স, ফিক্‌সন্, নাটক, নভেল, আখ্যান, উপাখ্যান সাহিত্যে রয়েচে, সে সবগুলিকে summarily বহিষ্কৃত ক'রে দিতে হবে,—নৈলে মঙ্গল নেই। কিন্তু তা' কি সম্ভব হবে। তাই চিন্তা। তথাপি সান্ত্বনা এই যে, চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

যতীন বাবু গল্পলেখকদের উপদেশ দিয়ে বিজ্ঞের মতই লিখেচেন, "অধিকাংশ গল্পলেখক গল্প লিখিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা না করিয়া বাড়ীর ছেলেমেয়েদের অথবা মেয়েছেলেদের নিকট নিজের বাহাদুরীর গল্প করিলেই বোধহয় ভাল হয়"। এ কথা সর্ব্বৈব সত্য, এবং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা সমর্থন করি। কারণ আজকাল কি পলিটিক্স, কি

সাহিত্য, কি সামাজিক ব্যাপার, সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষের কাঁধে এই বাহাদুরী জিনিষটা ভূতের মত চেপে আছে। ইহা সত্যই আনন্দের বিষয় এবং আশার কথা যে, 'মরীচিকার' কবি যতীন বাবু এই ভূতমুক্ত হয়েচেন, এবং সাহিত্যিকদের মুক্ত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েচেন—যার জন্য তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও রেহাই দেন নি। তিনি আরও লিখেচেন, "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) শিষ্যগণ আমাদের নানারূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের 'মনসার কাঁদুনি' পাঠকদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে"। এবং তারই জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটু 'তাড়া' দিতে ইঙ্গিত করেচেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও যতীন বাবুকে একটা কথা বলতে হচ্চে—বিশ্বকবি ত "বর্ণমাত্র বিপ্রলব্ধ" হয়ে পশুরাজ হন নি যে, তাঁকে কড়া হুকুম জারি করতে হবে চারিদিকে, যা'তে স্বজাতি কেউ কাছে ঘেঁসতে না পারে; তিনি হয়েচেন পশুরাজ সিংহ হয়েই, কাজেই চারিদিকে সজাগ দৃক্‌পাত করবার জন্য দিক্‌পাল নিযুক্ত করবার তাঁর দরকার হয়নি। সহস্র অক্ষমতা মার্জ্জনা করবার মত বিরাট হৃদয় তাঁর আছে বলেই তিনি আজ সাহিত্যজগতে সম্রাট; অপরন্তু তিনি ভাল ক'রেই জানেন, সাহিত্যে কোন্‌টি কাজের কোন্‌টি অকাজের, কোন্‌টি অচল কোন্‌টি চল; তা' যাচাই করবার কাজ আর যারই হোক্—কবির নয়। তার জন্য ত রয়েচেন কাল স্বয়ং, আর চার যুগের বিজ্ঞ সমালোচক কেতাব-কীট। সাহিত্যের সকল আবর্জ্জনা ঝেড়ে ফেলে তার আসল জিনিষগুলোকে সেই স্মরণাতীত কাল থেকে তারা যে কেমন ক'রে রক্ষা ক'রে আসচে, তা' কি আবার নূতন ক'রে বলতে হবে?—তারপর 'মনসার কাঁদুনির' কথা। যতীন বাবু যাকে 'মনসার কাঁদুনি' বলে' নাসিকা কুঞ্চিত করেচেন, তা' সাহিত্যক্ষেত্রে

চার যুগেই ছিল এবং থাকবে। সাহিত্য-ঐশ্বর্য্য হিসাবে যে সব দেশকে আমরা শীর্ষস্থানীয় ও অগ্রণী বলে' মান্য করি, সে সব দেশেও এ 'মনসার কাঁদুনি' চলচে, এবং তারই মধ্যে থেকে ভারতীমাতার ভক্তকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতও জন্মলাভ করচে। তারপর এত বড় স্পর্দ্ধা বোধকরি এ যুগে কোন despot-এর নেই যে, চোখ রাঙ্গিয়ে মানুষকে এ অধিকার হ'তে বঞ্চিত করতে পারে। এই সূত্রে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ল। John Stuart Mill এক জায়গায় লিখেচেন—"If all mankind, minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person.........; the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race, posterity as well as the existing generation."

যতীন বাবু রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' সম্পর্কে যা বলেচেন, 'সম্পাদকের কথায়' তার দীর্ঘ আলোচনা হয়ে গিয়েচে, সে বিষয় পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে যতীন বাবু 'চরকা' প্রবন্ধে রবীন্দ্র-গান্ধীর মত-বিভেদের মূলে রামমোহন ও চরকা যে সমান স্থান লাভ করেচে, এই তথ্য আবিষ্কার করেচেন, এবং তাঁর প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েচেন,—এর তাৎপর্য্য বোধগম্য হ'ল না। রবীন্দ্রনাথের 'চরকা' প্রবন্ধে রামমোহন রায় ও চরকা যে সমান স্থান লাভ করেচে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গোচরে ত তা' আসেনি। চরকা বিষয়ে লিখতে গিয়ে তিনি যদি মহাত্মার কর্ম্মপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মর্ম্মপ্রকৃতির কোথায় অমিল, সেই কথাটি পরিস্ফুট করবার জন্য কোন মহাপুরুষ

বিশেষের সম্পর্কিত কোন কথার অবতারণা করেন, তা'হলেই কি চরকার সঙ্গে তাঁর সমান স্থান দেওয়া হল বলতে হবে ? অবশ্য এতদূর স্পর্দ্ধা আমার নেই যে, যতীন বাবুকে 'চরকা' প্রবন্ধের ঐ স্থানটী পুনরায় পাঠ করতে অনুরোধ করি, কাজেই সুধী পাঠকগণের উপর এ ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত রইলেম।

আর একটি কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। পৃথিবীতে সব জিনিষেরই একটা সীমা ও সৌষ্ঠবের দিক আছে, যা' কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না। হাত চেয়ে আম মোটা হ'লে শুধু যে অশোভন দেখায় তা' নয়, হাতওয়ালাকেও অপরিণামদর্শিতার জন্য ক্ষোভ করতে হয়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

ভারতচন্দ্র।

—:•:—

হে ভারত, বাঙ্গালার যাদুকর কবি,
কোন্ মালঞ্চের ফুল করিয়া চয়ন,
গাঁথিলে মোহন মালা, কেড়ে নিলে মন!
অকলঙ্ক কলা তব—অনবদ্য ছবি।
সুন্দর তোমার বিদ্যা—অসুন্দর কহে
কোন্ অরসিক! কাব্যের মাধুরী মাপে
নীতি দিয়া তারা। মধু—মিষ্টত্বের পাপে,
মানদণ্ডে পরিমিত করিবার নহে।
রসহীন জনে—অন্নদার অন্নদান
ব্যর্থ চিরদিন। অনঙ্গ-মঙ্গল গান
কি বুঝিবে, যাহাদের নাহি সুর-বোধ?
কলাগুরু, তাহাদের কোরো তুমি ক্ষমা,
যারা হেলা করে তব শিল্পের সুষমা;
—উপভোগে শক্তি নাই, সে-ই তার শোধ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

ক্ষুধা।

—:•:—

এম, এ, পাশ করবার পর অরুণের জ্ঞানের ক্ষুধা আরো চন্‌চনে হয়ে উঠলো। সে পণ করলে চিরকুমার থেকে বিজ্ঞানদর্শনের অনুশীলন করবে। সে ভিখারী দেখলে বল্‌তো কুঁড়ে, প্রেমিক দেখলে পাগল, আর সন্ন্যাসী দেখলে ভণ্ড। সে তার অর্থসামর্থ্য সমস্ত নিয়োগ করলে একটি প্রকাণ্ড জ্ঞানের মন্দির গড়ে' তুলতে—যাতে সকল যুগের সকল পণ্ডিতের চেলারা পূজারী হয়ে বসলো। কেউ বিদ্যুতের ঘণ্টা নাড়ে, কেউ মায়াবাদের ধুনো পোড়ায়, কারো মুখে পাস্তুরের স্তোত্র, কারো হাতে ভাস্করাচার্য্যের অর্ঘ্য। কি একটা আনন্দের গৌরবে অরুণের মুখকান্তি অরুণের মতই রক্তিম হয়ে উঠলো।

একদিন এক সুন্দরী তরুণী স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে অরুণের জ্ঞানের মন্দিরে ঢুকলো। সে তার অনুষ্ঠাননিপুণ হাত দুটীকে উপচার সম্ভারের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে—কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই অরুণ তার জন্য এক অভূতপূর্ব্ব বেদনা অনুভব করতে লাগলো। একদিন সে যখন উদ্ভিদের সাড়া মাপবার যন্ত্রটীকে ধূলা ও মাকড়সার জালের কবল হতে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিল, তখন অরুণ সহসা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—

"তোমার কর্ম্মক্লান্ত হাত দুটীকে কি একটুও বিশ্রাম দেবেনা লীলা?" লীলা চমকে উঠে প্রশ্ন করলে—"কেন?"

"জানিনা কেন, কিন্তু মনে হয় তুমি একটু স্থির হয়ে বসো, আমি তোমার কাজ করে' দিই। এ কি সহ্য হয় যে তুমি কেবলই ঘাড় নীচু করে থাকবে, এক আধবারও মুখ তুলে চাইবে না, এক আধটীও কথা কইবে না ?"

এর পরেই একদিন জ্ঞানের মন্দিরের চূড়া হুড়মুড় করে' ভেঙ্গে পড়লো। পুঞ্জীভূত পুঁথিপত্র ও সজ্জোপকরণের স্তূপ জঞ্জালের মত অপসারিত হয়ে নীলামে চড়লো, এবং তারই বিক্রয়লব্ধ অর্থে নগরের শ্রেষ্ঠ শিল্পী দিয়ে নির্ম্মিত হ'ল এক নবদম্পতির পুষ্পবাটিকা। অরুণের জ্ঞানের ক্ষুধা ছুটে গিয়ে ভাবের ক্ষুধা জেগেছে। এ ক্ষুধা আরো তীব্র, আরো অতৃপ্ত। কখনো সে সীবনরত লীলার অংসবিলম্বী লীলায়িত কুন্তলের গতি-ভঙ্গিমাটুকু তুলির ডগায় ফোটাবার চেষ্টা করে—কখনো লীলার যূথিকাপেলব অঙ্গুলির ক্ষিপ্র টানে বীণার বুকের তারে যে ঝঙ্কার ওঠে, তারই অবর্ণনীয় মাধুর্য্যটুকু গেঁথে ফেলে কবিতার ছন্দে।

এমনি ভাবেই দিন যায়, কিন্তু বেশীদিন গেল না। কালের দণ্ডনিঃসৃত একটি নিষ্ঠুর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পুষ্পবাটিকার শ্রেষ্ঠ ফুলটীকেই ঝল্‌সে দিলে। অরুণের কাছে এক মুহূর্ত্তেই আকাশের তরল নীলিমা হয়ে গেল তাম্রপিঙ্গল, ধরণীর কোমল মৃত্তিকা প্রস্তরকঠিন।

অরুণের রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশ ও উদ্ভ্রান্ত চোখের তারা সকলকেই জানিয়ে দিলে যে সে এখন বৈরাগ্যপথের যাত্রী! অমনি আত্মীয় স্বজনেরা অনুকম্পাপরবশ হয়ে তার মানস-ঝুলিতে এমন সব তত্ত্ব-জ্ঞানের পাথেয় নিক্ষেপ করতে লাগলেন যে, সে অচিরেই তার বিপুল ঐশ্বর্য্য জনে জনে বিভাগ করে' দিয়ে, দীক্ষাগুরুর সন্ধানে বেরিয়ে

পড়লো। তার সকল ক্ষুধার নদী এখন আত্মার সমুদ্রে পড়ে' উত্তাল তরঙ্গে নেচে উঠেচে।

পর্ব্বত বন প্রান্তর ভেদ করে' অরুণ কেবলই চলেচে, কেবলই চলেচে। তার ক্ষুধিত আত্মা এখন কেবল নিত্য সত্যকেই চায়। এ ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারেন, এমন মনুষ্যগুরুর সন্ধান সে পেলে না। যারা নিজেরাই সংসারের মায়ামোহ-কটাহে ভাজা ভাজা হচ্চে, তাদের উপদিষ্ট কুম্ভকপ্রাণায়ামের উপর সে কেন না বীতশ্রদ্ধ হবে ? সে ঠিক করলে প্রকৃতি-মায়ের দিগ্বলয় আঁচল লুট করে' আত্ম-রহস্যের চাবি ছিনিয়ে নেবে। এক কথায়—তার কিছু কিছু চিত্তবিকারের লক্ষণ দেখা দিলে।

সে বেরিয়েছিল গ্রীষ্মের প্রাক্‌কালে—এখন শীতের সূচনা। সচ্ছন্দ বন-জাত ফল এখন তার পক্ষে দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েচে। তার কঙ্কালসার শীর্ণ শরীরে আর যৌবনের চিহ্নমাত্রও নেই। লাবণ্যহীন বলিকুঞ্চিত জরা কখন যে তাকে অধিকার করে' বসেচে, তা' সে জানতেও পারেনি। হঠাৎ একদিন তার মনে হ'ল সে আর যষ্টি ভিন্ন হাঁটতে পারে না—তার চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সঙ্গে সঙ্গে তার এমনও একটা ইচ্ছা হতে লাগলো, সে নিজের রক্তমাংস নিজে কামড়ে চুষে খায়। তার বক্ষের নিম্নতন কোন প্রদেশে একটা বিরাট খাণ্ডবানলের মত আগুন ধূধূ করে জ্বলে উঠেচে।

এরই নাম কি দেহের ক্ষুধা ?—সে বড় লোকের ছেলে, দেহের ক্ষুধা কা'কে বলে জানতো না, জানবার সময়ও কেউ তা'কে দেয় নি। কিন্তু আজ সে প্রথম বুঝলে দেহের ক্ষুধা আছে, সত্যই আছে, নিত্যই আছে। এক নিমেষে তার আত্মার ক্ষুধার স্বপ্ন ছায়াবাজীর মত

মিলিয়ে গেল। সে দেহের ক্ষুধার মধ্যে জেগে উঠেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে সহরে ফিরে এল।

সে সারাদিন সহরের অলিগলির মধ্যে ঘুরে বেড়ালো মুষ্টিভিক্ষার জন্য। কিন্তু কে ভিক্ষা দেবে? তার চোখমুখ দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছিল একটা হিংস্র লোলুপ উন্মাদনা—একটা অসহিষ্ণু যথেচ্ছাচার। ছেলেরা তা'কে রাক্ষস মনে করে' ভয়ার্ত্ত চীৎকারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো; গৃহিণীরা তা'কে মায়াবী মনে করে' তার মুখের উপরেই ধমাস্ করে দরজা বন্ধ করে' দিলেন। সন্ধ্যার সময় এক পাল রাস্তার কুকুর তা'কে চারদিক থেকে ঘেউ ঘেউ করে' ছেঁকে ধরলে।

রাত যখন খুব গভীর, তখন অরুণের দুই হাঁটু আপনা হতে কাঁপচে, ভেঙ্গে দুমড়ে আসচে। প্রখর শীতের কন্‌কনে বাতাস সে একটুকুও কষ্টকর বলে' অনুভব করতে পারচে না, কিন্তু তার মনে হচ্চে সমস্ত সহর একটা প্রকাণ্ড হাঁ করে' তা'কে গিলতে চাইচে—বড় বড় বাড়ীর প্রত্যেক ইঁটখানাও চীৎকার করে বলচে—'খাই খাই—বড় ক্ষুধা।' সে একটা উঁচু প্রাসাদের ফটকের গোড়ায় ভারপিষ্ট বলদের মত বসে' পড়লো। রোগক্লিষ্ট মুমূর্ষুর ক্ষীণ আর্ত্তনাদের মত নৈশ আকাশে মিলিয়ে গেল তার শেষ প্রার্থনা—

"মা! দুটী ভিক্ষা—বড় ক্ষুধা।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

মানবী।

—:o:—

দেবী বলে' আমি ভেবেছিনু তোমা,
নাহি যদি তুমি দেবতা হও,
মানবী হয়েই থাক চিরকাল,
প্রণয়িনী হয়ে হৃদয়ে রও।
যদিও তোমার শ্রীচরণমূলে
ভক্তি-অশ্রু-নিষিক্ত ফুলে
পূজিতে না পারি, তবু জানি তুমি
আমার হেলার যোগ্যা নও।
বেদী ছেড়ে আজ নেমে এস বুকে,
পূজা ছেড়ে আজ প্রণয় লও ॥

জীবনের পথে চলিতে চলিতে
হয়ে থাকে যদি স্খলন ত্রুটি,
প্রলোভনে যদি পারনি জিনিতে,
পদতলে তার পড়েছ লুটি;
শ্লথ মুহূর্ত্তে অবসাদ-ভরা
যদি চেয়ে থাক সংযমহরা
আত্মদানের চরম রভস,
কেন লাজে ভেজে নয়ন ছুটি?
বল উল্লসি, "ছিঁড়ে রসারসি
পেনু তো বারেক বিপুল ছুটি"!

পুণ্য ও পাপ মিছে পরিতাপ,
ব্যর্থ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, নীতি;
সময়-অনলে সব যায় জ্বলে—
কুল-কলঙ্ক, দোষের স্মৃতি।
প্রতিবেশ তব ছিল প্রতিকূল,
হয়তো বা তাই হয়েছিল ভুল—
সুযোগ আসেনি, চরণ খসেনি,
তাই আমি সাধু, তাইতো কৃতী।
প্রলোভনে তুমি পরাজিত হয়ে
শিখেছ তাহার জয়ের রীতি॥

কিবা তব দোষ, কেন আফ্‌শোষ,
বিচার কে তার করিবে আজি?
কোন্ মদিরায় কোথা নিয়ে যায়,
ঠিকানা তাহার না জানে কাজী।
উদার, অমল চন্দ্রের সম
হৃদয়ে তোমার যদি অণুতম
রেখা পড়ে, হায়! কিবা আসে যায়?
ম্লান নাহি হবে কিরণরাজি।
চালানো তোমায় কাজ নহে মোর—
আমি কি জীবন-তরীর মাঝি?

দেবী বলে' যবে ভেবেছিনু তোমা,
ছিনু তোমা হ'তে সুদূরে অতি;
ভালো করে' আজ চিনেছি তোমায়,
মানবী হইতে কিসের ক্ষতি ?
আজি আসিয়াছ অহমিকাহারা,
নয়নের কোণে অনুতাপ-ধারা—
দেবী নহ আজ, প্রেম-ভিখারিণী,
সম্ভ্রমহীনা, বিগত-জ্যোতি।
মমতার টানে টেনেছ আমারে,
বন্ধু আমি হে, নহি তো পতি॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

কোপাই।

——:০:——

তার সঙ্গে আমার ষোল বছরের পরিচয়। এই ষোল বছরের পরিচয়ে আজ সে ষোড়শী—ষোলটি বর্ষায় সে মত্ত, ষোলটি শরতে ক্ষীণ, ষোলটি শীতে সে স্বচ্ছ, ষোলটি গ্রীষ্মে শুষ্ক। সবাই তাকে ডাকে কোপাই—আমি তার নাম দিয়াছি কোপবতী; অনুরাগের রঙও লাল, রাগের রঙও লাল,—অনুরাগের পাত্রকে তাই মাঝে মাঝে দেখিতে সাধ যায় রাগাইয়া; কোপবতী আমার সেই সাধের নাম।

গঙ্গা পদ্মা যেন রামায়ণ মহাভারতের মত দেশের বুক জুড়িয়া পড়িয়া আছে—তাহারা কাহারো নিজস্ব নহে; কিন্তু কোপাই আমারই ছোট্ট একটি লিরিক। এতদিন দেখিয়া দেখিয়া তাহার প্রতিটি ভঙ্গি আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। এই এক-অঞ্জলি নদীটির দুই তীরের তরুপল্লবে ছুঁই ছুঁই করে, ওপারের আখের বনে শালিকের বকাবকি এপার হইতে বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। এই বনচারিণী তরলাকে কালিদাসের কালের নিপুণিকা চতুরিকাদের একজন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় এ আপনার আলোছায়ার ঢেউখেলানো ডুরে শাড়িখানিকে এমনভাবে জড়াইয়া লইয়াছে যে, প্রতি পদক্ষেপে ইহার কমনীয় তনুলতা আপনাকে প্রকাশ করে। কবি হইলে ইহাকে সম্বোধন করিতাম তন্বী বলিয়া।

এই দীর্ঘ পরিচয়ে কতরকমেই না তাহাকে দেখিয়াছি—কখনো আষাঢ়ের জটামুক্ত জলপ্লাবনে ফুলিতে ফুলিতে দুই তীরের কচি মাঠ

গ্রাস করিয়া, প্রাচীন আমবনের তলে তলে ভাসিয়া-আসা বাব্‌লার ফুল দুলাইয়া, ডুবিয়া-যাওয়া শণক্ষেতের হলুদবরণ ফুলগুলি নাচাইয়া তরঙ্গে উঠিতে, আবর্ত্তে ফুটিতে, সন্ত্রস্ত গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটিয়া মরিতে। সে কি ঘোলা জল, সে কি মহা রাগ—সেই আমার কোপবতী। আবার দেখিয়াছি শীতকালে যখন বারির অপেক্ষা বালি বেশি; একটুখানি স্বচ্ছ ধারা আছে কি নাই। তখন তীরের শোভাই শোভা; বনকুলের গাছ কুলে ভরা; খেজুর রসের মৌতাতে বাতাস অবশ; শূন্য ক্ষেত হইতে শেষ গাড়ী ধান ঘরের মুখে চলিয়াছে। এই রকম কত না স্মৃতির জাল বুনিয়া এই নদীগর্ভে ফেলিয়াছি।

কিন্তু কেউ কি জানে কেন বারে বারে এই নদীর উৎস পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া গিয়াছি?—ইহারি তীরে আমার তেপান্তরের মাঠ, ইহারি স্রোতে আমার তেরোটি নদী এবং সাতটি সমুদ্র। এতদিনে ইহার একটি মানচিত্র আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে আগে ওঠে মেঘ, সেখানে আগে ঝরে বর্ষা, সেখানে আসে বন্যা, সেখানে ফোটে ফুল—বাহিরে আর তাহার কতটুকু? সেখানে এ যমুনা গঙ্গা নির্ব্বিন্ধ্যা রেবার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে ইহার উৎস কৈলাস পাদমূলে মানস-হ্রদে, সেখানে ইহার অবসান ভারত মহা-সমুদ্রে। এমন আমার শক্তি নাই যে শিপ্রা রেবা নির্ব্বিন্ধ্যা বা পদ্মার মত ইহাকে কাব্যলোকে অমর করিয়া রাখি,—কিন্তু এই বড় সৌভাগ্য যে, সে বিশেষ করিয়া আমারই, একান্তই আমার, সে আমার কোপবতী, আমার কোপাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

গল্প লেখা।

—গালে হাত দিয়ে ব'সে কি ভাবছ?

—একটা গল্প লিখতে হবে, কিন্তু মাথায় কোনও গল্প আস্‌ছে না, তাই ব'সে ব'সে ভাবছি।

—এর জন্য আর এত ভাবনা কি? গল্প মনে না আসে, লিখো না।

—গল্প লেখার অধিকার আমার আছে কি না জানিনে, কিন্তু না লেখবার অধিকার আমার নেই!

—কথাটা ঠিক বুঝলুম না।

—আমি লিখে খাই, তাই inspiration-এর জন্য অপেক্ষা কর্‌তে পারিনে। ক্ষিধে জিনিষটে নিত্য, আর inspiration অনিত্য।

—লিখে যে কত খাও, তা' আমি জানি! তা'হ'লে একটা পড়া-গল্প লিখে [illegible]।

—লোকে যে সে চুরি ধর্‌তে পার্‌বে।

—ইংরেজী থেকে চুরিকরা গল্প বেমালুম চালানো যায়।

—যেমন ইংরেজকে ধুতি চাদর পরালে তা'কে বাঙ্গালী ব'লে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া যায়।

—দেখ, এ উপমা খাটে না। ইংরেজ ও বাঙ্গালীর বাইরের চেহারায় যেমন স্পষ্ট প্রভেদ আছে, মনের চেহারায় তেমন স্পষ্ট প্রভেদ নেই।

—অর্থাৎ ইংরেজও বাঙ্গালীর মত আগে জন্মায়, পরে মরে—আর জন্ম-মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টা ছট্‌ফট্‌ করে।

—আর এই ছট্‌ফটানিকেই ত আমরা জীবন বলি।

—তা ঠিক, কিন্তু এই জীবন জিনিষটিকে গল্পে পোরা যায় না—অন্ততঃ ছোট গল্পে ত নয়ই। জীবনের ছোট-বড় ঘটনা নিয়েই গল্প হয়। আর সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যা' নিত্য ঘটে, এ দেশে তা' নিত্য ঘটে না।

—এইখানেই তোমার ভুল। যা' নিত্য ঘটে, তা'র কথা কেউ শুনতে চায় না; ঘরে যা' নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে আর কে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে যায়?—যা' নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।

—এই তোমার বিশ্বাস?

—এ বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাত দুপুরে একটা পড়ো-মন্দিরে আশ্রয় নিলুম—আর অমনি হাতে পেলুম একটি রমণী, আর সে যে সে রমণী নয়! একেবারে তিলোত্তমা! এরকম ঘটনা বাঙ্গালীর জীবনে নিত্য ঘটে না, তাই আমরা এ গল্প একবার পড়ি, দু'বার পড়ি, তিনবার পড়ি—আর পড়েই যা'ব যতদিন না কেউ এর চাইতেও বেশী অসম্ভব আর একটা গল্প লিখবে।

—তা'হ'লে তোমার মতে গল্পমাত্রেই রূপকথা?

—অবশ্য।

—ও দু'য়ের ভিতর কোনও প্রভেদ নেই ?

—একটা মস্ত প্রভেদ আছে। রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোল আনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব ব'লে মানি।

—তা'হ'লে বলি, ইংরেজী গল্পের বাঙ্গলা করলে তা' হ'বে রূপকথা।

—অর্থাৎ বিলেতের লোক যা' লেখে, তাই অলৌকিক।

—অসম্ভব ও অলৌকিক এক কথা নয়। যা' হ'তে পারে না, কিন্তু হয়, তাই হচ্ছে অলৌকিক। আর যা' হ'তে পারে না ব'লে হয় না, তাই হচ্ছে অসম্ভব।

—আমি ত বাঙ্গলা গল্পের একটা উদাহরণ দিয়েছি। তুমি এখন ইংরেজী গল্পের একটা উদাহরণ দেও।

—আচ্ছা দিচ্ছি। তুমি দিয়েছ একটি বড় লেখকের বড় গল্পের উদাহরণ; আমি দিচ্ছি একটি ছোট লেখকের ছোট গল্পের উদাহরণ।

—অর্থাৎ যা'কে কেউ লেখক ব'লে স্বীকার করে না, তার লেখার নমুনা দেবে ?—একেই বলে প্রত্যুদাহরণ।

—ভালমন্দের প্রমাণ, জিনিষের ও মানুষের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। লোকে বলে, মাণিকের খানিকও ভাল।

—এই বিলেতী অজ্ঞাতকুলশীল লেখকের হাত থেকে মাণিক বেরয় ?

—মাছের পেট থেকেও যে হীরের আংটী বেরয়, এ কথা কালিদাস জানতেন।

—এর উপর অবশ্য কথা নেই। এখন তোমার গল্প বার করো।

—লণ্ডনে একটি যুবক ছিল, সে নেহাৎ গরীব। কোথাও চাকরী না পেয়ে সে গল্প লিখতে ব'সে গেল। তা'র inspiration এল হৃদয় থেকে নয়—পেট থেকে। যখন তা'র প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হ'ল, তখন সমস্ত সমালোচকরা বল্‌লে যে, এই নতুন লেখক আর কিছু না জানুক, স্ত্রী-চরিত্র জানে। সমালোচকদের মতে ভদ্রমহিলাদের সম্বন্ধে তা'র যে অন্তর্দৃষ্টি আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের বইয়ের সমালোচনার পর সমালোচনা প'ড়ে লেখকটিরও মনে এই ধারণা ব'সে গেল যে, তাঁ'র চোখে এমন ভগবদ্দত্ত X-rays আছে, যা'র আলো স্ত্রীজাতির অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত সোজা পৌঁছয়। তারপর তিনি নভেলের পর নভেলে স্ত্রীহৃদয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁ'র নাম হয়ে গেল যে, তিনি স্ত্রী-হৃদয়ের একজন অদ্বিতীয় expert। আর ঐ ধরণের সমালোচনা পড়তে পড়তে পাঠিকাদেরও বিশ্বাস জন্মে' গেল যে, লেখক তাঁ'দের হৃদয়ের কথা সবই জানেন; তাঁ'র দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গীর মধ্যেও তিনি রমণীর প্রচ্ছন্ন হৃদয় দেখতে পান! মেয়েরা যদি শোনে যে কেউ হাত দেখতে জানে, তা'কে যেমন তা'রা হাত দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারে না—তেমনই বিলেতের সব বড় ঘরের মেয়েরা ঐ ভদ্রলোককে নিজেদের কেশের বেশের বিচিত্র রেখা ও রঙ সব দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। ফলে তিনি নিত্য ডিনারের নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। কোনও সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁ'র কস্মিনকালেও কোনও কারবার ছিল না, হৃদয়ের দেনা-পাওনার হিসেব তাঁ'র মনের খাতায় একদিনও অঙ্কপাত করে নি।

তাই ভদ্রসমাজে তিনি মেয়েদের সঙ্গে দু'টি কথাও কইতে পারতেন না, ভয়ে ও সঙ্কোচে তাঁদের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকতেন। ইংরেজ ভদ্রলোকরা ডিনারে ব'সে যত না খায়, তা'র চাইতে ঢের বেশী কথা কয়। কিন্তু আমাদের নভেলিষ্ট্‌টি কথা কইতেন না—শুধু নীরবে খেয়ে যেতেন। এর কারণ, তিনি ওরকম চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় জীবনে কখনও চোখেও দেখেন নি। এর জন্য তাঁ'র স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার খ্যাতি পাঠিকাদের কাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ল না। তা'রা ধ'রে নিলে যে, তাঁ'র অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আছে বলেই বাহ্যজ্ঞান মোটেই নেই। আর তাঁ'র নীরবতার কারণ তাঁ'র দৃষ্টির একাগ্রতা। ক্রমে সমগ্র ইংরেজ-সমাজে তিনি একজন বড় লেখক ব'লে গণ্য হলেন, কিন্তু তা'তেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি হ'তে চাইলেন এ যুগের সব চাইতে বড় লেখক। তাই তিনি এমন কয়েকখানি নভেল লেখবার সঙ্কল্প করলেন, যা' সেক্সপিয়ারের নাটকের পাশে স্থান পাবে।

এ যুগে এমন বই লণ্ডনে ব'সে লেখা যায় না; কেন না, লণ্ডনের আকাশ-বাতাস কলের ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। তাই তিনি পাত্তাড়ি গুটিয়ে প্যারিসে গেলেন; কেন না, প্যারিসের আকাশ-বাতাস মনোজগতের ইলেকট্রিসিটিতে ভরপুর। এ যুগের য়ুরোপের সব বড় লেখক প্যারিসে বাস করে, আর তা'রা সকলেই স্বীকার করে যে, তা'দের যে সব বই Nobel prize পেয়েছে, সে সব প্যারিসে লেখা। প্যারিসে কলম ধরলে ইংরেজের হাত থেকে চমৎকার ইংরেজী বেরয়, জার্ম্মাণের হাত থেকে সুবোধ জার্ম্মাণ, রাসিয়ানের হাত থেকে খাঁটি রাসিয়ান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্যারিসের সমগ্র আকাশ অবশ্য এই মানসিক ইলেকট্রিসিটিতে

পরিপূর্ণ নয়। মেঘ যেমন এখানে ওখানে থাকে, আর তা'র মাঝে মাঝে থাকে ফাঁক, প্যারিসেও তেমনই মনের আড্ডা এখানে ওখানে ছড়ানো আছে। কিন্তু প্যারিসের হোটেলে গিয়ে বাস করার অর্থ মনোজগতের বাইরে থাকা।

তাই লেখকটি তাঁ'র masterpiece লেখবার জন্য প্যারিসের একটি আর্টিষ্টের আড্ডায় গিয়ে বাসা বাঁধলেন। সেখানে যত স্ত্রী-পুরুষ ছিল, সবই আর্টিষ্ট,—অর্থাৎ সবারই ঝোঁক ছিল আর্টিষ্ট হ'বার দিকে।

এই হবু-আর্টিষ্টদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল স্ত্রীলোক। এরা জাতে ইংরেজ হলেও মনে হয়ে উঠেছিল ফরাসী।

এদের মধ্যে একটি তরুণীর প্রতি নভেলিষ্টের চোখ পড়ল। তিনি আর পাঁচজনের চাইতে বেশী সুন্দর ছিলেন না, কিন্তু তা'দের তুলনায় ছিলেন ঢের বেশী জীবন্ত। তিনি সবার চাইতে বকতেন বেশী, চলতেন বেশী, হাসতেন বেশী। তা'র উপর তিনি স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিচারে সকলের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করতেন, কোনরূপ রমণীসুলভ ন্যাকামি তাঁ'র সচ্ছন্দ ব্যবহারকে আড়ষ্ট করত না। পুরুষজাতির নয়ন-মন আকৃষ্ট করবার তাঁ'র কোনরূপ চেষ্টা ছিল না, ফলে তা'দের নয়ন মন তাঁ'র প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'ত।

দু'চার দিনের মধ্যেই এই নবাগত লেখকটির তিনি যুগপৎ বন্ধু ও মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ালেন। লেখকটি যে ঘাগ্‌রা দেখলেই ভয়ে, সঙ্কোচে ও সম্ভ্রমে জড়সড় হয়ে পড়তেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং এঁদের ভিতর যে বন্ধুত্ব হ'ল, সে শুধু মেয়েটির গুণে।

নভেলিষ্টের মনে এই বন্ধুত্ব বিনাবাক্যে ভালবাসায় পরিণত হ'ল।

নভেলিষ্টের বুক এতদিন খালি ছিল, তাই প্রথম যে রমণীর সঙ্গে তাঁ'র পরিচয় হ'ল, তিনিই অবলীলাক্রমে তা' অধিকার ক'রে নিলেন। এ সত্য অবশ্য লেখকের কাছে অবিদিত থাক্‌ল না, মেয়েটির কাছেও নয়। লেখকটি মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্য মনে মনে সাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভরসা ক'রে সে কথা মুখে প্রকাশ করতে পারলেন না। এই স্ত্রীহৃদয়ের বিশেষজ্ঞ এই স্ত্রীলোকটির হৃদয়ের কথা কিছুমাত্রও অনুমান করতে পারলেন না। শেষটা বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবার কাল ঘনিয়ে এল। মেয়েটি একদিন বিষণ্ণভাবে নভেলিষ্টকে বল্‌লে যে, সে দেশে ফিরে যাবে—টাকার অভাবে। আর ইংলণ্ডের এক মরা পাড়াগাঁয় তা'কে গিয়ে school mistress হ'তে হবে—পেটের দায়ে। তা'র সকল উচ্চ আশার সমাধি হ'বে ঐ সৃষ্টিছাড়া স্কুল-ঘরে, আর সকল আর্টিষ্টিক শক্তি সার্থক হ'বে মুদিবাকালির মেয়েদের grammar শেখানতে। এ কথার অর্থ অবশ্য নভেলিষ্টের হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। দু'দিন পরেই মেয়েটি প্যারিসের ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে হাসিমুখে ইংলণ্ডে চ'লে গেল। কিছুদিন পরে সে ভদ্রলোক মেয়েটির কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন। তা'তে সে তা'র স্কুলের কারাকাহিনীর বর্ণনা এমন স্ফূর্তি ক'রে লিখেছিল যে, সে চিঠি পড়ে' নভেলিষ্ট মনে মনে স্বীকার করলেন মেয়েটি ইচ্ছে করলে খুব ভাল লেখক হ'তে পারে। নভেলিষ্ট সে পত্রের উত্তর খুব নভেলী ছাঁদে লিখলেন। কিন্তু যে কথা শোনবার প্রতীক্ষায় মেয়েটি ব'সে ছিল, সে কথা আর লিখলেন না। এ উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর এল না। এদিকে প্রত্যুত্তরের আশায় বৃথা অপেক্ষা ক'রে ক'রে ভদ্রলোক প্রায় পাগল হয়ে উঠল। শেষটা একদিন সে মনস্থির করলে

যে, যা' থাকে কুলকপালে, দেশে ফিরে গিয়েই ঐ মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব করবে। সেইদিনই সে প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে চ'লে গেল। তা'র পরদিন সে মেয়েটি যেখানে থাকে, সেই গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গাড়ী থেকে নেমেই সে দেখলে যে মেয়েটি পোষ্ট-আফিসের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি বল্‌লে, "তুমি এখানে ?"

"তোমাকে একটি কথা বল্‌তে এসেছি।"

"কি কথা ?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"সে ত অনেকদিন থেকেই জানি। আর কোনও কথা আছে ?"

"আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

"এ কথা আগে বল্‌লে না কেন ?"

"এ প্রশ্ন কর্‌ছ কেন ?"

"আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

"কার সঙ্গে ?"

"এখানকার একটি উকীলের সঙ্গে।"

এ কথা শুনে নভেলিষ্ট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর মেয়েটি পিঠ ফিরিয়ে চ'লে গেল।

—বস্, গল্প ঐখানেই শেষ হ'ল ?

—অবশ্য ! এর পরও গল্প আর কি ক'রে টেনে বাড়ানো যেত ?

—অতি সহজে। লেখক ইচ্ছে করলেই বল্‌তে পারতেন যে, ভদ্রলোক প্রথমতঃ থতমত 'খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন, পরে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে 'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং' ব'লে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে মেয়েটির পিছনে ছুটতে লাগলেন, আর সেও

খিল খিল ক'রে হাসতে হাসতে ছুটে পালাতে লাগল। রাস্তায় ভিড় জ'মে গেল। তা'রপর এসে জুটল সেই solicitor স্বামী, আর সঙ্গে এল পুলিস। তারপর যবনিকাপতন।

—তাহ'লে ও ট্রাজেডি ত কমেডি হয়ে উঠত।

—তা'তে ক্ষতি কি? জীবনের যত ট্রাজেডি তোমাদের গল্পলেখক-দের হাতে প'ড়ে' সবই ত comic হ'য়ে ওঠে। যে তা' বোঝে না, সে-ই তা' প'ড়ে কাঁদে; আর যে বোঝে, তা'র কান্না পায়।

—রসিকতা রাখো। এ ইংরেজী গল্প কি বাঙ্গলায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায়?

—এরকম ঘটনা বাঙ্গালী-জীবনে অবশ্য ঘটে না।

—বিলেতী জীবনেই যে নিত্য ঘটে, তা নয়—তবে ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের জীবনে?

—এ গল্পের আসল ঘটনা যা', তা' সব জাতের মধ্যেই ঘটতে পারে।

—আসল ঘটনাটি কি?

—ভালবাস্‌ব, কিন্তু বিয়ে কর্‌ব না, সাহসের অভাবে—এই হচ্ছে এ গল্পের মূল ট্রাজেডি।

—বিয়ে ও ভালবাসার এই ছাড়াছাড়ি এ দেশে কখনও দেখেছ? না শুনেছ?

—শোনবার কোনও প্রয়োজন নেই, দেখেছি দেদার।

—আমি কখনও দেখিনি, তাই তোমার মুখে শুনতে চাই।

—তুমি গল্পলেখক হয়ে এ সত্য কখনও দেখনি, কল্পনার চোখেও নয়?

—না।

—তোমার দিব্যদৃষ্টি আছে।

—খুব সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু তোমার খোলা চোখে ?

—এমন পুরুষ ঢের দেখেছি, যা'রা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু ভালবাসতে পারে না।

—আমি ভেবেছিলুম তুমি বল্‌তে চাচ্ছ যে—

—তুমি কি ভেবেছিলে জানি। কিন্তু বিয়ে ও ভালবাসার অমিল এ দেশেও যে হয়, সে কথা ত এখন স্বীকার করছ ?

—যাক্‌ ও সব কথা। ও গল্প যে বাঙ্গলায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায় না, এ কথা ত মানো ?

—মোটেই না। টাকা ভাঙ্গালে রূপো পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তামা। অর্থাৎ জিনিষ একই থাকে, শুধু তা'র ধাতু বদলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তা'র রঙ। যে ধাতু আর রঙ বদ্‌লে নিতে জানে, তা'র হাতে ইংরেজী গল্প ঠিক বাঙ্গলা হ'বে। ভাল কথা, তোমার ঐ ইংরেজী গল্পটার নাম কি ?

—The man who understood woman.

—এ গল্পের নায়ক প্রতি বাঙ্গালী হ'তে পারবে। কারণ, তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছ the man who understood woman.

—এই ঘণ্টাখানেক ধ'রে বকর্ বকর্ ক'রে আমাকে একটা গল্প লিখতে দিলে না।

—আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেও, সেইটেই হবে—

—গল্প না প্রবন্ধ ?

—একাধারে ও দুই-ই।

—আর তা' পড়বে কে, পড়ে' খুসীই বা হবে কে ?

—তা'রা, যা'রা জীবনের মর্ম্ম বই প'ড়ে শেখে না, দায়ে পড়ে শেখে—অর্থাৎ মেয়েরা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

যজ্ঞফল।

—:*:—

—ও যে অট্টহাসি! ও কি মা-ই হেসে উঠ্‌লেন বাবা?

—হাঁ, বাবা। ও তিনি-ই।

—তারপর......

—তারপর সকল চিকিৎসা যখন শেষ হ'ল, কিছুতেই কিছু হ'ল না, তখন আমার গুরুদেবের শরণাপন্ন হলুম।

—গুরুদেব! তা' তিনিও এসে খুব ঘটা করে'ই শান্তিস্বস্ত্যয়ন করলেন নিশ্চয়!

—না বাবা, অবিশ্বাসের কথা নয়। তিনি সত্যসত্যই মহাপুরুষ। তাঁর পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন; শ্মশানেই থাকতেন। এঁরা অবশ্য গৃহী, কিন্তু গুরুদেবের নিজের মুখেই শুনেছি গৃহী হ'তে পেরেছেন শুধু বৈরাগ্যে আর ভোগে তাঁর ভেদজ্ঞান দূর হয়েছিল ব'লে।

—এ সব কথা আমি ভালো বুঝি নে। তারপর বলুন শুনি...

—তিনি এসে যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞের পর আমাকে ডেকে হেসে বল্‌লেন—"কালিকাপ্রসাদ, প্রত্যাদেশ পেলুম এই বছরেই পুত্রমুখ দর্শন করবে।" হৈম পাশের ঘরেই ছিল, এক মুঠো মোহর নিয়ে ছুটে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলে। গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করলেন "সুপুত্রবতী হও।"

—তারপরেই বুঝি আমি হলুম…

—না, অত সহজে তুমি আমাদের দয়া করনি বাবা। গুরুদেব বল্‌তেন—"সুপুত্র কত আরাধনার ধন!" হৈম কি তোমার জন্য কম তপস্যা করেচে!

—তপস্যা?

—হাঁ বাবা, তপস্যা। গুরুদেব বল্‌লেন—"শুধু ছেলে হ'লেই তো হবে না, ছেলের মত ছেলে হওয়া চাই; নইলে এত বড় জমিদারী—একটা রাজ্য—এটা তো চালিয়ে যেতে হবে।"

—বটে! আমি যে অন্নের গ্রাসটিও মুখের ভিতর ঠিকমত চালনা করতে শিখি নি—সেও যে মাসিমারই কাজ ছিল বাবা।

—হবে, বয়স হ'লে সব হবে। বি-এ পাস দিলেই কি বয়স হ'ল বাবা?

—যাক্, তারপর?

—তারপর তিনি আমাকে একদিন বল্‌লেন—"কালিকাপ্রসাদ, হৈমীর মধ্যে মা যশোদার বিভূতি দেখতে পাচ্ছি।" এই ব'লে হ্লাদিনী, কুলকুণ্ডলিনী, মূলাধার পদ্ম, ষট্‌চক্র…কি সব বল্‌লেন আমরা তো অত শত ধরতে পারিনে বাবা। শেষে বল্‌লেন—"সেই শক্তি ওতে সুপ্ত রয়েছে, তা'কে জাগ্রত করতে হবে।" বল্‌লেন—"যোগনিদ্রা তোমরা বুঝবে না, কিন্তু আজকালকার hypnotic suggestion হয়ত বুঝতে পারবে…

—হাঁ, ওটা বুঝি বটে।

—তারপর হৈমকে নিয়ে তাঁর কি সাধনা! দুপুর রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু তাঁদের…

—বাবা! ঐ···আবার! এবার চীৎকার করে’ কাঁদ্‌ছেন! মা, না? নিশ্চয়···

—হাঁ বাবা, তিনিই। ওতে ভয় পেয়ো না তুমি—

—আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন না বাবা···

—ওটা একটু থামুক। সে-ই এ ঘরে আসবে নিশ্চয়।

—আমাকে তো চিনতে পারবেন না! কি হবে?

—আমি চিনিয়ে দেব।

—কিন্তু চিনিয়ে দিলেই কি চিন্‌তে পারবেন?

—বোধ হয় না। তবু চেষ্টা করে’ দেখ্‌ব। তুমি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘট্‌ল। রাতদিন বিভীষিকা দেখ্‌ত—ঐ গুরুদেবকেই। গুরুদেবকে চিঠি লিখলুম, তিনি উত্তরে লিখলেন—“ভগবানের ভার সহ্য করতে পারছে না।”

—গুরুদেবকে নিয়ে এলেন না কেন?

—তার আর সুযোগ পেলুম কই বাবা? সন্ধান করে’ জানলুম তাঁর ডাক এসেছিল, তিনি হিমালয়ে চলে’ গেছেন।

—তারপর?

—তারপর উন্মত্ততা ক্রমে চরমে গিয়ে দাঁড়াল। ঐ বিভীষিকা দেখতে দেখতে একদিন তোমাকে গলা টিপেই মেরে ফেলে আর কি!

—বেঁচে যেতুম বাবা তবে!

—ছিঃ বাবা! অক্ষয় অমর হও তুমি। আমার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা তুমি, তোমার মুখের দিকে চেয়েই এখনো আমি সংসারে রয়েছি···কাছে এস বাবা, না. আরো কাছে এস! যখন দেখলুম

প্রসূতির ঐ অবস্থা, আমি অগত্যা তোমাকে তোমার মাসিমার ওখানে পাঠিয়ে দিলুম।

—হাঁ বাবা, আমার সেই বন্ধ্যা মাসিমা যাগযজ্ঞ না করে'ও আমাকে পেয়ে পুত্রবতী হবার আনন্দ পেয়েছেন! তারপর…

—তারপর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখলুম। তুমিও চোখের আড়াল হ'লে—সেও ভালোমানুষটি হয়ে গেল! কে বল্‌বে যে সে মা হয়েছিল, পাগল হয়েছিল! যেন কিছুই হয়নি। সে যেন আমাদের সেই নববধূ হৈম—মাঝখানে যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, সে যেন আমরা সবাই একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম—তার বেশী আর কিছু নয়। ডাক্তাররা দেখে বল্‌লে—'বেশ হয়েছে। ছেলের কথা আর মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই—হিতে বিপরীত হবে।' সেই থেকে তুমি তোমার মাসিমার ওখানেই মানুষ হয়েছ, আমিও চুরি করে' চুপি চুপি তোমাকে দেখে এসেছি। তুমিও এতদিন জেনে এসেছ ঐ মাসিমা-ই তোমার মা…যে তোমাকে গর্ভে ধরেছিল সে মরে' গেছে।

—বাবা, তবে আজ আমাকে এখানে আনা আপনার উচিত হয়নি, আমি মাসিমার ওখানেই ফিরে যাই।

—না বাবা, সে তোমাকে দেখবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে…

—তবে তিনি শুনেছেন?

—শুনেছেন।

—কে শোনা'ল? কেন শোনা'ল?

—সেই কথাই বল্‌ছি। গত মঙ্গলবারেও বেশ শান্ত ছিল, রাত্রে বেশ ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ জেগে উঠ্‌ল। আমার হাত দু'খানি তার হাতের মুঠোয় নিয়ে বুকের উপর রেখে সহজ সরল ভাবে আমায় বল্লে

'সব সময় তুমি মুখখানি ভার ক'রে থাক কেন?' আমি একটু হাসলুম, হাস্‌তে চেষ্টা করলুম। সে আমার হাত দু'খানি নিয়ে খেলা করতে করতে বল্লে, 'তোমার ছেলে হ'ল না ব'লে—না?' আমি কোন কথা কইলুম না। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সারাটি রাত ঘুমলো না। পরদিন সকালবেলা উঠে গড় হ'য়ে আমায় প্রণাম করে' নিজে জল এনে আমার পা ধুইয়ে দিয়ে বল্লে 'আজ আমার এ সাধে বাদ সেধো না'—এই বলে' চুলের বেণী খুলে আমার পা দু'খানি মুছে দিলে। মনে পড়ল গুরুদেবই এ প্রথাটির প্রচলন করেছিলেন; তিনি বল্‌তেন 'ভক্তিমতী নারীর এই সেবাটুকু বড় মধুর।'

—তারপর···তারপর···

—তারপর উঠে আমায় পালঙ্কে বসিয়ে, সম্মুখে এসে আমার গলাটি জড়িয়ে ধরে' বল্লে 'একটি পুষ্যিপুত্র নিলে হয় না?'—মূর্থ আমি···মূঢ় আমি! তখন আমি না ব'লে থাকতে পারলুম না তোমার কথা। যাগযজ্ঞ আর গুরুদেবের কথা সম্পূর্ণ গোপন করে' বল্‌লুম 'তোমার ছেলে হয়েছিল হৈম···কিন্তু, সে হবার পরেই তোমার খুব অসুখ হয়, বাঁচবার কোন আশাই ছিল না; ছেলের অযত্ন হবে জেনে তা'কে তা'র মাসিমার হাতে সঁপে দিয়েছি, তোমার সোনার চাঁদ ছেলে সেইখানেই মানুষ হচ্ছে'। শুনে সে যেন নেচে উঠ্‌ল! আনন্দে বিস্ময়ে সে অপরূপ হয়ে উঠ্‌ল! আর তখনি জিদ্ ধর্‌ল তোমাকে তার কোলে এনে দিতে হবে। আমিও স্বীকার হলুম। তার পর থেকেই নিজের হাতে তোমার জন্য ঘর সাজিয়েছে, খাবার তৈরী করেছে, তোমাকে বিয়ে দিয়ে ঘর-আলো-করা বৌ আনবে বলে'

ঘটক ডেকে পাঠিয়েছে, —কি যে করেছে আর কি যে না করেছে সে বল্‌বার নয়। আমি তোমাকে আনবার পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে' সব কথা বল্‌লুম; তিনিও বল্‌লেন 'না, আর ভয় নেই। আপনি সচ্ছন্দে ছেলে নিয়ে আসুন।' কিন্তু…

—কিন্তু ?…

—কিন্তু পুরোহিতমহাশয় পঞ্জিকা দেখে বলে' পাঠালেন এ দু'দিন বড় খারাপ দিন, পুত্রমুখ দেখাবার পক্ষে বড়ই অশুভ। আমি সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু বিলম্ব দেখে সে আবার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সে একদণ্ডও অপেক্ষা করবে না। আবার সেই পূর্ব্বের মত ক্ষেপে উঠেছে, কখনো কাঁদ্‌ছে, কখনো হাসছে, যা'কে দেখছে তারই হাত পা জড়িয়ে ধরে' বল্‌ছে 'আমার ছেলে এনে দাও…এখনি না এনে দিলে আমি বিষ খাবো…'

—বাবা, আপনার পঞ্জিকা রেখে দিন, আমি তাঁর কাছে এই চল্‌লুম…

—হাঁ বাবা, যাবে বৈ কি, শুভ মুহূর্ত্ত এসেছে বোধহয়। র'সো, আমি ঘড়ি দেখচি…বাঃ, শুভ যোগের যে চার মিনিট পার-ই হয়ে গেছে দেখচি…যাও বাবা, এসো…

—আপনি…

—না বাবা, আমি ঠিক এ সময়টায় যেতে চাইনে…আমার কান্না পাচ্ছে…এসো বাবা, এসো…

রামচরণ, আরে রামচরণ! গেলি কোথা ?

—এই এসেছি, আজ্ঞে…

—যে বাবুটি এই ঘর থেকে এখনি বেরিয়ে গেল, দেখ্‌লি ?

—আজ্ঞে…

—ও তোদের ছোটকর্ত্তা, আমারি ছেলে। সে সব শুনিস্ এখন। পথে আসতে নদীর ধারে হাঁস চরতে দেখে বাবা আমার শিকারের জন্য মেতে উঠেছিল। আমার বন্দুকটা আনবার জন্য কেব্‌লাকে কখন্ বলেচি, এখনো তো সে এল না…

—আজ্ঞে, সে বন্দুক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমিও তো বন্দুকই খুঁজ্‌ছিলাম…

—এই যে কেব্‌লা…বন্দুক পেলি?

—আজ্ঞে, বন্দুক মা'র হাতে…

—সে কি!

—হাঁ কর্ত্তা…

[পাশের ঘরে গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্]

—ওকি! ওকি! তবে কি আত্মহত্যা কর্‌ল?

—না…না…না…হাঃ হাঃ হাঃ।…আত্মহত্যা করিনি…গুরুহত্যা…

—আমার ছেলে? আমার ছেলে?

—কে তোমার ছেলে? হাঃ হাঃ হাঃ!…তোমার আবার ছেলে… গুরুদেব, গুরুদেব…অবিকল গুরুদেব!…সেই চোখ—সেই মুখ… সেই স্বর…হাঃ হাঃ হাঃ!—

শ্রীমন্মথ রায়।

বিজয়া দশমী

ভাউলে যাত্রা।

——:o:——

বিজয়া দশমী আইল যেদিন,
লইয়া 'বিজয়া' ঘটি দুই তিন,
জগাই, বলাই, গউর বাউলে
চড়ায় নাবিয়া চড়িল ভাউলে ॥

তলে বিছাইয়া কাঁথা দুপুরু,
বাউলে করিল গাওনা সুরু ॥

গান।

আগে বল কোন্ রতনটি চাও,
তবে বাটোয়া খুলে করি-ঈ ভাও।
আগে বল কোন্ রতনটি চাও ॥ ধ্রু ॥

---

* বিজয়া দশমী বছরের মধ্যে একদিন মাত্র; সেদিন বঙ্গবাসীদের মধ্যে টাকাকড়ির লেন-দেন নিতান্তই বেসুরা এবং বেতালা; তাহার পরিবর্ত্তে কোলাকুলি, বন্ধুগণের মধ্যে প্রণয়সম্ভাষণ, পানমশলা বিতরণ, গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, বিনা পয়সায় পরস্পরের হিতসাধন, সুন্দর শোভা পায়। এইরূপ বিবেচনায় বাউলের গানে জ্ঞানে প্রেমে কোলাকুলি ঘটিয়ে, আর তাহার কিছু পরে ভাউলের মাঝিকে জোরসে বিনা পয়সায় পরোপকার করিয়ে নিয়ে কথঞ্চিৎ প্রকারে বিজয়ার দিনের মান বজায় রাখা হইল।

আছে এক অমূল্য হীর,
ভয়ে পিছোয় জহরীরা,
বলে বার বার এর খরিদার,
পাবে না হেথা কোথাও।

["বাস্‌রে !" বলে বলাই শিহরি,
ও জ্ঞান রতন ! হরি হরি হরি !]
আর আছে এক বাঁধন শিকলি,
ফণী শিরে মণি, চমকে বিজলি,
"সোনার এ ফণী লক্ষ্মী আপনি,
বলিবে—যাকে শুধাও।"
বল ওগো কোন্ রতনটি চাও ॥ ধ্রু ॥

[জগাই বলিল "প্রেম দড়ি এ
বলাইয়ের গলে দাও জড়িয়ে !"]

হাওয়া উঠিতেই উঠিল ঢেউ,
"হ্যালে যে নৌকা" বলিল কেউ,
বলাইয়ের কানে গেল তা' যেই,
বলিল সে, "নায়ে চড়িতে নেই !"

জগাই বলিল "তরা মা তারা।
ভয় নাই—নাও যাবে না মারা।"
হাসি বলে মাঝি, "দ্যাখ নি তো কেউ
বৈশাখী ঝড়ে মেঘনার ঢেউ !"

বাউলে গউর একতারা থুয়ে,
বোচ্‌কা বালিসে ভর দিয়ে শুয়ে,
"পার কর হরি" ধরিল ধুও,
পোষ নাহি মানে ঢেউ তবুও ॥

সাজিয়া ছিলিম টানি দুটান,
তবে বাউলিয়া লভে পরাণ,
জিউ খুলি গেল তৃতীয় টানে,
মাতি গেল পুন ভাবের গানে ॥

দ্বিতীয় গান।

গোলে মালে মিশায়ে আছে,
ও তার গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে ॥
শুনেছি বৈষ্ণবের করণ,
বালির সঙ্গে চিনির মিলন,
ও তা জানে দু' একজন।
ও তা মত্ত হস্তী টের পেল না
চেঁউটি* মরম জেনেছে।
গোলেমালে মিশায়ে আছে ॥ ধ্রু ॥

[কি বল্‌ছে ওই মত্ত হাতীটা,
শুক্‌নো ডাল ওর জিভে লাগে মিঠা,
খুদে পিঁপ্‌ড়ে যে বলাই চাঁদ,
বোঝে ভাল তাই চিনির স্বাদ ॥]

* চেঁউটি কি না খুদে পিঁপ্‌ড়ে।

দু' ঘটি 'বিজয়া' আনিয়া তরে,
বলাইকে বলে জগাই "হবে এ এ!"
বলাই বলিল—ভ্যালা মোর দাদা,
তুমি লও আধা, মোরে দাও আধা ॥

দু' স্যাঙাতে পিয়া দু' ঘটি ভাঙ,
ঢুলু ঢুলু আঁখে পেরল গাঙ।
সট্‌কিয়া পড়িল জগাই বেমালুম,
দেখিয়া মাঝির হল আক্কেল গুড়ুম্ ॥

বাউলে গউর বলিয়া "হরি"!
ঝুঁটি বাঁধি, আল্‌খাল্লা পরি,
পালাবে যেমন পথিক সাজি—
"কোথা যাও"! বলি রুখিল মাঝি।

বাউল বলিল "মোরে না ছুঁস্,
পারুণী দেবেন ওই মানুষ;
তুমি ভাই বলাই কর বিহিত,
লাখ টাকার আমি দিয়েছি গীত।"

এত্তেক বলিয়া চলিল হাঁটি,
বলাইকে মাঝি ধরিল আঁটি।
বলাই বলিল "আমার কাছে,
টাকাটুকি নাই, মশলা আছে ॥

গোটা গোটা গুয়া আছে দু'কুড়ি,
এলাচি লবঙ্গ আছে দু' ঝুড়ি।
জোয়ান মৌরি আছয়ে ঢের,
আছে সুগন্ধি কেয়া খয়ের ॥"

ঈষৎ হাসিয়া বলিল মাঝি—
"মিছা কেন করছ দমবাজি!
টাকা চারি পাঁচ ফেলিয়া ছাও";
বলাই বলিল "দিচ্ছি ন্যাও।"

একটিও কথা না বলি দোসরা,
ভাউলের পিঠে সাজায়ে পসরা,
মশলা গছায় বলাই বেনে,
মাঝি হয় রাজি হাইর মেনে ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সনেট।

——[:•:]——

ভেবেছিনু যবে মোর বিরহ-নিশায়
মুছে যাবে স্বপ্ন-রচা মূর্ত্তিখানি তব—
কেমনে ছায়াটী তার হৃদে আঁকি লব
শুষ্ক-স্মৃতি মিলনের স্তিমিত শিখায়!
বিস্মৃতি ঢাকিবে সবি কুহেলি উষায়—
মরণে জীবনখানি রচি' দিবে নব,
নহে ত পরশ-ভীত বহুদূরে রব,
সংসার-সীমানা পারে, অরণ্যের ছায়।

প্রেম তো সুদূরে আজ কারে যায় যাচি'—
তুমি নাই, প্রেম নাই—তবু বেঁচে আছি।

তবু বাজিতেছে মোর কণ্ঠে অভিনব
কত না সুরের খেলা; কত রূপরস
জুড়িয়া রয়েছে হিয়া; অজানা বিভব
আমারে রেখেছে করি' নবীন সরস।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

———

ভক্তির ভারে।

—:*:—

বন্ধু

বহুকালপরে এসেছি দুয়ারে পরম ভক্তবৎ,
ত্রিসন্ধ্যা জপি গায়ত্রী, আর নাকে কানে দিই খৎ।
ফোঁটা মালা শিখা, ত্রিপুণ্ড্ররেখা, মাদুলি ও রুদ্রাক্ষ,
তুলসীর কুল, কুশকাশমূল, এরা দিবে তার সাক্ষ্য ;
তোমার নিন্দা করিয়া যেদিন মুখে উঠে তাজা রক্ত,—
শপথ করিয়া সেদিন বন্ধু, হ'য়েছি তোমার ভক্ত।
সিঁদুরমাখানো পাথর দেখিলে তখনই নোয়াই ঘাড়,
পায়ে ধ'রে সাধি শীতলার 'গাধী', বিরূপাক্ষের ষাঁড়।
প্রাণপণে অবিরাম
জপি হনুমান, মুস্কিলাসান, শিব, শনি, কালী, রাম।

মিটায়েছ তার সাধ—
জলে বাস ক'রে যে মূঢ় করিল কুমীরের সাথে বাদ।
তোমার উপরে সিধে সত্যেরে গর্ব্বে যে দিল ঠাঁই,
ভিতরের যত চাপা পচা ক্ষত বাহিরে দেখাল ভাই।
সৃষ্টির এই ঝুনা-নারিকেল যে জনা দেখিল নাড়ি,
হাটের মাঝারে স্পর্দ্ধা করিয়া যে জন ভাঙিল হাঁড়ি,
তোমার বিধান অঙ্কুশ পরে হানি ঘন অঙ্কুশ,
মত্ত হস্তীসম সে চিত্তে করিয়াছে কাপুরুষ।

আজি দুর্ব্বল অক্ষম আমি, ভয় সংশয়যুত ;
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু ? হ'ল কি মনঃপূত ?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের পরে হানিছ রুদ্ররোষ,
ঘাড়ে ধ'রে মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ।

নব নব তব অত্যাচারের মানিনিক বে-আইন,
বাহির হইতে অন্তর তব ক'রেছ অন্তরীণ।
বাহিরের হাসি বাহিরের আলো চলে বিপরীত মুখে,
ভুলেও দেয়না সান্ত্বনাকণা থ্যাঁৎলানো এই বুকে।
নিবাইলে সব আলো,—
নির্জ্জন পুরী, অন্তর ভরি কল্লোলি আসে কালো।
শ্মশানের খাটে বাঁধা, কাটে চির-অনিদ্র আঁধা রাত,
আচম্‌কা পিঠে সুড়্‌সুড়ি দেয় মৃত্যুর হিম হাত !
মনে মনে যদি দৃঢ় ক'রে বাঁধি মনটারে যথাসাধ্য,
বেজে ওঠে ঘন ভরিয়া শ্রবণ, বক্ষে বলির বাদ্য।
আঁধারের স্রোতে ফেণার মতন থেকে থেকে আসে ভাসি,
বিদ্রূপভরা সুহৃদ্‌কণ্ঠে ও-পারের কালো হাসি !

তবু মাঝে মাঝে হাসি পায় তব হেরিয়া রসজ্ঞান,
'ঘুমিওপ্যাথি'র আবিষ্কর্ত্তা—অনিদ্রাম্রিয়মাণ !
চার হাত খাড়া মানুষে ভরিয়া সাড়ে তিন হাত ঘরে,
কৌতুক দেখ কেমনে নিয়ত মাথা ঠুকে ঠুকে মরে।

প্রেমমন্দিরে তাহারই বিপদ—যে জন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়াভাঙা যত কোলকুঁজো ঘাড়গুঁজোদেরই মজা।
নমি জুড়ি করপুট,
হে রসিক, তব চরম সৃষ্টি—ঘোড়া পিটাইয়া উট!

আমি তাই হ'তে চাই

তব নিদারুণ প্রেমিক,—বারেক নিষ্কৃতি যদি পাই।
সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণামে হইব অষ্টাবক্র,
বুকের দুগ্ধপিয়াসা মিটাবে—তোমার চরণ-তক্র।
ভক্ত হবার সকলরকম সাধিতেছি কসরৎ,
দোহাই বন্ধু! আঘাতের ফাঁকে দিও কিছু ফুরসৎ।
অসহ্য এই নিজ অন্তরে নিজের নির্ব্বাসন,
ঘুমের আশায় অসীম রাত্রি একাকী এ জাগরণ!
অসহ্য এই বিস্মৃতি-আশে নিয়ত স্মৃতির জ্বালা,—
বুকের উপর হারানো মুখের জপের মুণ্ডমালা!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

তরুণ পত্র।

——:০:——

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একখানি নবজাত মাসিকপত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এ পত্রের নাম তরুণ পত্র, ধাম ঢাকা। আমরা অবশ্য তরুণ পত্রমাত্রেরই পক্ষপাতী। কারণ ঐ নামের গুণেই আমরা আশা করি যে সে পত্র তরুণ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা আমাদের সব সময়ে পূর্ণ হয় না। এর জন্য দোষী প্রবীণদের করা যায় না। নিত্য দেখতে পাই তাঁরা আবার কেঁচে নবীন হবার জন্য কত মণি মন্ত্র ঔষধের শরণাপন্ন হচ্চেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, প্রবীণদের নবীন কলেবর ধারণ করবার লোভ যদি অনিবার্য্য না হত, তাহলে এদেশে কবিরাজী ও ইউনানীনামা চিকিৎসাশাস্ত্র বেঁচে থাকত না। যদি এ দুই শাস্ত্রের শাস্ত্রীদের সত্য সত্যই প্রকৃতির উল্টোটান টানবার বিদ্যে জানা থাক্‌ত, আর সে বিদ্যা তাঁরা খোলাহাতে দেশের লোকের উপর প্রয়োগ করতেন, তাহলে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াত একবার ভেবে দেখত! দেশের সব লোক হয়ে উঠত দেহে যুবক ও মনে বৃদ্ধ। কারণ মনের যৌবন ফিরে পাবার দিকে কোনও প্রবীণেরই লোভ নেই, যদিচ এই মানসিক জরা দূর করবার শত উপায় আছে। আমার অনেক সময় মনে হয় যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ তরুণের দল দেহে তরুণ মনে বৃদ্ধ, ভাষান্তরে বয়েসে যুবক জ্ঞানে বৃদ্ধ। জরা ও যৌবনের আসল পার্থক্য কর্ম্মশক্তির পার্থক্য—চিন্তাশক্তিও

কর্ম্মশক্তি। আর ঐ হচ্ছে সব চেয়ে প্রবল কর্ম্মশক্তি। আজ পৃথিবীর কর্ম্মজগৎ জুড়ে কল ঘুরছে, রেল ছুটছে, বিমান উড়ছে। জড় পদার্থকে এমন করে ঘোরাচ্ছে, ছোটাচ্ছে, ওড়াচ্ছে কোন্ শক্তি:— বাহুবল না মনোবল?—যে চিন্তার ধার ধারে না, সুধু সেই বলবে বাহুবল। জড়তা থেকে মুক্তিলাভ করবার শক্তি লাভ করব আমরা চিন্তার কাছ থেকে।

শুনে মহা সুখী হলুম যে, এই সত্য প্রচার করবার জন্য তরুণ পত্র বদ্ধপরিকর হয়েছে। তরুণ পত্রের উদ্দেশ্য কি?—এর উত্তরে তরুণের দল বলেছেন যে, "তরুণ পত্র চায় অন্নচিন্তার মধ্যে অন্য চিন্তাকে বড় করে তুলতে, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ ও চিন্তা করবার জন্য তরুণের বুকে একটা ক্ষুধা জন্মাতে, একটা প্রেরণা জাগাতে।" আশা করি এ সাধু সংকল্প তাঁরা কার্য্যে পরিণত করতে পারবেন। নিজের মনে চিন্তার আগুন জ্বালাবার মহা গুণ এই যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ধর্ম্মই হচ্ছে উড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়া, আর যার মনে তা' গিয়ে পড়ে, তার মনের প্রদীপ তখনই জ্বলে ওঠে।

আমাদের সমাজে চিন্তার আগুনে জল ঢেলে দেবার দেদার লোক আছে। তাঁদের ভয় দেশে ও আগুন একবার জ্বলে উঠলে তাঁদের ভদ্রাসন সব জ্বলে যাবে। এ ভয়কে ভয় করলে মনের দুয়োরকে খুলেই আবার বন্ধ করতে হয়। যখন শুনব যে বাঙলার তরুণের দল সমস্বরে বলছেন 'খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কবাট'—তখনই বুঝব আমরা স্বয়ংমুক্ত হবার জন্য যথার্থ প্রস্তুত হয়েছি।

তরুণ পত্র পড়ে' আমি সুধু সুখী হই নি, সেই সঙ্গে বিস্মিতও হয়েছি। যেহেতু এ পত্র হচ্ছে বাঙলার মুস্‌লিম তরুণের পত্র।

আমরা হিন্দুই হই মুসলমানই হই, সবাই অতীতের পাঁকে পড়ে' আছি। তবে আমরা হিন্দুরা আচারের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেও, আমাদের মাথাটা জেগে আছে। ফলে আমরা আচারে জড় হলেও বিচারে দড়। আমাদের মনোভাবের উপর সমাজ হস্তক্ষেপ করে না, যদি না সে মনোভাব অনুসারে কাজ করতে চাই। এই ধরুন না, 'অস্পৃশ্যতা দূর করো' বলে গগনভেদী চীৎকার করলে আমরা স্বজাতির কাছ থেকে কত না বাহবা পাই; কিন্তু অস্পৃশ্যদের যদি অন্নস্পর্শ করি, তখনই আমরা স্বজাতির সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হই। মুসলমান-সমাজে আচারের এত অত্যাচার নেই। কিন্তু আমার ধারণা যে সে সমাজ বিচারের পক্ষপাতী নয়, যদি না সে বিচার অতীতের চৌহদ্দির ভিতর কসরৎ করে। চিন্তাশক্তিকে বাড়াবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে বিচার। সুতরাং তরুণ পত্রের এই অধ্যবসায় দেখে আশায় আমার বুক ভরে' উঠেছে। হিন্দুমুসলমানের মৈত্রীর সম্বন্ধে পলিটি-সিয়ানরা অনেক ভাল ভাল উপমা দিয়েছেন, কিন্তু তা'তে বড় ফল ফলে নি। "হিন্দু ও মুসলমান, ভারতমাতার দুটি চোখ"—এ ত একটা classical উপমা। এ উপমার ফল কি হয়েছে? অনেকের ধারণা হয়েছে যে, এর এক চোখ কানা করলে আর একটি চোখের তেজ বাড়বে; আর এমন পণ্ডিত দেশে ঢের আছে যারা চোখের মাথা খেয়ে এ কথা' বিশ্বাসও করে। কিন্তু এ কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে না যে, এর কোনটিরও দৃষ্টিশক্তি আছে কি না। এ দুটি চোখ যদি গেলাসের চোখ হয়, অর্থাৎ সেই জাতীয় চোখ যার উপর সব জিনিষই ভাসে, আর যার ভিতর কোন জিনিষই ডোবে না? মনের সঙ্গে যে-নয়নের সন্ধিবিচ্ছেদ হয়েছে, সে চোখ রক্ত

মাংসের হলেও কাঁচের। তার সঙ্গে আবার মনের যোগসাধন করতে পারলে তবেই আবার দৃষ্টি লাভ করবে। আর উভয় চক্ষুর তখন আবার সমদৃষ্টি ও একদৃষ্টি হবে।

মানুষের চোখ ফোটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে চিন্তারাজ্যে নিয়ে যাওয়া। সে রাজ্যে জাতিভেদ নেই। বাঙলার তরুণের দল যে হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিচারে এই রাজ্যে প্রবেশ করতে উন্মুখ হয়েছেন, এর চাইতে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে?

তরুণ পত্র যদি নতুন করে ভাবতে পারে, তাহলে সে ভাব সে কথায় বলতে পারবে। তার সহজ সরল ভাষা পড়ে' আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছি। এই ভাষাই পরিচয় দেয় যে মুসলমান হিন্দুর কত কাছে এগিয়ে এসেছে—আর ঢাকা, কলকাতার। সবুজ পত্র তরুণ পত্রকে তাই ডেকে বলছে—"ভাই, হাত মিলানা!"

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পূজোর ছবি।

—:•:—

পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল যে, বাঙলার মাসিক পত্রের পূজার সংখ্যার প্রধান সম্বল হচ্ছে গল্প। আর এই বিশ্বাসের বলেই আমি কিছুদিন পূর্ব্বে আত্মশক্তিতে বাংলো লেখকদের পক্ষ থেকে গল্প সাহিত্য বয়কট করবার প্রস্তাব করি।

লোকে বলে সাহিত্যের দুটি উদ্দেশ্য আছে। এক শিক্ষা দেওয়া, আর এক আনন্দ দেওয়া। আনন্দ দান করার চাইতে শিক্ষা দান করা যে ঢের উঁচুদরের ব্যবসা, তার প্রমাণ সমাজে গুরুমশায়ের আসন মোসাহেবের আসনের তুলনায় বহু উচ্চে। এখন দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, দেশের লোককে শিক্ষা দেবার ভারটা পড়েছে ইংরাজী লেখকদের হাতে, আর আনন্দ দেবার ভারটা আমাদের মত বাঙলা লেখকদের হাতে। ফলে ইংরাজি লেখকদের তুলনায় আমরা অতি হেয় হয়ে পড়েছি; যদিচ বাঙলা লেখকমাত্রেই লেখক,—অপর পক্ষে ইংরাজী লেখকদের মধ্যে বর্ত্তমানে এক মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর কোনও লেখক নেই। অবশ্য বাঙালীর ভিতর অদ্বিতীয় ইংরাজী লেখক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ; কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করেছেন।

বাঙ্গালী ইংরাজী-লেখকদের অবশ্য কেউ ইংরাজী লেখা থেকে নিরস্ত করতে পারবেন না, যেমন কেউ মিশনরিদের বঙ্গভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না; যেহেতু এ উভয় দলই

আমাদের হিতের জন্য লেখনী ধারণ করেছেন, উভয়েই মনে ঠিক দিয়ে বসে আছেন যে তাঁরা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা। আর সবাই জানে পরোপকারের প্রবৃত্তি দমন করবার জন্য সভ্যসমাজে কোনও আইন নেই।

মনে মনে এই সব বিচার করে' আমি এই প্রস্তাব করি যে, "এস আমরা আনন্দ দান না করে শিক্ষা দান করতে আরম্ভ করি অর্থাৎ আর্টিকেল লিখি, তাহলেই ইংরাজী লেখকরা ইংরাজীতে গল্প ও কবিতা লিখতে বাধ্য হবেন, এবং ইংরাজী ভাষায় এমন মধুচক্র নির্ম্মাণ করবেন, "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"। অবশ্য তা হবে বিলেতি সুধা।

(২)

পূজার বাজারের সেরা মাল যে গল্প, এ ভুল সম্প্রতি আমার ভেঙ্গেছে। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পূজার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গল্প নয়—ছবি। ছবি—তা সে যত বড়ই হোক না কেন—এক নজরেই দেখা যায়; আর গল্প—তা সে যতই ছোট হোক্ না কেন—এক মিনিটে পড়া যায় না। তারপর গল্পের ভিতর থাকে বক্তৃতা, কিন্তু ছবির ভিতর আছে সুধু ব্যক্তৃতা। এই দুটি কারণেই কথার চাইতে ছবির রস ঢের বেশি অনায়াসলভ্য, অতএব লোভনীয়। আনন্দের কথা ছেড়ে দিলেও, ছবির শিক্ষাও ঢের বেশি মর্ম্মস্পর্শী। কারণ কথা হচ্ছে কর্ণগোচর, আর রূপ নেত্রগোচর। ইন্দ্রিয় হিসেবে নেত্র যে কর্ণের চাইতে শ্রেষ্ঠ, এ ত সর্ব্ববাদীসম্মত। লোকমত উপেক্ষা করলেও, দার্শনিকদের মতেও প্রত্যক্ষ করার চাইতে দর্শনের আর বড়

কথা নেই। ঐ হচ্ছে সাধনার চরম ফল। আর সাধনা মানে যে অশিক্ষা, এমন কথা অমরকোষে নেই।

বাঙালী যে কেবলমাত্র কলম না পিষে তুলিরও চর্চ্চা করছে, এ অতি সুখের কথা। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমরা শ্রুতির যুগ কাটিয়ে দর্শনের যুগে এসে পৌঁচেছি।

এই সব পূজোর ছবির বিচার করতে আমি অপারগ। আলেখ্য ব্যাখানে কোনরূপ শিক্ষিত পটুত্ব আমার নেই। আর্ট ত আর ইকনমিক্স্ অথবা পলিটিক্স্ নয় যে, অশিক্ষিত পটুত্বর উপর নির্ভর করে' এ বিদ্যায় বাচাল হওয়া যায়। কোন্ ছবির কোন্ রেখার গতি মুক্তচ্ছন্দ হতে গিয়ে ছন্দমুক্ত হয়েছে, শিল্পীর হাত কোথায় রঙের বেপর্দ্দায় পড়েছে, সে বিচার আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। আমার চোখে ধরা পড়ে সুধু বর্ণাশুদ্ধি। কিন্তু ছবিতে বানান ভুলের বেশি অবসর নেই। এ ক্ষেত্রে যত্বণত্বের বালাই নেই; যা' গোল হয় সে সুধু হ্রস্বদীর্ঘ নিয়ে।

(৩)

আর্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে আনন্দ দান করা। বাঙলার নব আর্টিষ্টরা যে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। যদি তাঁরা সমাজের নয়নমন পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম না হতেন ত পূজোর কাগজ বাজারে এত কাট্‌ত না; আর কাগজ-ওয়ালামাত্রেই জানে যে কাগজ চলে ছবির টানে।

অপরপক্ষে যাঁরা আর্টকে "মিষ্টান্নমিতরে" বলে' অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করেন, অর্থাৎ যাঁরা জ্ঞানমার্গের পথিক, তাঁদের কাছে

নিবেদন করি, এই নব-অভিব্যক্ত বঙ্গ-আর্ট থেকে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারি। যে-সকল সামাজিক ও ইকনমিক্ সমস্যা নিয়ে দেশের মহাপুরুষরা মাথা ঘামাচ্ছেন এবং তাদের মীমাংসার জন্য নানারূপ আন্দোলন ও আস্ফালন করছেন, সে সব বিষয়ে মুক্তি কোন্ পথে, তার প্রদর্শক হচ্ছেন এই সব আর্টিস্ট। কাল যা' হবে, আজ তার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায় আর্টিষ্টদের তুলির মারফৎ। সুতরাং এই সব ছবি দেখে আমরা কি জ্ঞান লাভ করি, তা নিম্নে বিবৃত করছি।

আমাদের এ যুগের একটা প্রকাণ্ড সামাজিক কর্ত্তব্য হচ্ছে female emancipation। এ বিষয়ে লেখায় ও বক্তৃতায় বহু গবেষণা, বহু আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু আমরা হাজার বকাবকির ফলেও অস্পৃশ্যতার মত পরদা দূর করতে পারিনি। পতিত জাতি যেমন অস্পৃশ্য ছিল তেমনি অস্পৃশ্য রয়ে গেছে, আর অসূর্য্যম্পশ্যারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। এ দুই সমস্যা যে আমাদের সব চাইতে বড় সমস্যা, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা চাই ডিমোক্রাসী। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার সাড়ে সাত আনাকে অস্পৃশ্য ও আট আনাকে অদৃশ্য করে রাখলে বাকী দু' পয়সা দিয়ে কংগ্রেস হতে পারে, কাউন্সিল হতে পারে; কিন্তু ও দু' পয়সায় ডিমোক্রাসী হয় না। এর হিসেব বুঝতে গণিতবিদ্যায় পারদর্শী হবার প্রয়োজন নেই, যোগ বিয়োগ জানলেই যথেষ্ট। এ অবস্থায় আমরা উভয়সঙ্কটের মীমাংসা করেছি এ দুই জাতের নূতন নামকরণ করে'। আমরা অস্পৃশ্যদের বলি দরিদ্র-নারায়ণ, আর অদৃশ্যদের বলি দেবী। এতে আমরা মনে করি যে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিই। কিন্তু দেবতাদের extern

আর দেবীদের intern করে' যে মনোভাবের পরিচয় দিই, তার নাম ধর্ম্মবুদ্ধি নয়—অতিবুদ্ধি।

(৪)

এখন দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলার আর্টিষ্টরা এ দু'য়ের মধ্যে একটি সমস্যার সরাসরি মীমাংসা তুলির দু' আঁচড়ে করে দিয়েছেন। ছবির রাজ্যে female emancipation একদম হয়ে গেছে। ও রাজ্যে পরদা বিলকুল নেই। আর্টের একটি মহা গুণ এই যে, আর্ট কোন বিষয়েই তর্ক করে না, সব বিষয়ই লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আর্টের আদালতে রায় নেই—আছে শুধু ফয়সালা। আর সে ফয়সালা হয়েছে নারীদের Civil Jail থেকে মুক্তি দেবার পক্ষে।

এ মুক্তি আর্টিষ্টরা এত চট্‌পট্ দিয়েছেন যে, অবরোধ-বাসিনীরা যিনি যেমন অবস্থায় ছিলেন, তিনি ঠিক তেমনি অবস্থায় লোক চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। কেউ আছেন দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে, কেউ বা শুয়ে। কেউ বা করছেন পূজো, কেউ বা গাচ্ছেন ভজন, কেউ বা তুলছেন ফুল, দেহলতা ও বাহুলতা আনমিত করে'; কেউ বা পুঁছ্‌ছেন চুল, দেহযষ্টি উত্তোলন ও বাহুযুগল ঊর্দ্ধে প্রসারণ করে'; কেউ বা পড়ছেন বই বুক দিয়ে, কেউ বা পোয়াচ্ছেন রোদ পিঠ দিয়ে। এঁদের প্রায় সকলেরই কুন্তল আকুল, অঞ্চল চঞ্চল।

মুক্তির ডাক সহসা অন্তঃপুরে এসে পড়াতে এঁরা নেপথ্যবিধানের অবসর পান নি। তাই আর্টিষ্টদের কৃপায় আমরা বঙ্গ-রমণীর রূপ ও দেহ সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ করেছি। অজ্ঞতার অন্ধকারই হচ্ছে

কল্পনার লীলাভূমি, সে ক্ষেত্রে জ্ঞানের আলো পড়লেই আমাদের সে দেশ থেকে কল্পনাকল্পিত ভয় ও ভরসা সব হুড়মুড় করে' পালিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বাঙলার চিত্রকরদের তুলিকা হয়েছে আমাদের চোখের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা।

(৫)

এই নারীরাজ্যের রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত,—আমি কবি নই। আর যদিও হতুম, তাহলেও রমণীর দেহের উপর আমি হস্তক্ষেপ করতুম না। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা এ যুগের কাব্যে চলে না, চলে সুধু anthropology নামক বিজ্ঞানে। কারণ চোখের আর যতই গুণ থাক্, চোখের কম্পাস্ দিয়ে কোনও পদার্থের নির্ভুল মাপ-জোখ করা যায় না। এ কথা সেকালের কবিরাও জানতেন, তাই তাঁরা উপমার সাহায্য নিয়ে বর্ণনা করতেন। একালের কবিরা কিন্তু পটল, বেল, নারাঙ্গী, দাড়িম, তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি ফলতরকারি উপমার খাতিরেও স্ত্রীদেহে অর্পণ করতে সাহসী হন না। ও সব অতি বাজারে, অতি সস্তা। নাসাবংশ করভোরু প্রভৃতি সনাতন উপমা এ-কালের কবিতায় কি পোরা যায়? মন্দ কবিরা যদি এ কাজ করতে প্রবৃত্ত হন, তাহলে স্ত্রীসমাজ উপমার বিরুদ্ধে আইন পাস করিয়ে নেবেন। মনে থাকে যেন, মেয়েরা ভোট পেয়েছে। তাই একালের কবিরা উপমা খোঁজেন সঙ্গীতরাজ্যে, উদ্ভিদ ও পশুজগতে নয়। আমার অনেক কবিবন্ধু স্ত্রীজাতির চক্ষে দেখেন সুধু মীড় আর বক্ষে মূর্চ্ছনা। আমি তাঁর পদানুসরণ করে বলি যে, এই চিত্রসুন্দরীরা সব বাঙলা

"পটমঞ্জরী"। এখানে একটি কথা না বলে থাকতে পারছিনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

তোমরা সবাই ভাল,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো।

এ কথা নিছক কবি-কল্পনা, এর ভিতর একবিন্দুও বস্তুতন্ত্রতা নেই। আর্টিষ্টরা যে সব মূর্ত্তি আমাদের দেখিয়েছেন, তার একটিও রূপো দিয়ে কি লোহা দিয়ে গড়া নয়, সবই হয় তামা নয় পিতল দিয়ে তৈরী। সবারই অঙ্গে ফ্রেঞ্চ পালিস, আর সে পালিসে কোথায়ও বা পিউড়ির ভাগ বেশি, কোথায়ও বা খুনখারাপির। বলা বাহুল্য যে ফ্রেঞ্চ পালিসের মূল ও স্থূল উপাদান হচ্ছে গালা, সুতরাং আর্টিষ্টদের হাত থেকে যে সব মূর্ত্তি বেরিয়েছে, তাদের গালার পুতুলও বলা যেতে পারে।

(৬)

যাক ও সব বাজে কথা। আমরা একালে কেউ সৌন্দর্য্য চাই নে, চাই সুধু স্বাস্থ্য; এ সত্য আমরা ধরে' ফেলেছি যে, সৌন্দর্য্য হচ্ছে স্বাস্থ্যের বিরোধী। এর প্রমাণ সাহিত্য থেকেও দেওয়া যায়। যার বাণী যত সুন্দর, তার বাণী তত অস্বাস্থ্যকর—যথা কবির; আর যার বাণী যত কদাকার, তার বাণী তত স্বাস্থ্যকর—যথা বক্তার। খবরের কাগজের আর পলিটিকাল বক্তার সকল কথাই আমরা বিনা আপত্তিতে গলাধঃকরণ করি, কারণ আমরা জানি যে, ওষুধের ধর্ম্মই হচ্ছে একাধারে কটু ও তীব্র হওয়া। কে না জানে যে, বাঙলার মারাত্মক সমস্যা হয়েছে sanitation, ভাষান্তরে ম্যালেরিয়া দমন ?

এই আর্টিষ্টদের প্রসাদে সানন্দে প্রত্যক্ষ করলুম যে, বাঙলার অন্তঃপুরে ম্যালেরিয়া নেই। এই চিত্রার্পিত রমণীদের একজনেরও পেটে পিলে যকৃত নেই, গায়ে কালাজ্বর নেই; এখানে ওখানে অবশ্য Scarlet fever-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—কিন্তু সে দেহে নয়, অধরে। বছর পাঁচ ছয় আগে বাঙালী আর্টিষ্টরা যে সব রমণীমূর্ত্তি প্রদর্শন করতেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন ক্ষীণ ও পাণ্ডু, কারণ তাঁরা ছিলেন সব সংস্কৃত পটমঞ্জরী,—যথা শকুন্তলা, দময়ন্তী, উর্ব্বশী, মেনকা, ইত্যাদি। Aristocratic মহিলারা সকল যুগে সকল দেশেই সুকুমার হয়ে থাকে। কিন্তু হালের প্রদর্শিত বঙ্গরমণীদের সকলেরই democratic স্বাস্থ্য আছে। এ দেশে আমরা পুরুষরাই হচ্ছি সব জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন ভুগ্ন। এর কারণ আমরা ইংরেজী পড়েছি, তাঁরা খুব সম্ভবত বাঙলাও পড়েন নি। আর্টিষ্টরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের আবিষ্কৃত বঙ্গরমণীদের তুলনায় আমরা B. A. M. A.-র দল সব অবলা। ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণনার প্রসঙ্গে বলেছেন যে—

"মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া—
এখনো কাঁপিয়া ওঠে থাকিয়া থাকিয়া"।

এখন বোঝা যাচ্ছে বাঙলা দেশে এত ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় কেন ? হায়! এই সব সুস্থ সবল নধর ও বেকার বীর-রমণীর দল একজোট হয়ে একমনে যদি চরকা কাটত, তাহলে ভারতবর্ষে আর বস্ত্র-সমস্যা থাকত না।

(৭)

আর্টিষ্টকল্পিত এই বঙ্গরমণীর দল এই গুরুতর বস্ত্র-সমস্যা সম্বন্ধে

অবশ্য মোটেই উদাসীন নন্। এ সমস্যার তাঁরা সমাধান করতে ব্রতী হয়েছেন অন্য উপায়ে—বসনের বস্তা বাড়িয়ে নয়, তার পরিমাণ কমিয়ে; ইকনমিক্‌সের ভাষায় বলতে হলে production বাড়িয়ে নয়, consumption কমিয়ে। এই অবলাজনোচিত পদ্ধতিই হচ্ছে এ দেশের সনাতন পদ্ধতি। East and West-এর বাণীর মূল পার্থক্য কোথায়?—West-এর মতে production বাড়ানোতেই পরম পুরুষার্থ, আর East-এর মতে consumption কমানোতেই পরম পুরুষার্থ। যাক্, এ সব দর্শন বিজ্ঞানের বড় বড় কথা। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, বাঙলার আর্টের রাজ্যে কোন রমণী খদ্দর-মণ্ডিতা নন, সকলের পরণেই অনিলাম্বরী—ভাষায় যাকে বলে হাওয়া-কাপড়।

ভাল কথা, কাঁচের কি সূতা হয় না? আর সে সূতোয় কি শাড়ী বোনা যায় না? বস্তুগত্যা না হোক, আর্টের রাজ্যে তা হওয়া উচিত, কারণ ও রাজ্যে মোটা কাপড় চলে না।

তারপর বসনের আট আনা অংশ যে ফাল্‌তো, এ সত্যটা চিত্র রাজ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই চিত্র-সুন্দরীদের অঙ্গে অঞ্চল আর উত্তরীয় নেই—একদম উপবীত হয়ে উঠেছে। আর্টিষ্টরা আদেশ করেছেন go back to nature, আর তাঁদের আদেশ অনুসারে সুশীলার দল simple life অবলম্বন করেছেন। Simple life-এর অর্থ অবশ্য বাহুল্যবর্জ্জন। অতীতে আমাদের যুবকের দল এই বাহুল্য বর্জ্জনের উদ্দেশে চাদরনিবারণী সভার সৃষ্টি করেন—এখন দেখা যাচ্ছে চিত্র-যুবতীর দল সব অঞ্চলনিবারণী সভার মেম্বর।

(৮)

এ স্থলে আর্টিষ্টদের স্মরণ করিয়ে দিই, তাঁদের সুমুখে এক বিপদ আছে। তাঁরা নিরাবরণ প্রকৃতির দিকে আর একটু অগ্রসর হলেই নীতির সেপাইরা রুলহস্তে তাঁদের পথরোধ করবে। এ বিভীষিকা দেখে পশ্চাৎপদ হলে, তাঁরা নায়িকাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন না।

সুরুচি সুনীতির বিবাদ, লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদের মতই সনাতন। এ বিবাদ ভঞ্জন করে' উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপন কেউ করতে পারবে না—এমন কি League of Nations-ও নয়।

মনে পড়ছে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের পর্ব্বতবাসিনী "জুমিয়া" রমণীদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "অর্দ্ধঅনাবৃত ওই চারু বক্ষঃস্থল"। ঐ শ্লোকার্দ্ধ নিয়ে সেকালের সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষকেরা এত টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি করেছিলেন যে, আমাদের মত লাষ্ট্ ক্লাসের ছেলেদেরও স্বাস্থ্যরক্ষকদের প্রসাদে ও ছত্রটি মুখস্থ হয়ে যায় এবং আজও তা আমাদের সমান মুখস্থ আছে—যদিচ নবীনচন্দ্রের কবিতার আর এক বর্ণও স্মরণ নেই। লেখনীর মুখের সেই আধো আধো কথা, তুলিকার মুখ দিয়ে এখন স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং আর্ট ও নীতির ভিতর আবার একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে।

এ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ দেবার যোগ্যতা আমার নেই। সাহিত্যে আমি নীতিবীরও নই, আর্টিস্টও নই। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ভিতর মধ্যস্থতা করবারও আমার সাহস নেই। কারণ জানি যে, ওরূপ মধ্যস্থতা করতে গেলে, উভয় পক্ষের বাক্যবাণ একসঙ্গে আমার বুকে পিঠে পড়বে। তাতেও হয়ত রাজী হতুম, যদি জানতুম তাতে কোনও ফল আছে।

সুনীতি সুরুচির বিবাদ, লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদের মত আবহমানকাল চলে আস্‌ছে আর যাবচ্চন্দ্রদিবাকর চল্‌বে। ও বস্তু ঠাণ্ডা হবে স্রধু প্রলয়পয়োধি জলে। এ যুদ্ধে অদ্যাবধি কোনপক্ষই পুরো জয়লাভ করে নি। কোথাও বা দিনকয়েকের জন্য জয়লাভ করেছে নীতি, কোথায়ও বা আবার আর্ট।

তুলি যে মাকু নয়, এ জ্ঞান যখন আর্টিষ্টদের হয়েছে, তখন আমি তাঁদের বলি—forward!

বীরবল।

গড্ডলিকা।

——[:০:]——

ইংরাজী ভাষায় passes in the crowd বলে' একটা বচন প্রচলিত আছে, এর অর্থ "ভিড়ের ভিতর চলে যায়।" আমরা অধিকাংশ লোকই ভিড়ে মিশে যাই। অনেকের নিজের এমন কোন চেহারা নেই, যা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ভিড়ের ভিতরেও এমন লোক কখনো কখনো দেখা যায়, যে আমাদের চোখে পড়ে, আর যাকে বার বার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে যায়। যার বেশভূষা অসাধারণ কিম্বা অদ্ভুত, সে অবশ্য পাঁচজনের চোখ এড়িয়ে যায় না—আমি সে লোকের কথা বলছিনে। আমি বলছি সেই লোকের কথা, যার বেশভূষা চালচলন হাবভাব সবই আর পাঁচজনের মত, অথচ সে যে পাঁচজনের একজন নয়, তা এক নজরেই ধরা যায়।

এ যুগে মানুষের মত বইয়ের ভিড়ও বেজায় বেড়ে গিয়েছে। ভগবান আমাদের প্রত্যেককেই রসনা দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন সেই ভগবদ্দত্ত রসনা চালনা করবার ভগবদ্দত্ত অধিকার। লেখনী হচ্ছে রসনার প্রতিনিধি। তাই ছাপার কলের সঙ্গে টকর দিয়ে আমরা লেখনী চালাচ্ছি। ফলে বইয়ের এত বেজায় ভিড় হয়েছে। এর ভিতর অধিকাংশ বই সম্বন্ধে বলা যায় যে, they pass in the crowd। কিন্তু এই বইয়ের ভিড়ের মধ্য থেকেই মাঝে মাঝে দু' একখানি এমন বই আমাদের চোখে পড়ে, যাকে আমরা দেখবামাত্র a book বলে' চিনতে পারি। বলা বাহুল্য বাদবাকী বেশির ভাগ exercise book।

এইরকম একখানি বাঙলা বই সম্প্রতি আমার চোখে পড়েছে। বইখানির নাম 'গড্ডলিকা', আর তার রচয়িতার নাম 'পরশুরাম'। যে বস্তু বিশেষ করে' আমাদের চোখে পড়ে, আর পাঁচজনের দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। অবশ্য "বইখানি পড়ে' দেখ"—এই কথা বলাই যথেষ্ট। এ বই রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে, আর তিনি আমাকে সুধু ঐ ক'টি কথাই বলেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বইটি পড়ে' আমার কি মনে হয়, সে কথা লিখতে আদেশ করেছিলেন। তাই এ বই পড়ে' আমার কি মনে হয়েছে, সেই কথা সবুজপত্রের মারফৎ পাঠকসমাজের কাছে নিবেদন করছি। এ বইয়ের প্রধান গুণ এই যে, এখানি মনের আরামে পড়া যায়। আজকাল আমরা লেখকদের হাতে দিবারাত্র ধাক্কাধুক্কি খেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছি। আমরা পতিত জাত, তাই আমাদের ঠেলে তোলবার জন্য আমাদের গায়ে সকলেই হাত লাগান। আমরা দুর্ব্বল, আমরা রুগ্ন, তাই লেখকের দল আমাদের চিকিৎসা করবার জন্য সদাই ব্যস্ত। আর 'পরশুরামে'র ভাষায় বলতে হলে, তাঁরা আমাদের মাথায় "রোগন্ বব্বর" প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত। ও ওষুধ কি মহা বস্তু দিয়ে তৈরি, তা' 'গড্ডলিকা'র ভিতর প্রবেশ করলেই জানতে পাবেন। কিন্তু 'পরশুরাম' আমাদের চোখে পরিয়ে দেন নিরীহ "সুর্ম্মা সুর্খ্।" এতে আমাদের যে সুধু "আঁখ ঠাণ্ডা" হয় তাই নয়, আমাদের চোখ ফোটেও, আর তার প্রসাদে আমরা দেখতে পাই নানারকম রঙীন ছবি। আর আমাদের এই সব রকমারি ছবি দেখানই 'পরশুরামে'র উদ্দেশ্য।

'গড্ডলিকা' আসলে একখানি ছবির বই। এর ভিতর একটিও

সুন্দরী নেই, তবুও এ দৃশ্য আমাদের নয়নের উৎসব। সুন্দরী যে নেই তার কারণ, 'গড্ডলিকা' Art Exhibition নয়—সিনেমা। 'গড্ডলিকা'র ভিতর যাদের সাক্ষাৎ পাই, তারা সব আমাদের চেনা লোক। চেনা লোক বলছি এই জন্য যে, যাকেই দেখি তাকেই "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।" তার কারণ এই সব লোককে আমরা আইন-আদালতে, ডাক্তারখানায়, সেয়ারের বাজারে, পথে ঘাটে নিত্য দেখতে পাই। সেই চেহারা, সেই বেশ, সেই ভঙ্গী। এঁরা অবশ্য কেউ সত্য সুন্দর শিব প্রভৃতি বড় বড় জিনিষের ধার ধারেন না, তবুও এঁদের সাক্ষাৎ লাভ করে' আমাদের মেজাজ খুস্ হয়।

'পরশুরামে'র ছবি আঁকবার হাত অতি পরিষ্কার। তিনি দুটি চারটি টানে এক একটি লোককে চোখের সুমুখে খাড়া করে' দেন। তাঁর ছবিতে রেখা ও বর্ণের বাহুল্য নেই। তার কারণ তাঁর হাতের প্রতি রেখাটি পরিস্ফুট, প্রতি বর্ণটি যথোচিত। এই সেহাই-কলমের কাজ কিসে উজ্জ্বল হয়েছে জানেন?—হাসির আলোকে। গুণীর হাত ছাড়া আর কারও হাত থেকে এমন হাল্‌কা টান বেরয় না। 'গড্ডলিকা'কে একখানি Sketch-book বলা যেতে পারে—কিন্তু Sketch-গুলি সম্পূর্ণ সাকার।

'পরশুরাম' পাঁচজনের যে সুধু দেহের ছবি এঁকেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি তাদের মনের ছবিও এঁকেছেন—নিজের কথা দিয়ে নয়, প্রত্যেকের নিজের মুখের কথা দিয়ে। তার প্রতি ছবিটিই কথা কয়। আর তারা হাঁ করবামাত্র তাদের বুকের ও পেটের ভিতরকার চেহারা দেখা যায়। 'গড্ডলিকা'র ছবি হচ্ছে সব ইংরাজিতে যাকে বলে living pictures। এ চেহারাও সুন্দর নয়, পাঁচজনের যেমন হয়ে

থাকে তেমনি, তবে ঠিক ফোটোগ্রাফ নয়। গণ্ডেরীরাম বাটপাড়িয়া, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, নেপাল ডাক্তার, এঁরা সবাই হচ্ছেন এক একটি type; অথচ 'পরশুরামে'র হাতের গুণে মনে হয় এর প্রত্যেকেই আমাদের চেনা লোক। যেখানে ব্যক্তিকে type বলে' মনে হয়, আর typ -কে ব্যক্তি বলে', সেইখানেই ত আমরা আসল গুণীর হাত দেখতে পাই। গড্ডলিকার 'ভুশণ্ডীর মাঠের' তুলনা নেই। এ ছবিটি আগাগোড়া কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য রকম r li tic! আমি ভূতকে বেজায় ভয় করি, কিন্তু ভুশণ্ডীর মাঠের যক্ষ নাদু মল্লিকের সাক্ষাৎ পেলে তা'কে very pleased to meet you sir না বলে' থাকতে পারতুম না। হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট জর্জ্জটি সাহেব নাদুকে কেন যে এত ভালবাসতেন, তা আমি নিজের হৃদয় দিয়েই বেশ বুঝতে পারছি।

যিনি 'পরশুরামে'র লেখনীর সঙ্গে তুলির সঙ্গত করেছেন, সেই যতীন্দ্র কুমার সেনের হস্তকৌশল দেখে সহজেই মুখ থেকে এই ক'টি কথা বেরয়—"বাহবা সঙ্গতী! জিতা রহ, তুহারী কাম!"

'পরশুরামে'র আর একটি মহাকীর্ত্তি এই যে, তিনি বাঙলা সাহিত্যের একটি লুপ্তধারার পুনরুদ্ধার করেছেন। গড্ডলিকা "আলালের ঘরের দুলাল" ও "হুতুম পেঁচার নক্সা"র কুলোজ্জ্বলকারী বংশধর। এ কথা যে সত্য, তার পরিচয় আমি বারান্তরে দেব। আজ 'গড্ডলিকা'র কাছ থেকে হাসিমুখে 'পুনদর্শনায়' বলে' বিদায় নিই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নবম বর্ষ, পৌষ, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সমসাময়িক সাহিত্য।

——[:০:]——

আয়র্লণ্ডের কবি ঈট্‌স্ (Yeats) যখন তাঁহার দেশে নূতন একটা সাহিত্যসৃষ্টির গোড়াপত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন যে প্রতিবন্ধকটি সকলের আগে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং যাহার সহিত তাঁহাকে বরাবর যুদ্ধ করিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহা এই—ব্যবহারিক সংস্কারপ্রয়াসী সাহিত্যিক মন। আয়র্লণ্ডে তখন অন্যান্য দেশভক্তের মত সাহিত্যসেবীরও চিন্তাজগতে বিপুল অতিকায় হইয়া দেখা দিয়াছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যা সব—বিশুদ্ধ কবি যিনি, তিনিও তাঁহার কাব্যসৃষ্টিকালে এই ভাবনাটি ভুলিতে পারেন নাই,—কি কাজ করিলে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিতে পারে, সমাজের উন্নতি হয়। সত্যকার শিল্পসৃষ্টির জন্য দরকার যে একটা উদার নির্ব্বিকার উদাসীনতা, শিল্পীদের প্রায় তাহা ছিলই না; আশুকর্ম্মের আয়োজনে, নৈমিত্তিক প্রয়োজনের হিসাবনিকাশের মধ্যে তাঁহাদের চিত্তমন এতখানি মজিয়া গিয়াছিল যে, সেখানে অহৈতুক আনন্দের সৃষ্টি হইবার কোন পথ প্রায় ছিল না। *

* "All fine literature is the disinterested contemplation or expression of life, but hardly any Irish writer can liberate his mind sufficiently from questions of practical reform for this contemplation."

কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের এই যে অবস্থা ছিল, আজ আমাদের দেশে ঠিক তাহাই দেখিতেছি। শুধু তাই নয়, ঈট্‌সের কথাগুলি আয়র্লণ্ড অপেক্ষা বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধেই বোধহয় বেশী প্রযুজ্য। আর আমার মনে হয় দিন যতই যাইতেছে, ততই যেন ঘোরতররূপে আমাদের সাহিত্যিকেরা ব্যবহারিক সংস্কারের সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছেন। প্রবীণতরদের মধ্যে বরং কিছু দেখতে পাই ঈট্‌সের সেই "disinterested contemplation" অর্থাৎ নির্লিপ্ত দৃষ্টির আভাস; কিন্তু নবীন যাঁহারাই আসিতেছেন, তাঁহাদের দেখি ভাবে ভঙ্গীতে কথায় ছন্দে কবির শিল্পীর লক্ষণ ক্রমেই লোপ পাইয়া চলিয়াছে, তাঁহারা যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন কেবল সংস্কারক হইয়া উঠিতে। আমাদের আজকালকার কাব্যজগৎ উপন্যাসজগৎ উপদেষ্টার ও প্রচারকের গর্জ্জনে মুখরিত, ঋষির প্রশান্ত সৌন্দর্য্যানুভূতি সেখানে অতি বিরল। নিরাবিল রসসৃষ্টির দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই, আমরা কহিতে চাহিতেছি কেবল "কাজের কথা"—পতিতের উদ্ধার, নারীজাতির উন্নতি, হিন্দু-মুসলমানে মিলন, ব্রাহ্মণের অত্যাচার, শাসকের উৎপীড়ন, দরিদ্রের দুরবস্থা, রাষ্ট্রের ও সমাজের গলদ, ব্যক্তিগত জীবনের অভাব ও আদর্শ—এই সকল সমস্যার মীমাংসা ও আলোচনা সাহিত্যেরও লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল কথা, সাহিত্য আর সুকুমার শিল্প নয়, আমাদের হাতে আজ তাহা হইয়া পড়িয়াছে নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র।

এরকমটি হওয়ার কারণ অবশ্যই আছে। কোন দেশের সাহিত্য এক হিসাবে সেই দেশের সমষ্টিগত মনের ইতিহাস বা আলেখ্য। আমাদের দেশের অবস্থা যেরকম, তাহাতে বাহিক

জীবনের কাজের সমস্যাগুলিই প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। রাষ্ট্রহিসাবে আমরা পরাধীন, এবং পরাধীনতার যত বিষময় ফল তাহা আমরা দেহে প্রাণে মনে অনুভব করিতেছি। পরবশ্যতার চাপে আমরা যতই সচেতন হইতেছি, ততই দেখিতেছি কি নিদারুণ দৈন্য কত দিক হইতে আমাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনকে হীন করিয়া রাখিয়াছে। দেশের সমস্ত জাগ্রত চেতনা তাই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এই অধঃপতন হইতে মুক্তির প্রয়াসে। যতই আমাদের চোখ ফুটিতেছে, ততই ছোটবড় নানা অভাব অভিযোগ বিবিধ বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইতেছে; দেশের প্রাণও তাই আত্মরক্ষার ও আত্মোন্নতির জন্য ইহাদের প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে এক একটি প্রতিক্রিয়ার শক্তি লইয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে; দেশের মন গড়িতে চাহিতেছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আশু অব্যবহিত ফলের জন্য এক একটি ব্যবস্থা। জীবনমরণের সমস্যা সব সদ্য সদ্য মীমাংসা করিবার প্রয়াসে যে বিপুল তর্ক দেখা দিয়াছে—বাদ, প্রতিবাদ, উপদেশ, উচ্ছ্বাস—তাহাই মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে দেশের কণ্ঠসাহিত্যে। বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার কথাটাই যেখানে সকলের বড় প্রশ্ন, সেখানে সাহিত্যে নির্লিপ্ত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অবকাশ কোথায়?—আয়র্লণ্ডেও ঈট্‌স্ যে প্রকৃত সাহিত্যিক-ভাবের অভাব দেখিয়াছিলেন, তাহারও কারণ আমাদের দেশেরই মত আর্লণ্ডের বাহ্যিক অবস্থা।

কিন্তু আয়র্লণ্ডের অথবা আমাদের দেশের কথাই শুধু বলি কেন, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া কি সাহিত্যের সেই একই ধরণধারণ ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাই না? মানবসমাজ দুঃস্থ পীড়িত; কিরকমে তাহার সংস্কার ও উন্নতি হয়, এই চিন্তাই দেশে দেশে সাহিত্যিক মনকে

আকৃষ্ট এবং অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। আজকালকার সাহিত্যের বিশেষত্বই এই যে, তাহা সমস্যামূলক (á thèse)। নাটক ও উপন্যাসের ত কথাই নাই, আধুনিক কাব্যেরও প্রধান কথা দেখি হইয়া পড়িয়াছে আদর্শের ও কর্ত্তব্যের আলোচনা। বর্ত্তমান জগৎ ও মানব সমাজ অতীতের তুলনায় বাস্তবিকই অধঃপতিত কি না, তাহা হয়ত বিচারের বিষয়; কিন্তু বর্ত্তমানের শিল্পীরা যে জগতের মানব-সমাজের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বেশী সজাগ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্যে এই যে জিজ্ঞাসার ধারা, ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন বোধহয় ইব্‌সেন। ইব্‌সেনের ইংরাজ-শিষ্য বার্ণার্ড শ ত মূর্ত্ত এই জিজ্ঞাসা। ষ্ট্রীণ্ডবের্গ, বোয়ের, গর্কি, ইবানেজ, দানুণ্ট্‌সিও, রোলাঁ—ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এই সকল শিল্পী কেহই ত কখন একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই যে তাঁহারা প্রধানতঃ মানব-সমাজের ও মানব-চরিত্রের সংস্কারক।

তবুও ইউরোপের সহিত আমাদের দেশের একটু পার্থক্য আছে। ইউরোপে শিল্প হিসাবে সাহিত্যরচনার একটা মাপ বা আদর্শ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত চর্চ্চার ফলে, বড় বড় স্রষ্টাদের কল্যাণে, সেখানে সাহিত্যের এমন একটা সাধারণ রূপ ও রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে যে, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, সামান্য লেখককেও তাহার কাছাকাছি পৌঁছিতে হয়। সেখানে ব্যক্তিগত সাহিত্যিক দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তির অভাব দেশের সাহিত্যিক আবহাওয়া অনেকখানি পূরণ করিয়া দেয়। তাই সাহিত্যের মধ্যে অসাহিত্যিক ভাব ও ভঙ্গী প্রবেশ করিলেও তাহা সেখানে তেমন রূঢ় বা পীড়াদায়ক হইয়া উঠে না। কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্যের শিল্প-মূর্ত্তি খুব সাধারণভাবেও কোনরকম মাপের বা

আদর্শের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া দাঁড়ায় নাই—এখনও তাহার যেন কাদা-মাটির অবস্থা। সুতরাং তাহা দিয়া আমাদের বেশীর ভাগ সাহিত্য-সাধক যে শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়িয়া ফেলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

শিল্পী ও সংস্কারক দুই পৃথক জগতের জীব। শিল্পী যে সংস্কারকের কাজ করিতে পারেন না, তাহা নয়; কিন্তু অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য শিল্পকে তাঁহার ভুলিতে হইবে। আর যখন তিনি শিল্পরচনায় নিযুক্ত, তখনও তাঁহাকে ভুলিতে হইবে যে, তিনি সংস্কারক। আয়র্লণ্ডের ঋষিকল্প কবি জর্জ্ রাসেল co-operation farming-এর একজন প্রচণ্ড কর্ম্মী; এ বিষয়ে তিনি নিজে হাতেকলমে খাটিয়া আয়র্লণ্ডের জাতীয় জীবনে যে কতখানি স্বচ্ছলতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের সংস্কারকদিগের দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু তাঁহার কাব্যে ত এ কথা ঘৃণাক্ষরেও প্রকাশ পায় নাই। কবি হিসাবে তাই বোধহয় পৃথক একটা নামেই তিনি নিজেকে পরিচিত করাইয়াছেন—তিনি তখন আর জর্জ্ রাসেল নহেন, তিনি এ, ই, (A. E.)। পূর্ব্বতন কবিরাও যে কখন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তাহা নয়—বাহ্যজীবনের আদর্শ ও কর্ত্তব্য লইয়া কথা যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান পায় নাই, এমনও নয়। কিন্তু শেলী, বায়রন, হিউগো অথবা ব্রাউনিং এমন একটা নির্লিপ্ত বৃহৎদৃষ্টি দিয়া এ সব বিষয় দেখিয়াছেন, এমন একটি ভঙ্গীতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনে হয় এ সকল কথা না বলিয়া অন্য কথা বলিলেও তাঁহাদের আসল কবিত্ব বা দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত না। তাঁহাদের কাব্যের মর্ম্ম বস্তুনির্দ্দেশের মধ্যে ততখানি নয়; উহাকে শুধু আশ্রয়রূপে ধরিয়া,

উহাকে ছাড়াইয়া চারিদিকে সুদূরবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে আর একটি ঊর্দ্ধতন কল্পলোক, তাহাই তাঁহাদের কবিতার স্বরূপ। আধুনিক সংস্কারক-শিল্পীদের হাতেও মাঝে মাঝে দেখি অতর্কিতে যেন সাহিত্যের এই দিব্যশরীর ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বার্ণার্ড শ আর কোথাও এক মুহূর্ত্তের জন্যও সংস্কারকের সম্মার্জ্জনী হস্তাচ্যুত করিতে পারেন নাই; কিন্তু যখন কথঞ্চিৎ পারিয়াছেন তখন Candida-র মত এমন অপরূপ একখানি সুঠাম রসগর্ভ শিল্পমূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। আর তখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, শিল্পী ও সংস্কারকে পার্থক্য কি; চারিদিকের ঊষর ধূ ধূ মরুপ্রান্তরের মাঝে স্নিগ্ধ-তরুছায়া-মণ্ডিত কানন-ভূমির সৌন্দর্য্য অধিকতর স্পস্ট ও মনোরম হইয়া দেখা দেয়। সমাজের নূতন নূতন সমস্যা, মানবপ্রাণের নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ও কর্ত্তব্যের আলোচনা যে সুকুমার সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এই সকল বস্তু বা উপকরণ সাহিত্যের রূপে ও রসে রূপান্তরিত ও রসায়িত করিয়া ধরিবার জন্য থাকা চাই একটা যাদুবিদ্যা, একটা মোহিনী শক্তি। উদাহরণ স্বরূপ এ বিষয়ে আধুনিক ফরাসী নাট্যকার বাতাই (Bataille) ও বের্ণ্‌স্টাইন (Bernstein) কে আমি শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চাই। *

* বেশীর ভাগ কতকগুলি অবান্তর কারণবশতঃ আমাদের দেশে আজকাল ফরাসীর প্রতিনিধিরূপে রোমাঁা রোলাঁ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু আমি যে দুইজনের নাম করিলাম, আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের স্বরূপ তাঁহাদের মত এমন সংহত সামর্থ্যে, সুচতুর সুষমায় ও নিবিড় অর্থগৌরবে ভরিয়া আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। আনাতোল ফ্রান্সের কথা আলাদা। বাতাই'র "La Vierge folle" ও "La Femm Nue" এবং বের্ণ্‌ষ্টাইনের "La Griffe" ও "Montmartre" বাঙ্গালী শিল্পীকে আমি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের দেশে এই দিক দিয়া যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধহয় শরৎচন্দ্র। কিন্তু যিনি শিল্পসিদ্ধ তাঁহার পক্ষেও, এই ধারায় চলিয়া শিল্পত্ব রক্ষা করা যে কত কঠিন, তাহার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েকটি প্রয়াস—যথা, "মুক্তধারা" ও "রক্তকরবী"। তাই আমি বলিতেছিলাম বাংলার সাহিত্য-জগতে অনাবিল রসসৃষ্টির পথে সংস্কারকের জিজ্ঞাসা বৃহৎ অন্তরায়ই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, আধুনিক বাংলা যদি যথার্থ রূপদক্ষতা দেখাইয়া থাকে, তবে তাহা হইতেছে চিত্রকলার ক্ষেত্রে। এখানে বাংলার প্রতিভা যেন সরাসরি উঠিয়া গিয়াছে শিল্পলোকের সমুচ্চ জ্যোতির্মণ্ডলে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ যে চিত্রজগৎ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই একটা সাক্ষাৎ প্রকাশ, একটা আবির্ভাব—এমনি স্বচ্ছন্দ, অকুণ্ঠ, আত্মস্থ, এমনি সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা—স্বে মহিম্নি। ইহার কারণ হয়ত একাধিক; কিন্তু আমার মনে হয় বিশেষ কারণ এই যে, সাহিত্যিকেরা যে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়াছেন, বাংলার নবীন চিত্র-শিল্পীগণ সে দিক দিয়াই চলেন নাই; সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে গিয়া ইঁহারা আদৌ প্রচারক হইতে চাহেন নাই—আদর্শ, উপদেশ বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা লইয়া ইঁহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন নাই। ইঁহাদের রস-পিপাসু অন্তরাত্মায় যে সত্য, যে তত্ত্ব, আনন্দের বিগ্রহ হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহাকেই একাগ্র চিত্তে, সরল ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে তাঁহারা একটা সুচারু রূপায়নে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাইবেল কথিত মার্থার মত ইঁহারা বাহিরের বহু বিষয়ের মধ্যে আপন চিত্তকে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত করিয়া দেন নাই; কিন্তু মেরীর মত তাঁহারা তন্ময়

হইয়া আছেন আসল যে একটিমাত্র জিনিষ তাহারই ধ্যানে—the one thing needful।

আমি বলিয়াছি সাহিত্য হইতেছে সমাজের ইতিহাস বা আলেখ্য। এক হিসাবে ইহা সত্য। এক দিক দিয়া দেখিলে সাহিত্য সমসাময়িক মনের প্রতিচ্ছবি বটে; কিন্তু আর একদিক দিয়া সাহিত্য চিরন্তনের বিগ্রহ। এই শেষোক্ত হিসাবেই সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য অর্থাৎ চারুশিল্প। সমসাময়িক মন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা বা পাদভূমি হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের শীর্ষ বা অন্তরাত্মা হইতেছে চিরন্তন। সমসাময়িককে চিরন্তনের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া চিরন্তনের চক্ষু দিয়া দেখাই সাহিত্যের কাজ। সমসাময়িক মন সমস্যার অর্থাৎ দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র। সেখানে সত্যের যাচাই বাছাই ঢালাই পেটাই হইতেছে, সেখানে নূতন আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। এ কাজ দার্শনিক মনের হইতে পারে; শিল্প কিন্তু নূতন সত্যকে আবিষ্কার করে না, বা তাহাকে বিচারের কষ্টিপাথরে কসিয়া পরীক্ষাও করিতে বসে না। শিল্প দেখাইতেছে চিরন্তন সত্যের রূপায়ন; শিল্পীর কাছে সত্য আবির্ভূত একটা যেন চির পরিচিত, চির-পুরাণো, সনাতন, নিত্যসিদ্ধ রূপ লইয়া। সাহিত্যের সত্য জন্ম লইয়াছে একটা প্রশান্ত স্থিতির মধ্যে, দেশকাল পাত্রাতীত একটা বৃহতের ভূমার মধ্যে। সত্যের এই যে স্বরূপ—সাংখ্যের পরিভাষায় তর্কের ক্ষেত্রে কর্ম্মের ক্ষেত্রে তাহার কোন 'বিকৃতি' নয়, কিন্তু সাক্ষাৎজ্ঞানের মধ্যে তাহার যে 'প্রকৃতি'—তাহা দেখিয়া ও দেখাইয়াই শিল্পী নিশ্চিন্ত। তিনি আপনাকে সর্ব্বদা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ রাখিয়াছেন আপন অন্তরাত্মার অপরোক্ষ অনুভূতির নির্দ্বন্দ্ব মহিমায়। তাঁহার সত্তা যে কতখানি সত্য, সে সত্যের প্রভাব যে কত

বহুল বিপুল, তাহা তিনি ফলাইয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত নহেন। সুন্দরের যে সত্তাগত সত্য, যে স্বভাবগত রসাত্মিকী শক্তি, তাহা স্বয়ম্প্রকাশ, স্বয়ং ক্রিয়াশীল—তবে হয়ত দার্শনিকের বা সংস্কারকের ইচ্ছামত লক্ষ্যে ও পথে নয়। কবির মনে তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসা, আলোচনা প্রবৃত্তি, কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসা থাকিতে পারে, থাকাও উচিত—কিন্তু শিল্প সৃষ্টিকালে এ সব থাকিবে গোপনে অন্তরালে। মাটির মূর্ত্তি গড়াইতে হইলে তাহাতে খড়কুটা অনেক জিনিষই আবশ্যক হয়, কিন্তু সে সব জিনিষকে ত বাহিরে আর ধরিয়া দেখান যায় না। কবি গ্যেটের মত এমন একজন অতৃপ্তজিজ্ঞাসু, এমন একটি দার্শনিক মন খুব কম কবির মধ্যেই পাওয়া যায়; তবুও এই গ্যেটেই বলিতেছেন—The poet needs all philosophy, but he must keep it out of his work।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

চিরন্তন।

নিবিড় অরণ্য মাঝে উচ্চ সুবিশাল
বনস্পতি কাটাইছে কাল,
কত বর্ষ, কত যুগ, তুচ্ছ করি স্মৃতি ইতিহাস
যেন তার আশ,
জীবনের মানদণ্ডে মাপিবারে অতল-গভীর
খরস্রোত সময়-নদীর।
দিকে দিকে করিয়া বিস্তার
লক্ষ সুভীষণ বাহু পেশীগ্রন্থীময়, বজ্রসার,
আছে তৃপ্ত নিজ দৃপ্ত কাঠিন্য-গরবে।
উৎসবে পরবে
দূর গ্রাম হতে আসে নরনারী করি কোলাহল,
গাগরী কলস ভরি সুপবিত্র জল
ঢালি দেয় মূলে তার, সিন্দূর চন্দন
পুষ্পমালা পরাইয়া করে নতি আরতি বন্দন।
দ্বিপ্রহরে বালকবালিকা
পলাতকবৃন্দ, মুখে ফুল্ল শেফালিকা,
প্রদক্ষিণ করে তারে ক্রীড়ামত্ত কৌতুক রভসে,
উদ্দাম হরষে;
আবার সহসা দূরে যায় পলাইয়া,
ত্রস্ত ভয়ে দুরু দুরু সকম্পিত হিয়া।

তার পত্র-শিবিরের ঘনচ্ছায়ে রবিরশ্মিহীন
অতীতের শোকাচ্ছন্ন দিন
কোলে লয়ে স্তব্ধতা নিঝুম
পাড়াইছে ঘুম।
অপরাহ্নে প্রেমিকযুগল
কভু বসি তলে তার কহে অনর্গল
কপোতকূজনস্বরে অর্থহীন প্রলাপের ভাষা,
অমৃতমধুর, কর্ম্মনাশা;
কভু চাহে পরস্পর পানে
অবাক পুলকভরা লজ্জারুণ বিলোল নয়ানে;
হেনকালে চমকি নেহারে
অতর্কিত সন্ধ্যা চারিধারে
নামিয়াছে ঘিরে,
লোকাতীত বিভীষিকা নৃত্য করে অজস্র তিমিরে।
অমনি উঠিয়া চলি যায়,
গাঢ় আলিঙ্গনশেষে মাগিয়া বিদায়।
তখন কেবল জাগে ঘুৎকার গর্জ্জন,
আর্ত্তনাদে জীবনবর্জ্জন,
কোটরে কোটরে শাখে উপবৃক্ষ-বল্লরী-বিতানে
নিশাচর-অধ্যুষিত কুহু রাত্রিমানে।
আসে ঝঞ্ঝাবায়ু,
উন্মাদ ভৈরব বেগে কাঁপাইয়া স্নায়ু
ক্ষুদ্র বিটপীর;

অটল অচল তবু বনস্পতি বীর
পিষ্ট করি তারে নিজ বিকট বন্ধনে
দেয় ছাড়ি, মর্ম্মর ক্রন্দনে
পলায় সে ঘুরি—
কেবল বিদূরি
তার পদপ্রান্ত হতে আবর্জ্জনা-স্তূপ,
ভৃত্যের স্বরূপ।
পলে পলে বাড়ে অহঙ্কার
তার শক্তিসুকঠোর দীর্ঘপ্রাণতার;
যেন মূক মৌন তার আবরণ টুটি,
বাসনা কহিতে চায় প্রতি পত্ররসনায় ফুটি,
—'আমি সত্য, আমি নিত্য অতি,
ক্ষণস্থায়ী দুর্ব্বলের বিশ্বে এক রতি
নাহি কোন স্থান,
হও সবে মোর তুল্য স্থিরসত্ত্ব চির-আয়ুষ্মান;—
তবে সে প্রেমিক, ভক্তদল,
ভিখারী পথিক, শিশু কৌতুক-চঞ্চল,
সেবা পূজা প্রণামের উপচার ঘটা
দিবে অয়াচিত;'—কিন্তু ইন্দ্রধনুচ্ছটা
পুষ্প এক রজনীর শেষে
তার শীর্ষদেশে
উঠিল হাসিয়া,

লাজক্ষুব্ধ বনস্পতি ধিক্কারিয়া কহিল শাসিয়া
পুষ্পের প্রসূতি লতিকায়,
আপনার অবরুদ্ধ নীরব ভাষায়,—
ওরে মূর্খ সাহসিকা তোর
পেলব-পলাশ পুষ্প, নাহি যার একবিন্দু জোর
রুধিবারে পবন মলয়,
যার ক্ষীণ লাবণ্য-বলয়
দিনান্তে পড়িবে খসি জীবনের বৃন্ত-বাহু হতে
বিরহ-শিথিল—তারে কোন্ স্বেচ্ছাব্রতে
দিলি গাঁথি অঙ্গে মোর দীপ্ত পরিহাসে?—
হেনকালে পুষ্পের সুবাসে
কোথা হতে ত্যজিয়া কুলায়,
ক্ষুদ্র পাপিয়ার শিশু নিদ্রাহারা আসিল সেথায়,
স্ফুরিত কোমল বক্ষে, লক্ষ্যহীন পদে,
মৃদুলম্ফে, ধায় যথা ধরিবারে ঊর্ম্মি কোকনদে।
বসি পুষ্পপাশে
চাহিল সে ঊর্দ্ধমুখে অনন্ত আকাশে
পূর্ণিমার শশধর পানে,
তারপরে চঞ্চু মেলি বেদনার হিল্লোলের গানে
ভাসাইয়া দিল বনস্থল,
শিহরিল তারকায় প্রতিধ্বনি-তরঙ্গ তরল।
সচকিত বনস্পতি মানিয়া বিস্ময়,
মনে মনে ক্ষুব্ধ রোষে কয়,

—'একি এ করুণ, তীব্র, চপল, মৃদুল,
ভীম গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল
উঠে স্বর !—লুপ্ত হয়ে যাক্
সঙ্গীত, কুসুম দুই' ! সহসা নির্ব্বাক্
হইল বিহঙ্গশিশু অজগর-গ্রাসে,
খসিল পবনে পুষ্প ত্রাসে।
জুড়াইল বনস্পতি-মন
স্বস্তি সুখে—মনে ভাবে আমি চিরন্তন।

* * *

তারপরে গেল কিছুদিন,
কোথা বনস্পতি ?—হায়, কুঠার-বিলীন !
করে না প্রেমিক পান্থ ভুলিয়া স্মরণ
তার দীর্ঘ জীবনের কাহিনী—মরণ
লেপিয়া দিয়াছে মসী ঘোর
তার পরমায়ু-গর্ব্বে—নির্ম্মম কঠোর !

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

পণের মুক্তি।

(অনৈতিহাসিক যুগের একটি ঐতিহাসিক চিত্র)

এ সেই আদিম যুগের কথা, দেশ ছিল যখন বনে জঙ্গলে ঢাকা এবং মানুষের লজ্জানিবারণের উপায় ছিল গাছের বাকল, পশুর চামড়া ও পাতার আচ্ছাদন। সেই যুগে অকস্মাৎ একদিন বসন্তের আমেজ এসে লাগ্‌লো রাজ্যের ছেলে-বুড়ো, নর-নারী সকলের প্রাণে। উৎসব কর্‌তে তারা রাজার দরবারে এসে হাজির হ'লো।

রাজাকে ডেকে তারা বল্‌লে—মহারাজ, গহন বনের অন্ধকার ফাগুনের ফাগে রাঙা হ'য়ে উঠেছে, বনের মনে যে বাঁশী বাজ্‌ছে তারি সাড়া ডেকে এনেছে দোয়েলের শীষ আর বুলবুলের গানকে। কৃষ্ণ-চূড়া আর অশোকের হাসির স্পর্শ পাচ্ছি আমরা আমাদের মনের ভিতরে—রক্ত কণিকাগুলির মধ্যে। আপনি অনুমতি করুন, আমরা আমাদের হাসি-গান, আশা-আনন্দ দিয়ে উৎসবের দেবতাকে আজ মূর্ত্ত ক'রে তুলি।

রাজা বল্‌লেন—বেশ,. রাজ-দরবার থেকেই সে উৎসবের মহড়া তবে সুরু হোক্‌!

(১)

রাজসভার আগাগোড়া উৎসবের আলোকে ভ'রে উঠ্‌লো। পাত্র-মিত্র-অমাত্য প্রভৃতি সভাসদেরা যে ার জায়গায় জাঁকিয়ে বস্‌লেন।

প্রজারা দলে দলে এসে ভিড় জমালো। দামামা বাজ্‌লো, নকিব হাঁক্‌লো। উৎসব সুরু হ'বে, হঠাৎ এমনি সময় চোখে পড়লো, রাজার ডাইনে বাঁয়ে দু'খানা সিংহাসন খালি প'ড়ে আছে—উৎসব-সভায় অনুপস্থিত র'য়ে গেছেন রাণী, আর তাঁর সঙ্গে রাজ্যের মূর্ত্তিমতী উৎসব যিনি, সেই রাজকন্যা।

ওস্তাদের হাতে বাঁশের বাঁশী সুরের স্বপ্ন সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে অকস্মাৎ থেমে গেল—ঝরণা আর তার বেরিয়ে আস্‌বার পথ খুঁজে পেলে না। নর্ত্তকীর পায়ের ঘুঙুর নাচ্‌নার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি কর্‌তে গিয়ে নিজেই বজ্রাহতের মত নিঃসাড় হ'য়ে গেল—তার আর বিদ্যুৎ সৃষ্টি কর্‌বার উৎসাহ রইলো না। রাজ-অন্তঃপুরের পানে চেয়ে চেয়ে রাণী ও রাজকন্যার প্রতীক্ষায় সভার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো।

পলের সঙ্গে পল মিশে দণ্ড পেরিয়ে গেল। দণ্ডের সঙ্গে এসে দণ্ড মিশ্‌তে লাগ্‌লো, প্রহর গড়্‌বার জন্যে। তবুও রাণী ও রাজকন্যার দেখা নেই। অবশেষে রাজাও উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠলেন। তিনি প্রতিহারীকে ডেকে বল্‌লেন—রাণীর কাছ থেকে খবর নিয়ে এস, সভাকে কেন তাঁরা বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন; প্রজারা সব তাঁর ও রাজকন্যার অপেক্ষায় অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু প্রতিহারী অন্তঃপুরের পথে পা বাড়াবার আগেই বল্কলের বসনে দেহ ঢেকে রাণী একা সভাগৃহে প্রবেশ কর্‌লেন—মুখ তাঁর ম্লান, চোখের কোলে জলের রেখা ছল্‌ ছল্‌ কর্‌ছে।

রাজা তাঁর বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মহারাণী তোমার চোখের কোণে জল? তোমার সঙ্গে রাজকন্যাকেও ত দেখ্‌ছিনে?

উদ্‌গত অশ্রু দমন করতে করতে রাণী বললেন—আজকার এই সভা বন্ধ করে দাও মহারাজ। রাজকুমারী এ সভাগৃহে প্রবেশ করবে না।

বিস্মিত ব্যাকুল কণ্ঠে রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কেন ?

রাণী বললেন—উৎসবের জন্য সাজসজ্জা করে' সে বেরিয়েছে, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় তার পরণের বল্কল উড়িয়ে নিয়ে গেল, পাতার তৈরী কাঁচুলী ছিঁড়ে খসে' মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। লজ্জায় সেই যে সে ঘরে ঢুকেছে, আর বাইরে পা বাড়ায় নি। আমি তাকে নতুন ক'রে বেশ রচনা করবার জন্যে আহ্বান করতেই সে আমাকে বললে—মা, তুমি মহারাজকে ব'লো, দেহের জন্য যত দিন না তিনি যোগ্য আচ্ছাদনের আবিষ্কার করতে পারবেন, ততদিন আমি ঘরের বাইরে পা বাড়াবো না। বাতাসের ঘায়ে যে আচ্ছাদন খ'সে পড়ে না, গায়ের ত্বকের সঙ্গে ত্বকের মতো ক'রেই যে আচ্ছাদন জড়িয়ে থাকে, সেই ত নারীদেহের যোগ্য আচ্ছাদন! তোমরা যদি তাই দিয়ে আমার এই নগ্ন দেহ ঢেকে দিতে পার, তবেই আলো-বাতাসের সঙ্গে আবার আমার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হবে; নতুবা আলো-বাতাসের স্পর্শ আমরণকালের জন্য আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু হ'য়ে রইলো।

রাজ্যের যত লোকের আনন্দনির্ঝর ছিল, কুসুমের মতো সুকুমার এই তন্বী রাজকন্যাটি। তার মুগ্ধ দৃষ্টি বসন্তের হাল্‌কা হাওয়ার মতো হাসির দোলায় সকলের মন দুলিয়ে দিয়ে যেত। সহসা তার-ই এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে নাগরিকদের মন হ'তে উৎসবের আলো ঝড়ের বাতাসে দীপের মতো ক'রে নিভে গেল। সুরের ওস্তাদের গানের উপর, নর্ত্তকীর নাচনার উপর, উৎসবের আলোর উপর তাদের আর

কোনোরকমের আসক্তি রইলো না। তাই মহারাজ যখন জিজ্ঞাসা করলেন—রাজকন্যাকে বাদ দিয়েই তবে উৎসবের মহড়া আরম্ভ হোক্?—সভাসুদ্ধ লোক তখন সমস্বরে প্রতিবাদ ক'রে ব'লে উঠলো—হাসি-গান আজ বন্ধ ক'রে দাও মহারাজ, তার বদলে উৎসবের সভায় বিজ্ঞানের চর্চ্চা সুরু হ'য়ে যাক্। রাজ্যের আনন্দ-দেবতা আজ ইঙ্গিত করেছেন, রাজ্যের লোকের দেহ আচ্ছাদনের সমস্যাটা সমাধানের জন্যে। সে সমস্যা সমাধান করতে না পারলে কোনো উৎসবই আজ আনন্দের রসদ যোগাতে পারবে না।

(৩)

মন্ত্রণার জন্য রাজ্যের যত বিজ্ঞ মাথা সব এক জায়গায় এসে জড় হ'ল। কিন্তু নতুন কোনো পথ কেউ খুঁজে বার করতে পারলেন না। বল্কলের চাহিদা যোগানের ভার যাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল, তিনি নিত্য নতুন বল্কলের সন্ধান করে ফির্তে লাগ্‌লেন। সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর বল্কলে রাজবাড়ীর অন্তঃপুর ভরে উঠলো। কিন্তু যে বল্কল সমস্ত দেহকে জড়িয়ে দেহের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে থাকতে পারে, তেমন বাকলের সন্ধান কোথাও মিল্‌লো না। বল্কলের কারিগর রাজকন্যাকে বাইরে বা'র করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে লজ্জায় মাথা হেঁট করলেন।

পশুর চামড়া দিয়ে অঙ্গাবরণ তৈরী করা ছিল যাঁর ব্যবসা, তাঁর শিকারীর দল বনে বনে নতুন পশুর সন্ধানে ছুটলো। বাঘ, হরিণ হ'তে আরম্ভ ক'রে কত জানা-অজানা জন্তুর চামড়ায় তাঁর ভাণ্ডার ভ'রে গেল। রৌদ্রে শুকিয়ে, জলে ভিজিয়ে, অস্ত্রে চেঁচে, আগুনে সেঁকে, যত দূর সম্ভব মোলায়েম ক'রে তিনি সেগুলি রাজকন্যার কাছে পাঠিয়ে

দিলেন, কিন্তু তবু রাজকুমারী তাঁর অন্ধকার ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন না। বোঝা গেল, চামড়ার আচ্ছাদনও তাঁর পছন্দ হয় নি।

দেশের শিল্পীরা গাছের পাতা নানারকমে সাজিয়ে রাজকন্যার দেহের জন্যে আচ্ছাদন রচনা ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। শিল্প-রচনার দিক থেকে তার শোভা ও সৌন্দর্য্যে চোখ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু তা' অন্ধকার কক্ষের স্বেচ্ছাবরুদ্ধা রাজকন্যার মনোহরণ করতে পারলে না। দিনের পর দিন রাজপুরীর একটি আলোহীন, জনহীন কক্ষে বেদনা ও নিরানন্দের জাল বুনে বুনে রাজকন্যার দিন কাটতে লাগলো। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের আনন্দের স্বচ্ছ ধারা, যা' মানুষের হাসির ভিতর দিয়ে, গানের ভিতর দিয়ে, ঝরণার মতো ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতো— তাও কোথায় লুকিয়ে, শুকিয়ে, হারিয়ে, লুপ্ত হ'য়ে গেল।

কিন্তু দুঃখের ইতিহাসটা যে জায়গায় সুরু হয় সেই জায়গাতেই শেষ হয় না। রাজ্যের দুঃখের যে ইতিহাস রাজকন্যার পণের ভিতর দিয়ে সুরু হ'য়েছিল, রাজ-কন্যার কঠিন পীড়ার ভিতর দিয়ে তা' ক্রমে ক্রমে মর্ম্মান্তিক হ'য়ে ওঠবার উপক্রম করলে। রৌদ্র-বাতাসের সংস্পর্শ হ'তে বঞ্চিত ঘরের ভিতর রাজকন্যার তনু দেহলতা শিকড়-ছেঁড়া, রসের স্পর্শশূন্য লতার মতই শুকিয়ে উঠতে লাগলো। শুনে রাজবৈদ্য রায় দিলেন, রাজকন্যাকে যদি আলো-বাতাসের ভিতর আবার টেনে আনা না যায়, তবে যে ক্ষীণ রসধারা এখনো তাঁর দেহে জীবনের দীপশিখাটাকে জ্বালিয়ে রেখেছে, তাকে আর দীর্ঘদিন জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

খবর শুনে রাণীর মুখের গ্রাস অর্দ্ধপথে থেমে গেল, রাজার চোখের

নিঁদ্ দুঃস্বপ্নে ভরে' উঠ্‌লো; রাজ্যের আনাচে কানাচে যেখানে যতটুকু হাসি ছিল, তাও বিদ্যুৎদীপ্তির মতো ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই মিলিয়ে গেল।

(৪)

রাজা এসে রাজকন্যার দুয়ারে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—মা, এই অন্ধকারের অতল হ'তে আলোর রাজ্যে, বাতাসের রাজ্যে তুই ফিরে আয়, নিজের জীবন দিয়ে একি অদ্ভুত ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে চাস্ তুই! রাজ্যের মুখের হাসি অন্ধকারের ভিতর মিলিয়ে গেছে, উৎসবের দেবতার চোখ দিয়ে অশ্রুজলের উৎস ঝর্‌ছে। আমার দিকে না চাস্ তোর মার দিকে তাকা; রাজ্যের প্রজা, যারা তোকে না দেখে অশ্রু-সাগরে ভাস্‌ছে, তাদের দিকে তাকা—এমন করে আত্মহত্যা করিস্‌নে!

ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে রাজকন্যা উত্তর দিলেন—বাবা, তোমার স্নেহ আমি জানি, তোমার দুঃখ যে কত গভীর তাও আমার অজানা নেই; কিন্তু স্নেহের খাতিরেও তো পণের মর্য্যাদা নষ্ট করা যায় না। আমার অন্তরদেবতাকে রুষ্ট ক'রে আমার আত্মাকে মেরে ফেলে যদি দেহটাকে বাঁচাই, তুমিই ব'লো সেই কি যথার্থ বেঁচে থাকা হবে?

মুখ লাল ক'রে রাজা দরজার প্রান্ত হ'তে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে স'রে গেলেন।

রাজা স'রে যেতেই রাণী একেবারে ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে রাজকন্যার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে বল্‌লেন,—ওরে, এই নাড়ীর সঙ্গেই একদিন তুই জড়িয়ে ছিলি। আজও তোর মুখ ম্লান দেখ্‌লে সেই নাড়ীতেই টান পড়ে, আবার সেই বুকের ক্ষত দিয়ে রক্তের ধারা ঝর্‌তে থাকে! পণভঙ্গের পাতক কি মাতৃহত্যার পাপের চাইতেও গুরুতর?

রাণীর মাথার চুলের গুচ্ছের ভিতর হাত বুলোতে বুলোতে রাজকন্যা বল্‌লেন—মা, আমি ত মর্‌তে চাইনে, আমার দেহের আচ্ছাদন দিয়ে আমাকে আলোয় নিয়ে চলো, বাইরে বাতাসের ঝাপ্‌টার ভিতর ছেড়ে দাও। কিন্তু আমার অনাবৃত দেহ নিয়ে তো বাইরে বেরোতে পারব না—তুমি মা হ'য়েই কি আমার সে লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তে পার্‌বে?

তারপর ধীরে ধীরে রাণীর চোখের জল মুছে দিতে দিতে রাজকন্যা আবার বল্‌লেন—তার চেয়ে মা তুমি রাজ্যের ভিতর ঘোষণা ক'রে দাও, যে আমার দেহের আচ্ছাদন গড়ে' দিতে পার্‌বে, এ দেহটাকে তোমরা তারি পায়ে উৎসর্গ ক'রে দেবে। যে শিল্পী এই রাজ্যের লজ্জার অভাব মেটাতে পার্‌বেন, তিনি হয়তো নিভৃতে সৌন্দর্য্যের ধ্যানে ডুবে আছেন—তোমাদের এই দুঃখের দুঃসংবাদ এখনো তাঁর কাছে পৌঁছায় নি। কিন্তু রাজকন্যাকে যদি পণ রাখ, তবে হয়তো তাঁর ধ্যান-লোকের ভিতরে গিয়েও তার সংবাদ পৌঁছনো অসম্ভব হবে না।

পরের দিন রাজা রাজ্যের ভিতর ঘোষণা ক'রে দিলেন, রাজকন্যার দেহের যোগ্য আচ্ছাদন যে রচনা ক'রে দিতে পার্‌বে, অর্দ্ধেক রাজ্যের সঙ্গে রাজকন্যা তারি হাতে সমর্পণ করা হবে।

(৫)

সে ছিল শিল্পী। মনের আনন্দে জিনিষ গ'ড়ে তোলাই ছিল তার কাজ। এই শিল্পীর তপোবনে ফুল-ফলের গাছের ভিতর কি ক'রে যে কতকগুলি কাপাসের গাছ জন্ম নিয়েছিল, সে তা' খেয়াল ক'রে দেখে নি। কিন্তু কাপাসের গাছগুলোতে যখন ফুল ফুট্‌লো, তখন তা'

আর তার কাছে উপেক্ষার বস্তু রইল না, এবং তারপর ফুলগুলো যখন ধীরে ধীরে ফলে পরিণত হ'ল, সেগুলো নিয়েও তার নাড়াচাড়া তার অজ্ঞাতসারেই সুরু হ'য়ে গেল। ফলগুলো নিয়ে সে ভাবতে লাগলো— এগুলোর প্রয়োজন কি? কোথায় এর সার্থকতা? তার মনের একদিকে সৌন্দর্য্যদেবতার পায়ের ছোঁয়ায় রূপের লীলাপদ্ম যেমন দলের পর দল ছড়িয়ে ফুটে উঠ্‌ছিল, আর একদিকে তেমনি মানুষের প্রয়োজনের দেবতাও সেখানে প্রয়োজনের পর প্রয়োজনের রূপ সৃষ্টি ক'রে চলেছিলেন। সুতরাং ফুলের শ্রী তার মনকে যেমন দোলা দিয়ে গেল, ফলের চেহারাও তেমনি তার সার্থকতার কথাটা নিয়ে তার মনের তারে ঘা দিতে ভুল কর্‌লে না। শিল্পী ভাবতে লাগলো, যে ফল পেকে ক্ষুধার রসদ যোগায়, তার প্রয়োজন বোঝা যায়; কিন্তু যে ফল পেকে পশমের মতো কতকগুলো আবর্জ্জনার স্তূপ গড়ে' তোলে, কোথায় তার সার্থকতা?

সংশয়ের দোলায় দিনের পর দিন শিল্পীর মন দুল্‌তে লাগলো— অসোয়াস্তিতে মন তার ভারি হ'য়ে উঠ্‌লো। কাপাসের ফলের ভিতর হ'তে তুলাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা একটা ক'রে আঁশ বেছে সে সেইগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে দেখতে লাগলো, আবার খুলে ফেলে দিয়ে খুঁজ্‌তে সুরু করে দিলে কোথায় তার সার্থকতা! এম্‌নি অনিশ্চয়তার ভিতর মন তার যখন অন্ধকারের পর অন্ধকার রচনা ক'রে চলেছে, হঠাৎ সেই সময় একদিন তার চোখ প'ড়ে গেল মাকড়সার জালের উপরে।

এ কি! তার ফলের আঁশগুলো যে এই জালের লূতার মতই সরু! এ দিয়েও তবে লূতার জালের সৃষ্টি করা যায়। শিল্পী ভাবতে লাগলো,

এই আঁশগুলোকে বিচ্ছিন্ন ক'রে একসঙ্গে পাকিয়ে দীর্ঘ করার উপায় কি!

এইবার শিল্পীর মন মেতে উঠলো সেইরকমের একটা যন্ত্র আবিষ্কারের জন্যে, যা'তে ক'রে ফলের ভিতরকার আবর্জ্জনাগুলো পাকিয়ে সূক্ষ্ম লূতার তন্তুর মতো ক'রে তোলা যায়। দিন নেই, রাত নেই, শিল্পীর যন্ত্রাগারে চলেছে সূতা-কাটার যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা। কত কাঠ কতরকমে কাটা হ'ল, কত আকারে সেগুলো সাজানো হ'ল, কতরকমের যন্ত্র গ'ড়ে উঠলো, কত ভাঙ্গা পড়লো। অবশেষে একদিন শিল্পীর হাতে ধরা পড়লো সেই যন্ত্রটি, যাতে তুলা পাকিয়ে তা'কে সূতায় পরিণত করতে পারা যায়।

শিল্পী চলেছে সূতার পর সূতা কেটে। কাপাসের ফল থেকে বীজ ছাড়িয়ে মনের মতো ক'রে গুছিয়ে নিয়ে সে একেবারে মস্‌গুল হ'য়ে উঠেছে সূতা কাটার আনন্দে। পাঁজের পর পাঁজ ফুরিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু মনে তার শ্রান্তি আসছে না—ক্লান্তি জাগছে না। সূতার স্তুর সাদা ফুলের পাহাড়ের মতো হ'য়ে বেড়ে উঠলো—কোনোটি মোটা, কোনোটি সরু, কোনোটি মাঝারি।

হঠাৎ একদিন তার মনে হ'ল, বৃথা -বৃথা—সমস্তই বৃথা! কি হবে এই সূতার স্তূপ দিয়ে?—কোথায় এর সার্থকতা? কাটায় আনন্দ আছে, কিন্তু যে আনন্দ লোকের কাজে লাগানো যায় না, সে আনন্দ তো শিল্পীর ধ্যানের বস্তু নয়। এ দুনিয়ায় যে সকলের বড় শিল্পী, তার সৃষ্টি যে প্রয়োজনের ভিতর দিয়েই সার্থক হয়ে উঠেছে। আমার এ সূতা তো কারো কাজে লাগছে না—লাগার সম্ভাবনাও নেই। ক্ষোভে ব্যথায় সূতাগুলো ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে শিল্পী মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

(৬)

শিল্পীর দিন বড় দুঃখের ভিতর দিয়ে কাটছে। বিরাট উত্তেজনার পর একটা গভীর অবসাদের ভিতর তার মন তলিয়ে গেছে। শিল্প রচনায় তার আর স্পৃহা নেই; প্রকৃতির যে ইঙ্গিত ধ্যান ক'রে ধরতে হয়, সে ধ্যানের উন্মাদনা তার কাছে কতবার এসে কোনো সাড়া না পেয়ে ফিরে গেল। শিল্পী কেবলি ভাবছে—এতদিন ধরে' এত সাধনায় যাকে গড়ে' তুললুম, সে যন্ত্রের কোনই সার্থকতা নেই! হঠাৎ এমনি সময় একদিন তার কাছে এসে পৌঁছলো রাজার ঘোষণার বার্ত্তা, আর তারি সঙ্গে রাজকন্যার পণের কথা।

বিদ্যুতের স্পর্শ লাগ্‌লে হঠাৎ মানুষের সমস্ত শরীর যেমন একসঙ্গে নাড়া দিয়ে ওঠে, রাজকন্যার পণের কথাটা তেম্‌নি শিল্পীর মনের ভিতরটা নাড়া দিয়ে গেল। সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—পেয়েছি —পেয়েছি—এইবার কার্পাশের সার্থকতার সন্ধান পেয়েছি! আমি এই তুলা দিয়ে রাজকন্যার দেহের আচ্ছাদন গ'ড়ে দেব। শিল্প দেবতার ইঙ্গিত এইবার আমার কাছে ধরা পড়েছে।

তারপর সে উঠে তুলাগুলো তার চারপাশে ছড়িয়ে নিয়ে টেনে টেনে সেগুলিকে বল্কলের মতো ক'রে—পশুর চামড়ার মতো ক'রে বিছাতে লাগ্‌লো। দেহ ঢাক্‌বার আচ্ছাদন তা'তে তৈরী হ'লো বটে, কিন্তু সেও তো বাতাসের ঘা সহ্য করতে পারছে না—হাল্‌কা হাওয়াতে যে তা' খ'সে, উড়ে, স্থানচ্যুত হ'য়ে পড়্‌ছে। তুলার পাতগুলোকে একসঙ্গে আট্‌কাতে না পারলে কি ক'রে তা'তে অঙ্গের আচ্ছাদন তৈরী হবে?— শিল্পী সুতার স্তূপের দিকে ফিরে তাকালো। ঐ সূতা দিয়ে তুলার পাতগুলো বেঁধে রাখ্‌তে পারা যায় না? সূতা নিয়ে সে

আবার তুলার পাঁতগুলো বাঁধবার চেষ্টা কর্‌লো। কিন্তু তুলা সূতার তারে বাঁধা প'ড়ে এক হ'য়ে উঠ্‌লো না। শিল্পীর মুখের উপর অন্ধকার আবার মেঘের মতো ঘন হ'য়ে নেমে এল।

শিল্পী আবার ভাব্‌তে সুরু কর্‌লে। হঠাৎ তার মনে হ'ল এক-টার পর একটা—তারপর আরো একটা—এমনি করে' যদি সূতা-গুলোকে একসঙ্গে গাঁথা যায়, তবে?—মাকড়সার জালের দিকে তাকিয়ে শিল্পীর মুখ আবার আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তার যন্ত্রাগারে আবার কাঠ, বাঁশ, লোহা-লক্কড়ের হাতিয়ারগুলোর ঠোকা-ঠুকি সুরু হ'য়ে গেল। এবার সে মেতে উঠ্‌লো, সূতাগুলোকে একসঙ্গে গেঁথে তোলবার যন্ত্র তৈরীর সাধনায়।

(৭)

রাজার দরবার আজো আবার লোকের মাথায় মাথায় ভ'রে গেছে। কিন্তু একটি লোকের মুখেও আনন্দের দীপ্তি নেই—সকলের চোখের পাতাই জলের ভারে ভিজে ভারি হ'য়ে উঠেছে। রাজবৈদ্য রায় দিয়েছেন, আজও যদি রাজকন্যাকে আলোকের ভিতর টেনে না আনা যায়, তবে হাজার চেষ্টা করলেও তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। ঐ অন্ধকারের অতলেই তাঁর সমাধিক্ষেত্রও রচনা করতে হবে।

অকস্মাৎ নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে একসঙ্গে সব প্রজার করুণ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌লো—মহারাজ, আমাদের রাজ্যশ্রীকে তুমি ফিরিয়ে আনো; আলো-বাতাসহীন মৃত্যুপুরীর অন্ধকার হতে রাজ-লক্ষ্মীকে উদ্ধার ক'রে আনাই তো রাজধর্ম্ম। রাজকন্যাকে তুমি জীবন দান করো।

অশ্রু-বিহ্বল-কণ্ঠে মহারাজ উত্তর দিলেন,—বৎসগণ, আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছি। অশনের মতো, দেহের লজ্জানিবারণ কর্‌বার ভারও রাজার। আমার সে কর্ত্তব্য আমি পালন করতে পারিনি। বাপের স্নেহ নিয়ে আমি রাজকন্যাকে আলো বাতাসের ভিতর ফিরে আস্‌তে অনুরোধ করেছিলুম, কিন্তু রাজার কর্ত্তব্যের দিকে ইঙ্গিত ক'রে তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন। যে ব্রত গ্রহণ করা আমার উচিত ছিল, তিনিই সেই ব্রত গ্রহণ ক'রে রাজার পাপের প্রায়শ্চিত করছেন। লজ্জায় ক্ষোভে বেদনায় আমি আমার পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আমার মাথার মুকুট ও হাতের রাজদণ্ড আমি পরিহার করছি—তোমরা যে পার রাজ্যের এ মহা সঙ্কটে তাকে উদ্ধার ক'রে এ সিংহাসন গ্রহণ কর।

সংক্ষুব্ধ জনতা চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—রাজকন্যার কাছে আমাদের নিয়ে চল রাজা, আমরা তাঁর দুয়োরে হত্যা দিয়ে তাঁকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আস্‌ব।

কান্নার মতো ম্লান হেসে মহারাজা বল্‌লেন—বেশ, তাই চল, তোমাদের আনন্দ-শ্রীকে তোমরাই ফিরিয়ে নিয়ে এস।

(৮)

স্রোতের ধারা যেমন ক'রে পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ কেটে ছুটে চলে, জনতার স্রোত রাজপুরীর আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে তেম্‌নি ক'রে ছুটে চল্‌লো সেই রাজান্তঃপুরের অভিমুখে। রাজকন্যার রুদ্ধ দরজার উপর সেই ব্যথিত শোকবিদ্ধ জনতা বন্যার উচ্ছ্বাসের মতো ফেটে প'ড়ে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌লো—রাজকন্যা, তোমার শ্রী কল্যাণে করুণায় উদ্ভাসিত, প্রজার প্রাণের আনন্দ-স্পন্দন তুমি! আমরা যে

আলো বাতাস অজস্র ভোগ কর্‌ছি, সেই আলো বাতাস হ'তে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে মৃত্যুর তুষার-শীতলস্পর্শে শীতের ফুলের মতো তুমি পলে পলে শুকিয়ে উঠে ঝ'রে পড়্‌বে, সে তো আমরা সইতে পার্‌ব না। আমরা এসেছি আলোর ভিতর বাতাসের ভিতর, প্রকৃতির প্রাচুর্য্যের ভিতর তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—তুমি বেরিয়ে এস!

বীণার তারে ওস্তাদ বীণ্‌কার ঘা দিলে তার ভিতর হ'তে যেমন সুরের ছন্দ নেচে ওঠে, ঘরের ভিতর হ'তে কণ্ঠস্বরে বীণার ছন্দ বাজিয়ে রাজকন্যা ব'লে উঠ্‌লেন—ভাই সব, এই অন্ধকার, এই আলো-বাতাসহীন কারাকক্ষ আমার কাছেও অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি সেই কতকাল হতে উন্মুখ হ'য়ে ব'সে আছি তোমাদের এই আহ্বানের প্রতীক্ষায়। আজ তোমরা আমার দ্বারে এসেছ—জীবনের আশায়, জীবনের অপেক্ষাও বড় পণরক্ষার উল্লাসে আমার বুক ভ'রে উঠেছে। কিন্তু কৈ, এখনো তো তোমরা আমাকে আমার মুক্তির পণ চুকিয়ে দিলে না? আমাকে আমার দেহের আচ্ছাদন দাও—আমাকে পণ-মুক্ত ক'রে তোমাদের ভিতর, তোমাদের হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আলো গানের ভিতর ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

সংক্ষুব্ধ জনতার বেদনা-ভরা-[illegible] [illegible]শ্রুর বন্যায় আর্দ্র হয়ে উঠ্‌লো। অক্ষমতার লজ্জায় মাথা নত ক'রে তারা বল্‌লে—পারিনি বহিন, তোমার পণের কড়ি আমরা সংগ্রহ কর্‌তে পারিনি। জীবন দিতে বলো, তোমার জীবন বাঁচাবার জন্যে এই দুয়োরের গোড়ায় গোটা রাজ্যের জীবন আমরা ধূলিমুষ্টির মতো লুটিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু যা' তোমাদের শক্তিতে কুলোয় না, বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, তোমার পণ যে

সেই অসাধ্য সাধনের পিছনে ছুটে চলেছে—এ পণ তুমি পরিহার কর, রাজকন্যা।

হতাশ-ম্লান কণ্ঠে রাজকুমারী বল্‌লেন—ভাই সব, তোমরা ফিরে যাও। ঐ আলো, ঐ বাতাস, যা যুগ যুগ ধ'রে জীবনের রসদ যুগিয়ে চলেছে, তার ভাণ্ডার তোমাদের অক্ষয় হোক্, তোমরাই তা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ কর। আর এই অন্ধকারের অতলে, আলো-বাতাসের স্পর্শহীন রাজ্যে, সমস্ত আশার সঙ্গে আমার বিড়ম্বিত জীবনের সমাধি হোক্। কিন্তু এ কথাও আমি তোমাদের জানিয়ে রাখি যে, মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি ক্ষোভ আমার সমস্ত চেতনাকে দগ্ধ করবে। সে ক্ষোভ এই যে, এত বড় শিল্পদেবতার সন্তান হ'য়েও এ রাজ্যে এমন শিল্পী একজনও জন্মাল না, যে তাঁর ইঙ্গিতকে অনুসরণ কর্‌বার ক্ষমতা রাখে। দুনিয়া জ্ঞানের পথেই ছুটে চলেছে। সে শিল্পী এক দিন নিশ্চয়ই আস্‌বে, যে নরনারীর যোগ্য আবরণ খুঁজে বের কর্‌বে—কিন্তু সে গৌরব আমার দেশের ভাইদের লাভ কর্‌বার শক্তি হ'লো না!

দূরে দৈববাণীর মতো সরল নির্ভীক ঋজু কণ্ঠস্বরের সাড়া ভেসে উঠলো—তোমার রাজ্য এখনো দেউলে হ'য়ে যায়নি, রাজকন্যা! মানুষের দেহের লজ্জার আবরণ যোগাবার গৌরব তোমারি ললাটে যুগ যুগ ধ'রে জয়ের মাল্য রচনা কর্‌বে। গ্রহণ করো তোমার পণের অর্ঘ্য। এই আচ্ছাদনে দেহ আবৃত ক'রে সমস্ত রাজ্যের মনের আলো-বাতাসের দেবতা তুমি, ধরার আলো-বাতাসের ভিতর বেরিয়ে এস—আমার শিল্প-সাধনা সার্থক হোক্।

ধীরে ধীরে শিল্পী এগিয়ে এসে জানালা গলিয়ে রাজকন্যার অন্ধকা-

কক্ষের ভিতর তাঁর দীর্ঘ সাধনার সম্পদ নিক্ষেপ কর্‌লেন। বিহ্বল জনতার লক্ষ নয়ন শিল্পীর দীর্ঘ ঋজু দীপ্ত দেহের দিকে ন্যস্ত হ'লো।

কার্পাশের তুলায় শিল্পীর সাধনা যে বস্ত্র রচনা করেছিল, তনু দেহখানি তা'তেই আবৃত ক'রে রাজকন্যা দীপ্ত দীপশিখার মতো বেরিয়ে এলেন সেই হতবাক্ জনতার সাম্‌নে ;—তারপর নতজানু হয়ে শিল্পীর সম্মুখে ব'সে প'ড়ে তিনি বল্‌লেন,—হে শিল্পের দেবতা, আমার সাধনা তোমার হাতে মূর্ত্তি লাভ করেছে—তুমি আমাকে নাও—আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

পরিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় তপঃকৃশ অপূর্ব্ব সুন্দর তরুণদীপ্ত রাজকন্যার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিল্পী বল্‌লেন—হয়নি রাজকুমারী, হয়নি—আমার সাধনা সার্থক হয়নি। ঐ পুষ্পের মতো পেলব তনু-লতাকে বেষ্টন কর্‌বার জন্যে যে আচ্ছাদন দরকার, আমার রূঢ় কর্ক্কশ হাতে তার সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তুমি আমার সাধনাকে পূর্ণতা দান করো। কার্পাশের তুলাকে সূতার মত সূক্ষ্ম, সরু, ও মসৃন ক'রে তোমার উপযোগী আচ্ছাদন আমার যন্ত্রের সাহায্যেই তুমি তৈরী ক'রে নাও।

রাজকন্যা লজ্জিত হাস্যে উত্তর দিলেন—আমি আবার শপথ কর্‌ছি শিল্পী, আমার এই বাহু তোমার শিল্প-সাধনা সম্পূর্ণ ক'রে তোল্‌বার কাজেই উৎসর্গিত হবে।

শিল্পী ধীরে ধীরে আনন্দ ও সঙ্কোচের সঙ্গে রাজকন্যার বাহুলতা নিজের দৃঢ় সবল করতলের ভিতর গ্রহণ কর্‌লেন।

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়।

ঝরণা ঝারা।

—:০:—

ঝরঝর ঝরণা　　গিরি ঘরকরণা—
জ্বলজ্বল উজ্জ্বল　　যেন কালো কজ্জল,
কভু সাদা ধব্‌ধব্‌　　তুষারের উদ্ভব,
উঁচু হ'তে নীচুতে　　না টলিয়া কিছুতে,
তুহিনের নির্ঝর　　দিন রাত ঝর্ঝর
ঝরঝর ঝরছে　　ধারা নাহি ধরছে।

হরদম হরদম　　ধূলা বালি কর্দ্দম
লতা পাতা কুট্‌কাট্‌　　চলে করে' লুট্‌পাট,
ফুরসুৎ নাই তার,　　বিদ্যুৎ ভাই তার,
হিম জল-অঞ্চল　　অবিরল চঞ্চল,
কিঙ্কিনী কঙ্কন　　রামধনু রং কোন্‌!
বালা আর চুড়ীতে　　বাজে শিলা মুড়িতে,
খেলিতেছে ঝম্পাই　　আঁস্‌মান কম্পাই।

শিখরীর উচ্চে　　চমরীর পুচ্ছে,
আষাঢ়ের ঘটাতে　　সিংহের জটাতে,
নামে মহা ঝম্পে　　হরিণের লম্ফে,
ধর ধর ধর ধর　　কই ঘর, সর সর—
আর নাই, আর নাই　　ঘর বা'র তার নাই,

আঁকাবাঁকা ভঙ্গী শেয়ালের সঙ্গী,
ফিরে' ফিরে' চমকায় মাঝে মাঝে ধমকায়,
গাছে গাছে দোল খায় শিলাতলে টোল খায়,
পাকে পাকে লুট্‌ছে তবু ফিরে' ছুট্‌ছে।

সাপ সাপ, ঐ সাপ— সর্ সর্ বাপ বাপ!
সাপ নয়, সাপ নয় বরফেরও ধাপ নয়।
ওযে সেই ঝরণা গিরি ঘরকরণা—
ওযে মোর ঝরণা আপ্‌নার, পর না!

চিকমিক ঝিকমিক রবিকরে ধিক দিক,
ঝিকমিক চিকমিক কিছু ওর নাই ঠিক,
ঝম ঝম ঝম ঝম এযে দেখি কম কম,
কই কই, কোথা গেলা ইঁচা বাচা চাঁদা চেলা—
ঐ গেল সরিয়া গিরি মাঝে মরিয়া!

ঐ ফের আলোতে সাদাতে ও কালোতে
ফুঁসিয়া ও ফাঁপিয়া কাঁপাইয়া কাঁপিয়া,
ফেনাময় মস্‌গুল বেল যুঁই কাশ ফুল—
কি ভীষণ তর্জ্জন মাঝে মাঝে গর্জ্জন,
ফ্যাস্ ফ্যাস্ ভক্ ভক্ শাঁকচুন হাঁস বক
ফিস্ ফিস্ ফস্ ফস্ বেটী কারো নয় বশ,
দুর্ম্মদ গতিতে পতিতের মতিতে,
খেয়ালে আনন্দে 'পাগলামি ছন্দে,
তড়বড় দড়বড় পার বুঝি হয় গড়,
উৎরায় উৎরাই কোথা কোন খুঁৎ নাই,

হরদম হরদম ছুটে' চলে দুর্দ্দম,
কম কম, থম থম ঐ বুঝি লয় দম—
এইবার পাহাড়ে ঠেকে বুঝি ডাহা রে।

তার পর তার পর বা'র কর বা'র কর
চলিবার ফন্দী ক্ষণিকের সন্ধি—
পাশ কেটে এইবার হয় দেখি দুই ধার,
কই কই, সর্ সর্ দুধ দই ক্ষীর সর—

গদ্ গদ্ গদ্ গদ্ চলে যেন তদ্বৎ,
বুদ্ বুদ্ বুদ্ বুদ্ কেটে চলে বুদ্বুদ,
কল কল তলতল আঁখি দেখি ছল ছল,
চোখে বুঝি আসে জল বল্ বল্ ঠিক বল্;
থাম্ থাম্, আর না থামা তোর কান্না—
ঐ দেখ গঙ্গা তরলতরঙ্গা;
বিলিয়ে দে আপনায় থাক্‌বেনা ভাবনাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মঁস্যো পিজনো।

(আনাতোল ফ্রাঁসের ফরাসী হইতে)

সবাই জানে আমি আমার সমস্ত জীবন মিশরীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনায় উৎসর্গ করিয়াছি। যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ বছর ধরিয়া এই পথে সসম্মানে অগ্রসর হইয়াছি; আজ এর জন্য আফ্‌শোষ করিতে বসিলে আমাকে যথার্থই স্বদেশের প্রতি, আমার আলোচ্য বিদ্যার প্রতি, এমন কি নিজের প্রতি অকৃতজ্ঞ পদবাচ্য হইতে হইবে। আমার শ্রমস্বীকার নিষ্ফল হয় নাই। আত্মপ্রশংসা না করিয়াও বলিতে পারি যে মৎপ্রণীত Mémoire sur un manche de miroir égyptien, du musèe du Louvre* বইখানি প্রথম উদ্যমের শ্রেণীভুক্ত হইলেও আধুনিক কালে সাগ্রহে অধীত হইয়া থাকে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সেরাপেওঁ খনন কালে যে ব্রঞ্জ্ ওজন পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে মৎকৃত অতি বিস্তৃত গবেষণার উল্লেখ অবহেলা করিলে অসৌজন্য প্রকাশ পাইবে, কারণ উক্ত গবেষণার ফলেই Institut-র দ্বার আমার জন্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

এ বিষয়ে আমার গবেষণা বহু নবীন সহকর্ম্মীগণের নিকটে যেরূপ সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে, তাহাতে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রলুব্ধ হইয়া আমি একখানি গ্রন্থে টলেমী ও লেটের রাজত্বকালে (৮২-৫২) আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে ব্যবহৃত সকলপ্রকার ওজন ও তৌলপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাই। কিন্তু শীঘ্রই আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম যে, এরূপ কোন সাধারণ বিষয় যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা

* Louvre মুজিয়মে রক্ষিত একটি মিশরী আরসীর হাতল সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

আলোচিত হইতে পারে না, এবং গভীর বিষয়াদি লইয়া যে বিজ্ঞানের কারবার, তাহাকে এইরকম বিষয়ের আলোচনায় নাবাইবার দুঃসাহসের ফল উদ্ভট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বুঝিতে পারিলাম যে, এককালে বহু বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া আমি পুরাতত্ত্ব আলোচনার মূল সূত্র সকল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। আজ আমার এই ভুল স্বীকার করিবার, ও যে অচিন্তনীয় উৎসাহফলে অসংযত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলাম তাহা জানাইবার উদ্দেশ্য তরুণ কর্ম্মীগণের উপকার সাধন, যাহাতে তাঁহারা আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কল্পনাকে জয় করিতে শিখেন। কল্পনাপ্রবৃত্তি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী শত্রু। যে পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় কল্পনাপ্রবৃত্তিকে গলা টিপিয়া মারিতে পারেন নাই, তাঁহার গবেষণায় কৃতকার্য্য হইবার আশা বৃথা। আমার কল্পনাশীল চিত্ত যে গভীর গহ্বরে আমাকে নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করে, সে কথা মনে করিলে আমি এখনও কম্পিত হই; লোকে যাহাকে ইতিহাস বলে, তাহার ও আমার মধ্যে দুই আঙ্গুলমাত্র ব্যবধান ছিল। কি ভয়ানক অধোগতি! আমি প্রায় আর্টে নামিয়া পড়িয়াছিলাম। ইতিহাস আর্ট ছাড়া কিছুই নহে; নেহাৎপক্ষে ভ্রষ্ট সায়ান্স্ মাত্র। আজ কে না জানে যে, যেমন জ্যোতির্ব্বিদের আগে গণক, রসায়ণবিদের আগে অপরসায়ণবিদ্ মানুষের আগে বাঁনর বর্ত্তমান ছিল, তেমনি পুরাতত্ত্ব-বিদের আগে বর্ত্তমান ছিল ঐতিহাসিক? ভগবান রক্ষাকর্ত্তা! আমি সভয়ে পলায়ন করিয়াছি।

কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, আমার তৃতীয় গ্রন্থ পণ্ডিতোচিত ভাবেই লিখিত হয়। এটি একটি ইতিবৃত্ত; নাম, De la toilette d'une égyptienne, dans le moyen empire, d'aprés une

peinture inédite.* কোনপ্রকারে ভুলপথে পা না পড়ে, এইরূপ সতর্কভাবে আমি উক্ত বিষয়ের আলোচনা করি। গ্রন্থে একটিও সাধারণ মতের অবতারণা করি নাই; যে সমস্ত ভাব, তুলনামূলক সমালোচনা ও মতের অবতারণা স্ব স্ব গ্রন্থে করিয়া আমার কোন কোন সহযোগী অতি চমৎকার আবিষ্ক্রিয়ার ব্যাখ্যারও সৌন্দর্য্যহানি ঘটাইয়া থাকেন, তাহা আমি পরিহার করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু এমন সুচিন্তিত গ্রন্থেরও এমন অদ্ভুত পরিণতি কি করিয়া হইল? ভাগ্যের কি পরিহাসের ফলে এমন গ্রন্থও আমার মনের অতি অভাবনীয় যত ভুলের কারণস্বরূপ হইয়া পড়িল?—যাক্, এ সব পরবর্ত্তীকালের ঘটনা; আগে হইতে সে সকল কথা বলিব না. ঘটনার তারিখ গোলমাল করা ঠিক নহে। আমার এই ইতিবৃত্ত পাঁচটি পরিষদের এক সম্মিলিত বৈঠকে পঠিত হইবে স্থির হয়; এই সম্মান অধিকতর আদরনীয় এই কারণে যে, এ ধরণের লেখার পক্ষে তাহা দুর্লভ। কয়েক বছর হইল এই সকল পরিষদ-বৈঠকে সৌখীন শ্রেণীর লোকের ঘন ঘন যাতায়াত সুরু হইয়াছে।

আমার বক্তৃতা হইবার নির্দ্ধারিত দিনে সভা-গৃহ এইরূপ সৌখীন শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুসংখ্যক মহিলা উপস্থিত হইলেন; গ্যালারীগুলিতে সুন্দর মুখ ও উজ্জ্বল পোষাক দীপ্তি পাইতে লাগিল। সকলে শ্রদ্ধাসহকারে আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সাহিত্যিক চুট্‌কী সাধারণতঃ যেরূপ নির্ব্বোধ ও উচ্চ প্রশংসা লাভ করে, সেরূপ কোন হট্টগোল দ্বারা আমার

---

* একটি অপরিচিত চিত্র হইতে মধ্য সাম্রাজ্যের মিশরী নারীর বেশভূষা সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ।

বক্তৃতা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। যেরূপ প্রকৃতির বিষয় শ্রোতৃবর্গের নিকট ব্যাখ্যাত হইতেছিল, তাঁহারা যথার্থই তাহার উপযোগী ভাবই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে মনোযোগ ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল।

বক্তৃতার মধ্যে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনকালে পার্থক্য রক্ষার্থে যে বিশ্রামচিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার অবকাশে সমস্ত কক্ষটি আমার চশমার উপর দিয়া মনোযোগসহকারে দেখিয়া লইবার সুযোগ পাইতেছিলাম। আমি বেশ বলিতে পারি যে, ওষ্ঠে ওষ্ঠে চপল হাসি খেলাইয়া বেড়াইতে দেখি নাই। বরং বিপরীত! সব চেয়ে কচি কচি মুখগুলিতেও গভীর গাম্ভীর্য্য বিরাজিত। আমার মনে হইল যেন যাদুমন্ত্রবলে সমস্ত কাঁচা মনকে আমি পাকাইয়া দিয়াছি। আমার বক্তৃতা পাঠকালে মাঝে মাঝে দুই একজন যুবক তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তিনীগণের কানে মৃদুস্বরে কি বলিতেছিল। আমার ইতিবৃত্তে উল্লেখিত কোন বিশেষ ব্যাপারই যে তাহাদের কথোপকথনের বিষয় ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কি সৌভাগ্য! বাইশ তেইশ বছরের একটি সুন্দরী তরুণী উত্তর গ্যালারীর বাম কোণে বসিয়া মন দিয়া বক্তৃতা শুনিতে ও নোট টুকিয়া লইতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার মুখের প্রতি রেখাটির সুস্পষ্ট ভঙ্গী ও ভাবব্যঞ্জনার স্ফুর্ত্তি বাস্তবিক আশ্চর্য্য। আমার কথা মন দিয়া শুনিবার যে ভঙ্গী তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব মুখাবয়বের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে লোক ছিল। আসিরীয়া দেশের রাজগণের ন্যায় কুঞ্চিতশ্মশ্রু ও দীর্ঘ কৃষ্ণ-কেশধারী, দীর্ঘ ও দৃঢ়কায় এক ব্যক্তি তাঁহার পাশে বসিয়াছিল, এবং

মাঝে মাঝে নিম্নস্বরে দুই একটি কথা তাঁহাকে বলিতেছিল। আমার মন প্রথমে সমস্ত শ্রোতৃবর্গের উপরে বিস্তৃত থাকিলেও, ক্রমশঃ তাহা উক্ত তরুণীর উপরেই সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার যেরূপ কৌতূহল হইয়াছিল, আমার কোন কোন সহযোগীর মতে তাহা আমার মত বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু আমি বলিতে পারি যে, এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে তাঁহারাও আমাপেক্ষা বেশী উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। আমার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একখানি ছোট পকেট-নোটবহিতে আঁচড় কাটিয়া যাইতে লাগিলেন; দেখিয়া মনে হইল যে, আমার বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে পরস্পরবিরোধী নানা ভাব তাঁহার মনের মধ্যে দিয়া বহিয়া যাইতেছে,—সন্তোষ ও আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্চর্য্য ও অস্বস্তির ভাব পর্য্যন্ত। প্রবর্দ্ধমান কৌতূহলের সহিত আমি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আজ মনে হইতেছে সেদিন ঐ সভাগৃহে তাঁহাকে না দেখিলেই ভাল হইত!

প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলাম; আর পঁচিশ কি বড় জোর ত্রিশ পাত পড়িতে বাকী ছিল, এমন সময় আমার দুই চোখ ঐ আসিরীয় দাড়ীওয়ালার চোখের সঙ্গে মিলিত হইল। তারপরে যাহা ঘটিল আমি নিজেই তাহা বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং কি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিব? এই মাত্র বলিতে পারি যে, ঐ ব্যক্তির দৃষ্টি এক নিমেষের মধ্যে আমাকে এক অভাবনীয় বিপদের মধ্যে ফেলিল। যে চোখের দৃষ্টি এইরূপে আমার প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার দুই তারকা স্থির ও ফিকে সবুজ রংয়ের। আমার নিজের চোখ আর

ফিরাইয়া লইবার শক্তি ছিল না। আমি মুখ বন্ধ করিয়া "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি চুপ করিতেই হাততালি আরম্ভ হইল। তাহা থামিলে পুনরায় বক্তৃতা করিতে প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ঐ দুইটি প্রজ্জ্বলিত আলোর প্রতি অজ্ঞাত কারণে নিবদ্ধ আমার চোখ দুটিকে কোন মতে সরাইতে সক্ষম হইলাম না। শুধু তাই নয়। ততোধিক অভাবনীয় ঘটনাক্রমে আমার আজীবন অভ্যাসের ব্যতিক্রম করিয়া মৌখিক বক্তৃতা জুড়িয়া দিলাম। ঈশ্বর জানেন সেটা কতখানি অনিচ্ছাকৃত! এক অদ্ভুত, অজ্ঞাত অদম্য শক্তির তাড়নায় আমি যুগে যুগে প্রচলিত স্ত্রীলোকের বেশবিন্যাসের দার্শনিক তাৎপর্য্য তন্ময় হইয়া সুসঙ্গত ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম, তথ্যবিবৃতি ছাড়িয়া সাধারণ মত প্রকাশ করিতে লাগিলাম, কবিত্ব দেখাইতে লাগিলাম,—ভগবান আমায় ক্ষমা করুন,—নারীর রূপ লুকাইয়া রাখিবার সুগন্ধী অবগুণ্ঠনের চতুঃপার্শ্বে সঞ্চরণ-শীল মৃদু পবনের সহিত চির অশান্ত কামনাকে তুলনা করিয়া "চিরন্তন নারী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ফেলিলাম।

আমি যখন বলিয়া যাইতেছি, আসিরীয় দাড়ীওয়ালা লোকটি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়াই ছিল। অবশেষে সে দুই চোখ নত করিল, আর আমিও থামিয়া গেলাম। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই মৌখিক বক্তৃতাটুকু আমার স্বকীয় প্রেরণার বহির্ভূত এবং বৈজ্ঞানিক মনের বিরুদ্ধ হইলেও সোৎসাহ প্রশংসাধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইল। উত্তর দিকের গ্যালারীতে উপবিষ্টা তরুণী হাততালি দিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

আমার পরে একাডেমীর একজন সভ্য বক্তৃতামঞ্চে উঠিলেন;

আমার বক্তৃতার পরে বক্তৃতা করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে কিছু যেন বিমর্ষ বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার অতটা ভয়ের বোধহয় কোন কারণ ছিল না। তিনি যাহা পড়িলেন তাহা শ্রবণকালে কাহারো বিশেষ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে দেখা যায় নাই; আমার যতদূর মনে পড়িতেছে তাঁহার বক্তব্য যেন পদ্যে লিখিত হইয়াছিল।

বৈঠক শেষ হইলে কয়েকজন সহযোগীর সঙ্গে আমি সভাগৃহ: ত্যাগ করিলাম, তাঁহারা নূতন করিয়া আমার বক্তৃতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ প্রশংসা আন্তরিক বলিয়া গ্রহণ করাই আমার অভিপ্রায় ছিল।

সিঁড়ির উপর, ব্রোঞ্জার সিংহমূর্ত্তির কাছে দুই একটি পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে করমর্দ্দন করিবার জন্য দাঁড়াইতেই দেখিলাম যে, ঐ অ[illegible]ীয় দাড়ীওয়ালা ব্যক্তি ও তাহার সুন্দরী সঙ্গিনী গাড়ীতে উঠিতেছেন। ঐ সময়ে ঘটনাক্রমে আমি একজন নামী বাগ্মী দার্শনিকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি নাকি পার্থিব সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সমান অভিজ্ঞ। তরুণী গাড়ীর জানালা দিয়া স্বীয় সুগঠিত মস্তক ও ক্ষুদ্র হস্ত বাহির করিয়া নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন ও ঈষৎ ইংরেজী উচ্চারণে তাঁহাকে বলিলেন,—

—"বেশ ত, আপনি ভুলে গেছেন আমাকে, ভারি অন্যায়!"

গাড়ী চলিয়া গেলে আমার বিখ্যাত বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ সুন্দরী তরুণী ও তাহার সঙ্গীটি কে? তিনি বলিলেন—

"কিরকম! আপনি মিস্ মরগান ও তাঁহার চিকিৎসক দাউদকে চেনেন না? ঐ ডাক্তার ম্যাগ্নেটিস্‌ম্, হিপ্নোটিস্‌ম্ ও চিন্তাশক্তি দ্বারা সবরকম অসুখের চিকিৎসা করে। আনি মরগান

সিকাগোর সব চেয়ে ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ে, দু' বৎসর হ'ল সে তার মায়ের সঙ্গে পারীতে এসেছে ও চমৎকার বাড়ী তৈয়ের ক'রে বাস ক'রছে। মেয়েটি সুশিক্ষিতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমতী।"

আমি বলিলাম "আপনার কথা শুনে বিশেষ আশ্চর্য্য হলেম না। এর মধ্যেই আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, এই আমেরিকান তরুণী অত্যন্ত চিন্তাশীলা বটেন।"

আমার খ্যাতনামা সহযোগী একটু হাসিয়া আমার করমর্দ্দন করিলেন।

আমি আমার রাস্তার মোড়ে আসিয়া পড়িলাম। এইখানে একটা সামান্যরকমের বাড়ীতে আমি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছি। বাড়ীর ছাদ হইতে Luxembourg উদ্যানের বৃক্ষচূড়া চোখে পড়ে। গৃহে ফিরিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

তিনদিন ধরিয়া অধ্যবসায়সহকারে কার্য্যে মন দিলাম। সম্মুখে মার্জ্জারমুখী পাস্ট্ দেবীর ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তির অঙ্গে একটি অনুলিখন আছে, মঃ গ্রেবো উহা পরিষ্কার বুঝিতে পারেন নাই। আমি ঐ বিষয়ে একটি সটীক বক্তৃতা প্রস্তুত করিতেছিলাম। যতখানি ভয় করা গিয়াছিল Institut-র ঘটনা আমার মনে ততখানি গভীর চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া যাইতে পারে নাই; ঐ কথা মনে করিয়া আমি তেমন বিব্রত বোধ করিতেছিলাম না। সত্য বলিতে কি, আমি উহার কথা কতকটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, নূতন কোন ঘটনা না ঘটিলে উহার স্মৃতি আর পুনর্জ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই তিন দিনে আমার বক্তৃতা ও টীকা শেষ করিয়া আনিবার মত অবকাশ বেশ পাওয়া গেল। পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে বিশ্রাম লইতাম কেবল পত্রিকাদি পড়িবার সময়, সেগুলি সমস্ত

আমার প্রশংসায় পূর্ণ। যে-সব পত্রিকার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কোন পরিচয় নাই, সেগুলিও আমার ইতিবৃত্তের "মধুরেণ সমাপয়েৎ" স্বরূপ পরিশিষ্টটুকুর তারিফে মুখর। উহাদের মন্তব্যের এই সুর,—"জিনিষটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত; মঃ পিজনোর নিকটে ইহা পাইয়া আমরা এককালে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি।" এই সকল তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখ কেন যে করিতেছি বলিতে পারি না, কারণ মুদ্রাযন্ত্রে আমার সম্পর্কীয় আলোচনার বিষয় আমি সম্পূর্ণ উদাসীন।

তিন দিন আমার ঘরে এইরূপে আবদ্ধ থাকিবার পর দরজার ঘণ্টা বাজিবার শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। ঘণ্টার দড়ি টানিবার মধ্যে আদেশব্যঞ্জক, অদ্ভুত ও অজ্ঞাতপূর্ব একটা ধরণ ছিল, তাহা আমাকে সংশয়ান্বিত করিয়া তুলিল; অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমি নিজেই দরজা খুলিতে গেলাম। সিঁড়ির মাথায় এ কে?—আমার সেদিনকার প্রবন্ধের অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোত্রী আমেরিকান তরুণী মিস্ মরগান স্বয়ং!

—মঁস্যো পিজনো?

—আমিই তিনি।

—সে সবুজে হাতা-ওয়ালা কোটটা গায়ে না থাক্‌লেও আপনাকে আমি খুব চিন্‌তে পেরেছি, তা দেখুন, আমি এসেছি ব'লে দয়া ক'রে সেটা আর পর্‌তে যাবেন না। এই পোষাকে থাক্‌লেই আপনাকে আমার বেশী ভাল লাগবে।

তাঁহাকে আমার ঘরে লইয়া গেলাম। তিনি একবার কুতুহলী দৃষ্টিতে ঘরের মেঝে হইতে চাদ পর্য্যন্ত স্তূপীকৃত নানাপ্রকার ভূর্জ্জপত্র, শীলমোহর, মূর্ত্তি ইত্যাদির দিকে চাহিলেন, নিস্তব্ধ ভাবে

কয়েক মুহূর্ত্ত আমার টেবিলের উপরিস্থিত পাসৃট্-দেবীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন ; অবশেষে বলিলেন,—

—এটি ত চমৎকার !

—মাদামো'জেল কি এই ছোট মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে কথা বলিতে ইচ্ছা করেন ? এর অনুলিখন সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে যা' শোনবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু আমার এখানে আপনার পদধূলি দেবার কারণ কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি ?

—ওঃ ! অনুলিখনের বিশেষত্ব আমার কাছে হাস্যকর বলে' মনে হয়। এই মূর্ত্তির বিড়াল অবয়বটির খোদাই চমৎকার। আচ্ছা, মঁস্যো পিজনো, এটি যে সত্যি একটি দেবী, আপনি তা' নিশ্চয় বিশ্বাস করেন ?

আমি এইরূপ অনিষ্টকর অপবাদ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইলাম। বলিলাম,—এরূপ বিশ্বাস পৌত্তলিকতার পরিচায়ক।

তাঁহার বড় বড় দুটি সবুজে চোখের বিস্ময়সূচক দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল।

—বটে ! আপনি পৌত্তলিক ন'ন ? আমি ভাবতেম পৌত্তলিক না হ'লে কেউ পূরামাত্রায় তত্ত্ববিদ্ হ'তে পারে না। পাস্‌ট্‌কে যদি আপনি দেবী ব'লে বিশ্বাস না করেন, তবে তাঁর বিষয়ে আপনার আগ্রহ কিসের জন্য ?—সে কথা যাক্। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি একটা বিশেষ জরুরী কাজের জন্য।

—বেশী দরকারী কি ?

—হাঁ, একটা পোষাক সম্বন্ধে। আমার দিকে চে'য়ে দেখুন।

—সানন্দে।

—আচ্ছা, আমার মুখের চেহারায় আপনি কুশিৎজাতের কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না ?

আমি হাঁ করিয়া রহিলাম। এ প্রকার আলাপ আমার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে।

—এতে অবাক হবার কিছুই নেই। আমার মনে পড়ে আমি মিশরী ছিলেম। আপনিও মিশরী ছিলেন না কি মঁস্যো ? কিছুই মনে পড়ে না আপনার ? আশ্চর্য্য বটে ! আচ্ছা, আমরা যে ক্রমাগত দেহ হতে দেহান্তর গ্রহণ করি, সে বিষয়ে আপনার নিশ্চয় সন্দেহ নেই ?

—এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ, মাদামো'জেল্।

—আপনি যে আমাকে অবাক্ ক'রে দিলেন, মঁস্যো পিজনো।

—মাদামো'জেল, এখানে আপনার পদধূলি পড়বার কারণ......

—ঠিক কথা, এখনও আপনাকে বলা হয় নাই যে, কঁতেস্ N-এর ফ্যান্সীড্রেস বল্ নাচের জন্য একটা মিশরী পোষাক তৈরী করবার সাহায্য চাইতে আপনার কাছে এসেছি। এই পোষাক সর্ব্বাংশে সত্যিকার মত ও খুব সুন্দর হওয়া চাই। আমি এর জন্য বহু পরিশ্রম করেছি। পুরোণো স্মৃতি মনে করে' করে' দেখেছি, কারণ এখনও আমার মনে পড়ে ছয় হাজার বৎসর আগে আমি থীব্‌সে বাস করতেম। লণ্ডন, বুলাক ও নিউইয়র্ক্ থেকে নক্সা আনিয়েছি।

—তাতেই ত জিনিষটা ভাল হ'ত।

—উঁহু, অন্তরের ভিতর যা' স্বতঃ প্রকাশিত হয়, তার চেয়ে ঠিক আর কিছুই হতে পারে না। আমি Louvre-এর মিশরী ম্যুজিয়ম্‌ও দেখেছি। কি সব চমৎকার জিনিষ সেখানে ! পাৎলা, সুছাঁদ

অঙ্গসৌষ্ঠব, অতি কোমল মুখাবয়ব, ফুলের মত চেহারার নারীমূর্ত্তিসকল, যা'তে যুগপৎ দৃঢ়তা ও কমনীয়তা কেমন ক'রে যেন প্রকাশ পাচ্ছে! আবার একটা বেস্ দেবের মূর্ত্তি আছে, যা' দেখ্‌তে সারসের মত! উঃ, সেখানে সব জিনিসই যে কি চমৎকার!

—মাদামো'জেল, আমি এখনও জান্‌তে পারিনি…

—এইখানেই শেষ করিনি। আপনার মধ্য সাম্রাজ্যের আমলে স্ত্রীলোকের বেশভূষা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে গিয়েছি, ও সে সম্বন্ধে নোট নিয়েছি। আপনার প্রবন্ধটা একটু শক্ত হয়েছিল যদিও, বুঝতে আমাকে রীতিমত লড়াই ক'র্‌তে হয়েছে। এই সমস্ত নজিরের জোরে আমি একটা পোষাক খাড়া ক'রে তুলেছি, কিন্তু সেটা এখনও ঠিক অভিপ্রায়মত হয় নি; সেটার যা' ত্রুটি আছে আপনি শুধ্‌রে দেবেন, এই অনুরোধ আপনাকে ক'র্‌তে এসেছি। কাল আমার বাড়ী একবার আসবেন, প্রিয় মঁস্যো, আপনার মিশরপ্রীতির খাতিরে নাহয় এটুকু কষ্ট করবেন। কাল আবার দেখা হবে। তাড়াতাড়ি যেতে হ'চ্ছে, মা গাড়ীতে আমার অপেক্ষায় আছেন।

শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে তিনি ছুটিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আমি পাশের ঘরে যাইতে না যাইতে তিনি সিঁড়ির তলায় পৌঁছিলেন। সেখান হইতে তাঁহার পরিষ্কার স্বর আমার কানে আসিল:—

—কাল দেখা হবে! ভিলা সাইদের মোড়ে থাকি।—আমি মনে মনে বলিলাম এই পাগলের বাড়ী কখনই যাচ্ছিনে।

পরদিন চারিটার সময় আমি তাঁহার বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়িলাম। একজন চাকর কাঁচের দরজাওয়ালা একটা প্রকাণ্ড

ঘরে লইয়া গেল ; সে ঘরে স্তূপাকার চিত্র এবং ব্রঞ্জ্ ও মার্ব্বেলের মূর্ত্তি ; বার্নিশ্‌করা সিডান-চেয়ারের উপর চীনাপাত্র ; পেরুদেশীয় মমী ; ধারটি বর্ম্মাবৃত মানুষ ও ঘোড়ার প্রতিমূর্ত্তি ; অপেক্ষাকৃত ছোট সাদা ডানাওয়ালা ও টুর্‌নামেণ্টের পোষাকপরা একটি পোল অশ্বারোহী, উষ্ণীষের উপরে মধ্যযুগের শিংওয়ালা মস্তকাবরণভূষিত এক ফরাসী অশ্বারোহী, চিত্রিত ও ঘোমটাঢাকা এক স্ত্রী-মস্তক। ঘরের ভিতর খেজুর গাছের যেন একটা আস্ত বন গজাইয়াছে, তাহার মাঝখানে এক বিশাল স্বর্ণ বৌদ্ধ মূর্ত্তি আসীন ; ঐ দেবতার পাদমূলে বসিয়া ময়লা পোষাকপরা এক বৃদ্ধা বাইবেল পাঠ করিতেছে। এই অসংখ্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিয়া আমি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া আছি; এমন সময় মাদামোয়াজেল মরগান হংসখচিত ড্রেসিংগাউন পরিয়া একটি লাল রংয়ের পর্দ্দা ঠেলিয়া হঠাৎ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং আমার দিকে অগ্রসর হইলেন—পাছে পাছে লম্ব-নাসিক দুইটি ডেনিস্‌ কুকুর। তিনি বলিলেন,

—আমি জানতেম মঁস্তো আস্‌বেন।

আমি অস্পষ্ট স্বরে একটা চাটু বাক্য ব্যবহার করিলাম,—এমন সুন্দরীর কথা কেমন করে অমান্য করি ?

—ওঃ! আমি সুন্দর ব'লে যে লোকে আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে না, তা নয়। আমার অনুরোধ রাখ্‌তে বাধ্য করবার কতক গুলো রহস্য আছে।

তারপর বাইবেলপাঠে নিযুক্তা বৃদ্ধাকে দেখাইয়া বললেন,—উদিকে মন দেবেন না, উনি আমার মা। আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব না। আপনি কথা কইলে উনি উত্তর নাও দিতে পারেন ; উনি

যে সম্প্রদায়ভুক্ত, তার নিয়ম হচ্ছে বাজে কথা না বলা। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা গুনচট্ পরেন, কাঠের পাত্রে আহারাদি করেন। মা এই সব আচারনিয়মের ভারি ভক্ত। যাক্, মার কথা বলবার জন্য আপনাকে আনি নি, তা' বুঝ্‌তেই পারছেন। আমি মিশরী পোষাকটা পরতে যাচ্ছি, বেশীক্ষণ লাগবে না। ততক্ষণ এই সামান্য জিনিষগুলো দেখতে পারেন।

তিনি একটা আলমারীর সম্মুখে আমাকে বসাইয়া দিলেন, তাহার ভিতর একটা মসীর আধার, মধ্য সাম্রাজ্যের আমলের কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি, কতকগুলি মূল্যবান প্রস্তরপতঙ্গ (scarabées) এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়োচিত প্রার্থনাসম্বলিত কয়েক টুকরা লিখন।

একা বসিয়া বসিয়া আমি মনোযোগসহকারে এই ভূর্জ্জ পত্রটি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, কারণ উহার মধ্যে একটি নাম আমার চোখে পড়িল, ইতিপূর্ব্বে একটা শীলমোহরে আমি তাহা দেখিয়াছিলাম, এই নাম রাজা প্রথম সেতির একজন লেখকের। তৎক্ষণাৎ এই দলিলের নানা প্রয়োজনীয় বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কত ক্ষণ যে এই কাজে ডুবিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না; হঠাৎ অনুভব করিলাম আমার পশ্চাতে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। ফিরিয়াই দেখিলাম এক আশ্চর্য্য রমণীমূর্ত্তি, মস্তকে স্বর্ণ-জালাবরণ, অঙ্গে শুভ্রবসন সংলগ্ন, তাহার ভিতর দিয়া তাহার যৌবনাঢ্য বরবপুর পরম সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট। এই বসনের উপর পাৎলা গোলাপী অঙ্গরাখাটি রত্নভূষিত কটীবন্ধ দ্বারা কটীদেশে আবদ্ধ হইয়া ঝুলিয়া সুবিন্যস্ত ভাঁজে ভাঁজে নীচে নামিয়াছে; বাহু ও পদদ্বয় অনাবৃত এবং বলয়াদি দ্বারা ভূষিত।

তিনি আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন, ডান কাঁধের দিকে মাথাটি এমন সুন্দর ভঙ্গীতে হেলাইয়া যে, তাহাতে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যে একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুরী ফুটিয়া উঠিল।

আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—একি! মিস্ মর্‌গান, আপনি? তিনি বলিলেন,—যদি না মানেন যে নেফেরু রা সশরীরে হাজির, তবে আমিই বটে। Leconte de Lisle-এর নেফেরু-রা, সূর্য্যের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জানেন?...

Voici q'uelle languit sur son lit virginal,
Très pâle, enveloppée avec des fines toiles *

কিন্তু না, আপনি জানেন না, আপনি ত কাব্যের খোঁজখবর রাখেন না। ভারি সুন্দর কবিতাটি কিন্তু...। আসুন, কাজ আরম্ভ করা যাক্।

বিস্ময় দমন করিয়া আমি তরুণীকে তাঁহার অতি চমৎকার পোষাক সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলাম। উহার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বের দিক দিয়া সামান্য যাহা ত্রুটি আছে, দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। অঙ্গুরীয়ের মধ্যে যে পাথর দেওয়া হইয়াছে, তাহা বদ্‌লাইয়া মধ্য সাম্রাজ্যের আমলে সর্ব্বদাব্যবহৃত অন্য পাথর দিবার প্রস্তাব করিলাম। পরিশেষে অঙ্গসংলগ্ন একটি বিশেষ অলঙ্কার সম্বন্ধে আমি ঘোরতর আপত্তি করিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত অলঙ্কার পরাতে নির্ম্মমভাবে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা

---

* কৌমার পালঙ্কে বালা আলসে শায়িত,
পাণ্ডু অতি, সূক্ষ্ম বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত।

হইয়াছে। উহার পরিবর্ত্তে সময়োপযোগী বহুমূল্য প্রস্তরখচিত সুবর্ণ অলঙ্কার দিবার প্রস্তাব করিলাম। তিনি অতিশয় বাধ্য মেয়েটির মত আমার কথা শুনিতে লাগিলেন, এবং আমার উপর এতটা খুসী হইয়া উঠিলেন যে, আমাকে ডিনারে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। আমার নিয়মপালন, মিতাহার ইত্যাদির কথা বলিয়া আমি অসম্মতি জানাইলাম ও বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আমি বাহিরের ঘরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—শুন্‌ছেন? আমার পোষাকটা মনোমত হয়েছে ত? কঁন্তেস্‌ N-এর বল্‌ নাচে এটা পরে' আর সব মেয়ের উপর টেক্কা দিতে পারব ত?

এরকম কথা শুনিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কিন্তু পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র আবার তাঁহার মোহে অভিভূত হইলাম।

তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—মঁস্যো পিজনো, আপনি ভারি ভাল লোক। আমাকে একটা গল্প লিখে দিন, আমি আপনাকে খুব, খুব, খুব ভালোবাস্‌ব।—আমি আমার অক্ষমতা জানাইলাম।

তাঁহার সুন্দর দুই কাঁধ তুলিয়া তিনি বলিলেন—যদি গল্প তৈরী করাই না যাবে, তবে আর বিজ্ঞানের সার্থকতা কি? আপনি নিশ্চয়ই একটা গল্প লিখে দেবেন।

আবার অস্বীকার করা নিরর্থক হইবে বুঝিয়া আমি নীরবে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

দরজায় দেখা হইল সেই আসিরীয় দাড়ীওয়ালা লোকটা, ডাক্তার দাউদের সঙ্গে, যাহার দৃষ্টি Institut-এ আমার অভূতপূর্ব্ব বিপদের

কারণ হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত সাধারণ লোক বলিয়া বোধ হইল। এই সাক্ষাৎ আমার মোটেই ভাল লাগিল না।

কঁতেস্ N-এর গৃহের বল্ নাচ আমার এই সাক্ষাতের প্রায় দিন পনেরো পরে। মিস্ মর্গান নেফেরু-রার পোষাকে এক অভিনব উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, খবরের কাগজে পড়িয়া বিশেষ বিস্মিত হইলাম না।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের অবশিষ্টাংশে তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনি নাই। নব বৎসরের প্রথম দিনে আমার ঘরে বসিয়া লিখিতেছি, এমন সময় একজন ভৃত্য একখানি চিঠি ও একটি ঝুড়ি লইয়া উপস্থিত।

—মিস্ মর্গান পাঠাইয়াছেন, এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ঝুড়িটা আমার টেবিলের উপরে রাখা হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে একটা মিউ মিউ শব্দ আসিতেছিল। উহা খুলিতেই একটি ছোট কটা বিড়াল বাহির হইয়া পড়িল।

এটি অঙ্গোরাদেশীয় বিড়াল নহে, একরকম প্রাচ্যজাতীয়; আমাদের দেশীয় অনেক বিড়ালের তুলনায় অতি হালকা, এবং আমার মনে হইল থীব্সের মাটির নীচের ঘরগুলিতে যেরকম বিড়ালের 'মমী' প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকটা সেই জাতের। প্রথমে সে গা-ঝাঁকানি দিল, তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর গা-মোড়া দিল, তারপর হাই তুলিল, তারপর ঘর্ ঘর্ স্বরে আমার টেবিলের উপরের সুগঠিতা তীক্ষ্ননাসিকা পাস্টুদেবীর অঙ্গে গা ঘষিতে লাগিল। কটা রং ও ক্ষুদ্র লোমবিশিষ্ট হইলেও তাহার চেহারায় লালিত্য ছিল; তাহাকে দেখিয়া বুদ্ধিমান বলিয়া মনে

হইল, এবং আচরণে তেমন অসভ্য বলিয়া বোধ হইল না। এরকম অদ্ভুত উপহার পাঠাইবার কি কারণ থাকিতে পারে ভাবিয়া পাইলাম না। মিস্ মর্গানের পত্রও এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করিল না। চিঠিখানি এইরূপ—

প্রিয় মঁস্যো,

আমি একটি ক্ষুদ্র বিড়াল আপনাকে পাঠাইতেছি, উহা ডাক্তার দাউদ মিশর হইতে আনিয়াছেন এবং আমার খুব প্রিয়। আমার খাতিরে উহাকে সুখে রাখিবেন। Stéphane Malarmé-র পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী কবি Baudelaire বলিয়াছেন:—

Les amoureux fervents et les savants austéres
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil da la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. *

আপনাকে মনে করাইয়া দিতেছি যে আপনার কাছে আমার একটা গল্প পাওনা রহিয়াছে। আগামী বারো তারিখে সেটা আনিবেন। সেদিন আপনার ডিনারের নিমন্ত্রণ রহিল।

আনি মরগান।

---

* প্রেমিক উদ্দাম্ আর পণ্ডিত সংযতী,
সুপক্ক বয়সকাল তাঁদের যখন,
উভয়ে আকৃষ্ট হ'ন বিড়ালের প্রতি,
সবল কোমল যারা, গৃহের ভূষণ,
নিস্তেজ নিশ্চল যারা, তাঁদেরই মতন॥

পুনশ্চ। আপনার ক্ষুদ্র বিড়ালটির নাম "পোরু"।

চিঠি পড়া শেষ করিয়া পোরুর দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সে পিছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া টান হইয়া তাহার দেব-ভগ্নী পার্স্‌টি দেবীর নাসিকালেহনে নিযুক্ত রহিয়াছে। সে আমার দিকে চাহিল; আমার বলা কর্ত্তব্য যে আমাদের উভয়ের মধ্যে অধিকতর বিস্মিতভাব আমারই ছিল।

আমি মনে মনে প্রশ্ন করিলাম—ওটা কি বল্‌তে চায়?

তারপরেই এ বিষয়ে কিছু বুঝিবার চেষ্টা ত্যাগ করিলাম। নিজেকেই উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিলাম,—তুমি ত আচ্ছা লোক, যে একটা মাথা-পাগল মেয়ের পাগলামির অর্থ বাহির করিতে বসিয়াছ। কাজে লাগিয়া যাও। গৃহকর্ত্রী মাদাম মগ্নোয়ার এই ঈশ্বরের জীবটির সম্যক তত্ত্বাবধান করিবেন। কোন একটা প্রাচীন ঘটনার কাল নিরূপণ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ আমার হাতে ছিল, সেটা লইয়া বসিলাম; উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার একটু বেশী আগ্রহ ছিল এই যে, তাহাতে আমার প্রসিদ্ধ সহকর্ম্মী মঁস্যো মাস্‌পেরো মহাশয়কে একটুখানি সমঝাইবার সুবিধা পাওয়া গিয়াছিল। "পোরু" আমার টেবিলের উপর বসিয়াই ছিল। পিছনে ভর দিয়া বসিয়া, দুই কান খাড়া করিয়া সে আমার লেখা দেখিতেছিল। বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না, সেদিন আমার কোন কাজই হইল না। আমার মাথার ভিতর ওলট্ পালট্ হইয়া গেল; মনের ভিতর পুরাতন গল্পের ভাঙ্গা পদ ও রূপকথার টুক্‌রা আসিয়া ভিড় করিল। নিজের এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শুইতে গেলাম। পরদিন দেখি "পোরু" সেইরূপ টেবিলের উপর বসিয়া পদলেহন করিতেছে। এদিনও আমার কাজ ভাল

হইল না; দিনের ভিতর সবচেয়ে ভাল সময়টা আমি ও "পোরু" পরস্পরের দিকে চাহিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিনও সেইরকমে গেল, তার পরের দিনও; সমস্ত সপ্তাহটাই এইরকমে গেল। ইহাতে আমার দুঃখিত হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই অঘটন ধৈর্য্যের সঙ্গে, এমন কি স্ফূর্ত্তির সঙ্গেই সহ্য করিয়া গেলাম; ভাল লোক খারাপ হইতে কত কম বিলম্ব হয় দেখিলে ভয় হইবার কথা। পরের রবিবার অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি পাঠাগারে দৌড়িলাম—"পোরু" তাহার অভ্যাসমত আগেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। টেবিলে বসিয়াই সাদা কাগজের একখানা খাতা টানিয়া লইলাম, কলমটা কালিতে ডুবাইলাম, এবং আমার নূতন বন্ধুটির দৃষ্টির সামনে বড় বড় হরফে লিখিলাম—Mésaventures d'un commissionaire borgne (একচক্ষু মুটের বিপদকাহিনী)। তারপর "পোরুর" দিক হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া আমি সমস্ত দিন লিখিয়া চলিলাম, ভয়ানক দ্রুতবেগে কলম ছুটিল। সে গল্পের বর্ণিত কীর্ত্তিকাহিনী এমনই তাজ্জব, কৌতুকাবহ ও বিচিত্র যে, আমি নিজেই হাসিয়া আকুল হইলাম। আমার একচক্ষু মুটেপ্রবর মোট লইয়া নানা গোলমাল ও চূড়ান্ত মজাদার ভুল করিতে লাগিল। কয়েকজন রসিকা স্ত্রীলোক অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হইলে, নিজের অজ্ঞাতসারেই সে তাহাদের অপ্রত্যাশিতভাবে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিল। সে আলমারী ও তাহার মধ্যে লুকায়িত পুরুষমানুষদের ঘাড়ে করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেল, লইয়া গিয়া নূতন জায়গায় পৌঁছাইয়া দিল, সেখানকার বৃদ্ধা মহিলাগণ ত আলমারী খুলিয়া ভয়েই অস্থির! যাই হোক, এমন মজার গল্প কি বিশ্লেষণ করা চলে?

লিখিতে লিখিতে অন্তত বার কুড়ি উচ্চহাস্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। "পোরু" না হাসিয়া উঠিলেও তাহার গম্ভীর কান্তি অতিশয় আহ্লাদিত ব্যক্তির মুখের মতই দেখাইল। এই চমৎকার গল্পের শেষ লাইন যখন লেখা হইল, তখন সন্ধ্যা সাতটা। ইহার এক ঘণ্টা আগে হইতে "পোরুর" দুই উজ্জ্বল চক্ষু ছাড়া ঘরে আর কোনরূপ আলো ছিল না। ভালরকম বাতির আলো থাকিলে যেমন সহজে লিখিতাম, অন্ধকারেও আমি তেম্নি সহজে লিখিতে পারিলাম। গল্প শেষ হইলে পোষাক পরিলাম; কালো কোট ও সাদা গলাবন্ধ লাগাইয়া, "পোরু"র নিকট হইতে বিদায় লইয়া, ছুটিয়া সিঁড়ি বাহিয়া রাস্তায় গিয়া পড়িলাম। কুড়ি পা যাইতে না যাইতে কোটের হাতা ধরিয়া কে টান দিল।

—খুড়োমশাই, দানোয়-পাওয়া ব্যক্তির মত ছুটে এসে এমন ভাবে কোথায় চলেছেন?

ফিরিয়া দেখিলাম প্রশ্নকর্ত্তা আমার ভাইপো মার্‌সেল। সে এক-জন বাস্তবিক সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সাল্‌পেট্রিয়ের চিকিৎসক। লোকের বিশ্বাস সে চিকিৎসা ব্যবসায়ে নাম করিতে পারিবে। এ কথা ঠিক যে, নিজের খামখেয়ালী কল্পনাপ্রবৃত্তিকে আর একটু দমনে রাখিতে পারিলে তাহার মাথাটা আরো খেলিবে। আমি তাহাকে বলিলাম—আমি যাচ্ছি মিস্ মর্‌গানের কাছে, আমার রচিত একটা গল্প নিয়ে।

—সে কি! আপনি আবার গল্প লেখেন, আর মিস্ মর্‌গানের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে? খুব সুন্দরী স্ত্রীলোক বটে। তা'হলে আপনি ডাক্তার দাউদকে জানেন, সেই যে লোকটা তাঁর সঙ্গে সর্ব্বত্র ঘোরে?

—বেটা হাতুড়ে বদ্যি, জোচ্চোর।

—তা হ'তে পারে, কিন্তু সে একজন অসাধারণ গুণী লোক, এ কথা নিশ্চিত। যে সকল ব্যাপার সে ইচ্ছামাত্র ঘটায়, Bernheim, Liegeois এমন কি Charcot পর্য্যন্ত তা'তে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। সম্মোহন ও ভাবসঞ্চালন-ক্রিয়া সে বিনা স্পর্শ দ্বারা, কোনরূপ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের সাহায্য না নিয়ে, একটা জন্তুর ভিতর দিয়ে নিষ্পন্ন করতে পারে। সাধারণত সে এই সব কাজ ছোট-লোমওয়ালা, ক্ষুদ্র বিড়ালের সাহায্যে ক'রে থাকে। তার কাজের ধরণ এইরূপঃ—প্রথমতঃ একটা বিড়ালের মধ্যে যে-কোন কাজের জন্য সে ভাবসঞ্চালন করে, তারপর একটা ঝুড়ির মধ্যে বিড়ালটাকে ভ'রে, যা'কে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে চায় তার কাছে পাঠায়। বিড়াল তার মধ্যে ভাবটা প্রেরণ করে, এবং রোগী ভাবসঞ্চালকের আদেশানুযায়ী কাজ করে।

—সত্যি ?

—সত্যি, খুড়োমশাই।

—আর মিস্ মর্‌গান এই চমৎকার ব্যাপারে কোন্ অংশ অভিনয় করেন ?

—মিস্ মর্‌গান দাউদকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নে'ন, এবং এই সম্মোহন ও ভাব-সঞ্চালন বিদ্যার সাহায্যে মানুষকে যতরকম নির্ব্বুদ্ধির কাজ আছে তাই করতে প্রবৃত্ত করান, যেন তাঁর রূপ এ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আমি আর কিছু শুনিলাম না। অদম্য একটা শক্তি আমাকে মিস্ মর্‌গানের ঝাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

সম্পাদকের নিবেদন।

—:•:—

যেদিন রবীন্দ্রনাথ চরকা সম্বন্ধে নিজ মত সবুজ পত্রে প্রকাশ করেন, সেই দিনই বুঝি যে রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিবাদ করতে অনেকে উৎসুক হবেন। বাঙলা দেশে ক'জন চরকার সাধনা করেন জানিনে, কারণ যাঁরা করেন তাঁদের অধিকাংশের পক্ষেই সে সাধন গুপ্তসাধন। কিন্তু কেউ চরকার উপর হস্তক্ষেপ করলে যাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এমন লোক অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। আর এ দলের ভিতর যাঁরা লেখক, তাঁরা যে তাঁদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন, সে ত জানা কথা।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের দুটি প্রতিবাদ আমার হস্তগত হয়েছে, দুটিই ধীরভাবে লিখিত ও সুলিখিত। তবে সে দুটি প্রতিবাদ আমি দুটি কারণে সবুজ পত্রে প্রকাশ করতে ইতস্তত করেছি।

প্রথমত চরকার আন্দোলনে সবুজপত্রের ক্ষুদ্রদেহ আন্দোলিত করবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার ছিল না। আর যতদূর জানি এই দীর্ঘসূত্র আলোচনার সূত্র আরও দীর্ঘ করবার অভিপ্রায় রবীন্দ্র নাথেরও ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধেই তিনি এ বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট করে' ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই কারণে আমার বিশ্বাস ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তর একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে দেওয়াই সঙ্গত। এ বাদানুবাদে আমাদের মত অগণ্য

নগণ্য চরকা-আস্তিক ও চরকা-নাস্তিকদের পক্ষে যোগ দেওয়া যেমন অনাবশ্যক তেমনি অনর্থক।

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তর দিয়েছেন। অবশ্য তিনি সে উত্তর দিয়েছেন ইংরাজী ভাষায়। তাহলেও মহাত্মা গান্ধীর কথা দেশশুদ্ধ লোক শুনতে পেয়েছে। তাঁর লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধের বাঙলা অনুবাদ ইতিপূর্ব্বেই নানা বাঙলা কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর উত্তরের প্রত্যুত্তর দেবার কারও প্রয়োজন নেই। চরকার আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে যাঁরা সন্দিহান, তাঁদের অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে পরিণত করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী বিন্দুমাত্র প্রয়াস পান নি,—সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে যে, বাঙলায় কাপাসের চাষ করতে গেলে সেখানে জন্মাবে স্রুধু কাব্যের ফুল আর তর্কের ফল। তাই তিনি এ বিষয়ে কোন্ কথা পূর্ব্বে বলেছেন ও কোন্ কথা বলেন নি, স্রুধু তারই ফর্দ্দ দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ তাঁর পূর্ব্বকথার পুনরাবৃত্তি মাত্র। মহাত্মার সঙ্গে কবির প্রভেদের কথাটাই এ প্রবন্ধের আসল বক্তব্য। বলা বাহুল্য যে, সে বিচারে যোগ দেবার অধিকারে আমাদের মত সামান্য লোকেরা বঞ্চিত। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রভেদটা কি ?—এ জিজ্ঞাসার একমাত্র নিরুত্তর মীমাংসা করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ দুটি, অপর একটি কারণে আমি সবুজ পত্রে প্রকাশ করতে সাহসী হইনি। উভয় লেখকই বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ চরকা সম্বন্ধে আসল কথাটা তাঁর প্রবন্ধে বাদ দিয়ে গিয়েছেন। চরকার সার্থকতা অথবা ব্যর্থতার বিষয় নাকি আবিষ্কার করতে হবে ইকনমিক্স্ শাস্ত্রের আঁকজোকের ভিতর। আমার

বিশ্বাস ছিল যে, চরকা ইকনমিক্সের যন্ত্র নয়, পলিটিক্সের অস্ত্র। চরকা চালানো যখন ভারত উদ্ধারের অনন্য উপায়, তখন চরকার সিংহাসন হচ্ছে পলিটিক্সের রাজ্যে। যদি ধরে' নেওয়া যায় যে, চরকার অব্যর্থ সার্থকতা আছে সুধু ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে, তাহলেও সে শাস্ত্রের বিচার আমি সবুজ পত্রে করতে ভয় পাই। উভয় লেখকই বলেছেন এই ইকনমিক সমস্যা অতি "জটিল সমস্যা"। এই "জটিল সমস্যার" বিচারে প্রবৃত্ত হলে সবুজ পত্র Economic Journal-য়ে পরিণত হবে। ইকনমিক্সের বিলেতে জন্ম, অথচ ইংরাজী সাহিত্যিকরাই ইকনমিক বিদ্যার নাম দিয়েছেন dry-as dust শাস্ত্র। আমরা চেষ্টা করলে হয়ত ধূলোর মত শুক্নো লেখা লিখ্তে পারি, কিন্তু সে ধুলি গলাধঃকরণ করবার লোক বাঙলায় বড় একটা পাওয়া যাবে না,—অবশ্য আমরা যদি ও শাস্ত্রের স্বরূপকথা নিয়ে বিস্তে ফলাই। ইকনমিক্সের রূপকথা আমরা সবাই শুনতে ভালবাসি, কিন্তু সে সব কথা এত বলা হয়েছে যে, তার আর পুনরুল্লেখ করবার কোন প্রয়োজন নেই। ইকনমিক শাস্ত্রের নাগাল মস্তিষ্ক পায় কি না জানি নে, কিন্তু হৃদয় যে পায় না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রামমোহন রায়কে মহাত্মা pigmy বলেছেন শুনে আমরা দু' চার জন বাঙালী ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। কিন্তু এখন জানতে পেলুম যে, এ গুজব ভুল। রামমোহন রায়কে তিনি positive pigmy বলেন নি, comparative pigmy বলেছেন, অর্থাৎ উপনিষদের ঋষিদের, তুলনায় রামমোহন রায়ের ক্ষুদ্রত্বের কথা তিনি কটকের বালির চড়ায় উৎকলবাসীদের শুনিয়েছেন। এ কথা শুনে আমরা একান্ত আশ্বস্ত হয়েছি। আমাদের বাঙলা দেশে মহাপুরুষ বড়

বেশি জন্মায় না। তাই যদি দেখতে পাই যে, এদেশেও দু' এক জন এমন লোক জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা আমাদের চাইতে মাথায় একটু উঁচু, তাহলে তাঁকেই আমরা মহাপুরুষ বলে মনে করি ও মান্য করি। আর তাঁদের কেউ বামন বললে আমাদের বাঙালী পেট্রিয়টিজমে আঘাত লাগে। এর মূল হচ্ছে অবশ্য ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য। কিন্তু রামমোহন রায় যে উপনিষদের ঋষিদের তুলনায় বালখিল্য, এ কথা আমরা সকলে সমস্বরে একবাক্যে বলতে প্রস্তুত আছি। আমি জোর করে বলতে পারি যে, স্বয়ং রামমোহন রায়ও মহাত্মা গান্ধীর উক্ত কথার নীচে সানন্দে সই দিতে তিলমাত্র দ্বিধা করতেন না। বিংশ শতাব্দীর ইংরাজীশিক্ষিত ভারতবাসীরা যে উপনিষদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান হয়েছে, এ সংবাদ যেদিন কটক থেকে বে-তারে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছয়, সেদিন ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিশ্চয়ই তাঁর ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী শিষ্য রামমোহন রায়কে সম্বোধন করে বলেছেন—"জিতা রও বেটা, তুহারি কাম"। এ দেশে ব্রিটিশ আমলে তিনিই যে উপনিষদের মাহাত্ম্যের আদি প্রচারক, এ সত্য ত ইতিহাসের কপালে সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

প্রজাস্বত্ব আইনের নূতন বিল।

(আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য বিশেষভাবে লিখিত)

আপনাদের অনুরোধে প্রজাস্বত্ব আইনের নব সংস্করণের বিষয় লিখতে বসেই আমার মনে পড়ে গেল যে ভারতচন্দ্র বলেছেন,—

পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

ভারতচন্দ্র যে কি পড়েছিলেন, আর কি লিখতে চেয়েছিলেন জানিনে। কিন্তু প্রজাস্বত্ব আইনের এই নব সংস্করণ পড়ে, হয়ত চেষ্টা চরিত্তির করে সেই মত "লিখিবারে পারি",—তবে সে লেখা আনন্দ-বাজারে চলবে না, চলতে পারে অমৃতবাজারে, অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায়। আইন এ দেশে ইংরাজিতে লেখা হয়, আর ইংরাজী আমরা সবাই জানি; এর থেকে আমরা ধরে' নিই যে, আইনের ভাষা আমাদের সকলেরই বোধগম্য। এ বিশ্বাস শুধু তাঁদেরই আছে, যাঁরা ও-ভাষা আয়ত্ত করবার কষ্ট কখনো ভোগ করেন নি। কিন্তু আইনজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, আইনী ভাষা আর বে-আইনী ভাষা, এক ভাষা নয়। বে-আইনী ইংরাজীর অনুবাদ বাঙলায় করা যায়, কিন্তু আইনী ইংরাজীর করা যায় না। আর আইনী ইংরাজীর যদি বে-আইনী বাঙলা করি—তা'হলে আমার কথা লোকের যে "বুঝিবারে ভারী" হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে কথা যে রসাল কিছুতেই হবে না

তা বলা বাহুল্য। আইন উকীল বাবুদের কাছে ইক্ষু—কিন্তু আমাদের কাছে দণ্ড। এ ইক্ষুদণ্ডের তাঁরা খান রস, আমরা খাই মার। ইংরাজী আইনের বাঙলা ভাষ্য লিখতে গেলে সে লেখার ভিতর যে প্রসাদগুণ থাকবে না, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং প্রজাস্বত্ব আইনের বিষয় আমার বক্তব্য লোকের কাছে পরিষ্কার করতে হলে "যাবনী মিশাল" ভাষা আমাকেও কইতে হবে। যদিচ আমি আজকে দু-কথায় এর আসল হাল বোঝাতে চেষ্টা করব।

(২)

এই নূতন সংস্করণের বেশীর ভাগ সংস্কার শুধু আইনঘটিত। অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব যা ছিল তাই আছে, বদল হয়েছে শুধু তার ভাষা। উক্ত আইনের লেখা অধিকাংশ স্থলেই বড় অপরিষ্কার, তার ফলে আদালতে উক্ত আইনের যে ধারার যে রকম অর্থ করা হয়েছে, সে ধারার ভাষার তা নির্গলিতার্থ নয়। এই কারণে জজের নজিরের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আইনের অনেক স্থলে গরমিল হয়েছে, আবার অনেকস্থলে নজিরের সঙ্গে নজিরের মিল নেই। আইনের সঙ্গে নজিরের সামঞ্জস্য ঘটাবার উদ্দেশ্যে নানান ধারার ভাষার সংস্কার হয়েছে। এতে আদালতের কচ্‌কচি বাড়বে কি কমবে, সে কথা বল্‌তে পারেন উকীল ও উকীলের মুহুরী। প্রজাস্বত্ব আইনের ভাষার গোলকধাঁধার ভিতর প্রবেশ করবার শক্তিও আমার নেই, প্রবৃত্তিও আমার নেই। আর আশা করি, আনন্দবাজারের পাঠকরাও আইনের ভাষাপরিচ্ছদের বিচার শুন্‌তে ব্যস্ত নন। আমি ধরে' নিচ্ছি এ সকল কথার বদল উকীল বাবুদের মনঃপুত হয়েছে, যেহেতু উকিল-

বাবুরাও এসকল বদল করেছেন। কাউন্সিলের যে কমিটির প্রস্তাব সব বিল আকার ধারণ করেছে—সে কমিটিতে প্রবলপক্ষ ছিলেন, তাঁরা, Tenancy Act হচ্ছে যাঁদের অন্নদাতা। এ সব বদলে প্রজার লাভ হয়েছে কি ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে মৎফরক্কা মত দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, প্রজার বাস্তুভিটার উপর নব আইনের হাত পড়েছে। অর্থাৎ বাস্তুভিটা এবার জোতের সামিল হয়ে যাবে। প্রজার একটা দখলীস্বত্ব যে এতে ক্ষুন্ন হল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফলে আদালতের একটা নতুন দুয়োর খুলে ল।

(৩)

প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধিত অংশের কথা ছেড়ে দিয়ে, এখন তার পরিবর্দ্ধিত অথবা পরিবর্ত্তিত অংশের দিকে নজর দেওয়া যাক্। এ আইনের আবশ্যক কি, উদ্দেশ্যই বা কি ?—এই বিলের Statement of Objects and Reasons-এর ভিতর সে সন্ধান আমরা পাব। তা'তে লেখা আছে যে, মামলা মোকদ্দমা ও জরিপের অভিজ্ঞতা has revealed changes in agrarian conditions which demand a substantial modification of law ; অর্থাৎ গত কয় বৎসরের ভিতর কৃষকের যে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তা'তে প্রজাস্বত্ব আইনেরও substantial পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

কৃষকের ও কৃষিকার্য্যের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সে কথার কোনও উল্লেখ নেই; তার কারণ উক্ত বিলের জন্মদাতারাও সম্ভবত সে বিষয়ে ওয়াকিব হাল নন। তাঁদের মনে বোধহয় একটা অস্পষ্ট

ধারণা ছিল যে—প্রজার ও জমিদারের স্বত্বস্বামীত্বের কিছু ঘোরফের না করলে আর চলে না। তার কারণ গত কয় বৎসরের মধ্যে এ সত্যটা প্রকট হয়েছে যে, প্রজার মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অর্থাৎ যে সব দাবী তারা পূর্ব্বে করত না, এখন সে সব তারা স্পষ্টাক্ষরে করতে আরম্ভ করেছে। আর এই সকল দাবী রাখতে গেলেই আইন আর পূর্ব্বাবস্থায় বাহাল রাখা যায় না। এখন দেখা যাক্ প্রজার দাবী ছিল কি? তাহলে বোঝা যাবে যে, সে সব দাবীর কোনটা ও কতটা নূতন আইনে মান্য করা হয়েছে। মোটামুটি দাবীগুলির ফর্দ্দ এই:—

(১) প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই সর্ব্বত্র আইনত হস্তান্তরযোগ্য বলে গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—উক্ত শ্রেণীর জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার থাকবে।

(২) নিজের দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজার থাকবে, অর্থাৎ প্রজা সে গাছের স্বত্বাধিকারী স্বরূপে স্বীকৃত হবে।

(৩) প্রজা জমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী জমিতে পুকুর খুঁড়তে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ী তৈরী করতে পারবে।

(৪) প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতের জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের অতঃপর আর থাকবে না। অর্থাৎ—দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জোতমাত্রই আইনত মৌরসী মোকররী বলে গণ্য হবে।

এ ফর্দ্দ আমি আমার লিখিত "রায়তের কথা" থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এ ক'টি ছাড়া প্রজার আরও দাবী থাকতে পারে, কিন্তু এ ক'টি যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

(৪)

এখন নূতন বিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। যে কমিটি এই বিলের প্রসূতি, তার কাছে চার নম্বর দাবী বিলকুল না-মঞ্জুর হয়েছে। এই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আইনে জমিদারের জমাবৃদ্ধির অধিকার সম্পূর্ণ বজায় আছে। তারপর প্রজার তিন নম্বর দাবীটি মোটামুটি রক্ষা করা হয়েছে। পূর্ব্ব আইনেও প্রজার দখলী জমিতে কুয়ো খোঁড়বার, কোঠাবাড়ী তৈরী করবার অধিকার ছিল; অন্ততঃ হাই-কোর্টের নজিরের প্রসাদে সে অধিকার তারা লাভ করেছিল। নূতন আইন সে অধিকার তাদের হাত থেকে কেড়ে নেয় নি। বরং ও আইনের ৭৭ ধারার যে অল্পস্বল্প বদল করা হয়েছে, তা'তে এ বিষয়ে লোভী জমিদারের উপদ্রব একটু কমবার সম্ভাবনা। প্রথম দাবীটি সম্বন্ধে "It is proposed to recognise the prevalent practice and give to the occupancy raiyat a right of transfer" উত্তম প্রস্তাব। তারপর দাখিল খারিজের নজর জোতের খরিদামূল্যের চৌথ ধার্য্য করা হয়েছে। একে বলে মন্দের ভাল। এর পরই এই সংশোধিত আইনের হুল বেরিয়ে পড়েছে। "The bill also gives him (the landlord) the right to have the holding transferred to himself on payment to the transferee of the consideration money and 10 per cent compensation"; অর্থাৎ নূতন আইন প্রজার হাতে যে স্বত্ব তুলে দিলেন, সে স্বত্ব, এই আইনের সাহায্যেই জমিদার প্রজার গালে চড় মেরে কেড়ে নিতে পারবে। এরই নাম বোধহয় substantial modification। এ প্রস্তাব যদি আইনে পরিণত হয়, তাহলে হবে প্রজার সর্ব্বনাশ ও

উকিলের পোষমাস। তারপর প্রজার দ্বিতীয় দফা দাবী গ্রাহ্য করা হয়েছে এই ভাবে:—The bill gives to the occupancy raiyat and occupancy under-raiyat, complete right in trees on his land, except that in the case of valuable-trees, a fee of one-fourth of the value is to be paid to the landlord, when the tree is felled or disposed of.

অর্থাৎ—নূতন আইনের বলে গাছের উপর প্রজার নিব্যূঢ় স্বত্ব জন্মাবে, কিন্তু সে গাছের ভিতর যদি কিছু মাল থাকে, তাহলে ভূস্বামী প্রজার কাছ থেকে তার মূল্যের চৌথ আদায় করতে পারবেন, যদি প্রজা সে গাছ কাটে কি বেচে। এ কিরকম complete right? —বলছি। প্রজার সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকবে স্রধু আগাছার উপর, গাছের উপর নয়। এ ধারাটা কি একটা রসিকতার মত শোনায় না? এর ফলে আদালতের আর একটা দুয়োর খুলে যাবে।

(৫)

আজকে আমি আইনের তর্ক তুলতে চাইনে। এ বিল সিলেক্ট্ কমিটি থেকে কি আকার ধারণ করে' বেরয়, তা' দেখে তখন তর্ক করা যাবে। আজ শুধু এই বিলের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এবং সেই সঙ্গে আমাদের কোথায় আপত্তি সেই কথাটা জানিয়ে রাখতে চাই'।

এ বিল জোড়া-তাড়া দিয়ে বানানো হয়েছে। জমিদারের অর্থের সঙ্গে প্রজার স্বার্থের গোঁজামিল দেবার চেষ্টাই এর ভিতর ফুটে উঠেছে। আমার বিশ্বাস এরকম আধাখেঁচড়া আইনে শুধু গোল বাড়ায়—কমায় না।

এই বিলে শরিকী সম্পত্তির গোলযোগ মেটাবার জন্য অনেক রকম নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ প্রজাকে জমি হস্তান্তর ও গাছ কাটবার অধিকার দিয়ে সেই সঙ্গে জমিদারকে সেই সব অধিকারের সিকি শরিক করা হয়েছে। ওতে যে নতুনরকম শরিকী বিবাদের সৃষ্টি করা হল—সে কথাটা বিলকর্ত্তারা খেয়াল করেন নি।

কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়ে এ বিল কি মুর্ত্তি ধারণ করে, দেখবার জন্য আমরা সবাই উৎসুক হয়ে রইলুম। তবে কাউন্সিলের দেশী মেম্বর-দের ভিতর কোনপক্ষই যে প্রজাপক্ষ হবেন, সে ভরসা আমাদের নেই। কারণ কাউন্সিলে যে দুই তিন দল হয়েছে,—তাঁদের মতভেদ শুধু রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে। প্রজাসম্বন্ধে তাঁদের ভিতর যে কোন মতভেদ আছে, তার প্রমাণ ত অদ্যাবধি বড় একটা পাওয়া যায় নি।—কাউন্সিলারদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিই। এ বিলেরও গোড়ার কথা দু-ইয়ারকি—প্রজার সঙ্গে জমিদারের। এর ভিতরও যা' transferred তাই আবার ঘুরিয়ে reserved করা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী।

নাতনীর উদ্দেশে।

যখন আমি উর্ব্বশীরে
করেছিলেম স্তব,
খুসি হলেন, তখন সেটা
হয়নি অনুভব।
তারপরে যেই বয়স হল,
নিলেম বানপ্রস্থ্য,
নানারকম সাধন নিয়ে
হলেম বাতিকগ্রস্ত,
তখন আমার ধ্যানের মধ্যে
হঠাৎ চেয়ে দেখি,—
পারিজাতের গন্ধখানি
শরীর নিয়েছে কি?
এই ত গো সেই অপ্সরী,
তার সন্দেহ কার আছে,
স্বর্গস্মৃতি এনেছে তার
সর্ব্বদেহের নাচে।
সুরবীণার ঝঙ্কারে তার
লাগ্‌ল না আর মন;
মর্ত্ত্যের অঙ্গনে এসে
এই করেছে পণ—
নন্দন মন্দারবনে
মন্দাকিনীর তীরে,

কবির ছন্দ নিয়ে যাবে
চঞ্চল মঞ্জীরে।
সুরসভার মাঝে চন্দ্র
শুন্‌বে অবাক্ মানি,
বল্‌বে হেসে, "ফাগুন রাতের
এ ছন্দ যে জানি।"
পবনদেবের লাগ্‌বে চমক্,
কইবে শচীর কানে,
"এ ছন্দ যে শুনেছিলেম
শ্রাবণ দিনের গানে।"
প্রজাপতির পড়বে মনে,
ভাব্‌বে হাসিমুখে,
"এই ছন্দের দোল দেখেছি
নববধূর বুকে।"
উষা দেবী বল্‌বে হেসে,
"ওলো স্বর্গপ্রিয়া,
কেমন করে ভুলিয়ে এলি
মর্ত্ত্য কবির হিয়া?"
বল্‌বে শুনে, "করিনি ত
বিষম অধ্যবসায়,
আমি কেবল ডেকেছিলেম
তা'রে, দাদামশায়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান।

——:০:——

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা।

সকালবেলার কুঁড়ি আমার
বিকালে যায় টুটে।
মাঝখানে হায় হয়নি দেখা,
উঠ্‌ল যখন ফুটে॥
ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি
ধুলো থেকে আনিস্‌ তুলি,
শুক্‌নো পাতায় গাঁথ্‌ব মালা
হৃদয় পত্রপুটে॥
যখন সময় ছিল দিল ফাঁকি,
এখন আন্‌ কুড়ায়ে দিনের শেষে
অসময়ের ছিন্ন বাকি।
কৃষ্ণরাতের চাঁদের কণা
আঁধারকে দেয় যে-সান্ত্বনা,
তাই নিয়ে মোর মিটুক্‌ আশা,
স্বপন গেছে ছুটে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

———

নবম বর্ষ, মাঘ, ১৩৩২।

সবুজ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি।*

—[:•:]—

হে সমিতির কুমার ও কুমারীগণ—

তোমাদের সমিতির কর্ণধার ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির সঙ্গে তোমাদের দু-কথায় পরিচয় করিয়ে দেবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। জিওগ্রাফি বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত—সাহিত্যের নয়, আর এ কথা সবাই জানে যে, আমি সাহিত্যিক হলেও হতে পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নই। তবে যে আমি এ অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য উদ্যত হয়েছি, তার কারণ অনধিকারচর্চ্চা করবার কু-অভ্যাস ও দুঃসাহস দুই আমার আছে।

কিন্তু প্রথমেই এক মুস্কিলে পড়েছি। সকল বিজ্ঞানের মত জিওগ্রাফিরও একটা বিশেষ পরিভাষা আছে। সে পরিভাষা মূলত ইংরাজি। এ বিষয়ে বাঙলা ভাষায় যে পরিভাষা আছে, তা হয় সংস্কৃত নয় ইংরাজীর অনুবাদ। সে সব সংস্কৃত কথার অর্থ বুঝতে হলে, তাদের আবার মনে মনে ইংরাজী ভাষায় উল্টে অনুবাদ করে নিতে হয়। একটি উদাহরণ দিই। অন্তরীপ ও Cape, এ দুটি কথাই বাঙালীর কাছে সমান অপরিচিত। এ দুয়ের মধ্যে সম্ভবতঃ Cape শব্দটিই তোমরা স্কুলঘরে বেশিবার শুনেছ, অতএব তোমাদের কাছে বেশি পরিচিত। অপরপক্ষে "উত্তমাশা অন্তরীপ" বললে আমরা

---

* একটি পারিবারিক সমিতিতে পঠিত।

ভাবতে বসে যাই, জিনিষটা কি ? আর ততক্ষণ চিন্তার দায় থেকে অব্যাহতি পাইনে, যতক্ষণ না কেউ বলে দেয় যে, ও হচ্ছে Cape of Good Hope-এর বাঙলা নাম। আর শৃঙ্গ অন্তরীপ (Cape Horn) শুনলে ত আমরা অগাধ জলে পড়ি। আর সে জলে পড়লে আর উদ্ধার নেই, কারণ সে জল বরফ জল।

আমাদের পরিভাষার দশা যখন এরূপ মারাত্মক, তখন আমি যতদূর সম্ভব পরিভাষা পরিত্যাগ করে আমার কথা ভাষায় বলতে চেষ্টা করব। যেখানে অগত্যা পরিভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হব, সেখানে ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করব। এ প্রস্তাব শুনে, আমার হাতে বাঙলা ভাষার জাত মারা যাবে ভেবে তোমরা ভীত হয়ো না। ইংরাজী বিজ্ঞানের পরিভাষাও ইংরাজী নয়—গ্রীক্। আর গ্রীক্ সভ্যতার বয়েস আড়াই হাজার বৎসর। সুতরাং তার স্পর্শে আমাদের ভাষার আভিজাত্য একেবারে নষ্ট হবে না। ভারতবর্ষের সভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার আর কোনও বিষয়ে মিল না থাকুক, বয়েসে মিল আছে।

ভূমণ্ডল।

প্রথমেই আমি তোমাদের কাছে পৃথিবী নামক গোলকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব।

এ গোলকটি ক্ষিতি আর অপ্, মাটি আর জল এই দুই ভূতে গড়া। আর এ গোলকের চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে জল, আর এক ভাগ স্থল।

আমরা অবশ্য পৃথিবী বলতে প্রধানতঃ মাটিই বুঝি। তার প্রমাণ আমরা একে ভূমণ্ডল বলি। এর কারণ আমরা ভূচর জীব—অর্থাৎ মাটির উপর বাস করি। জলচর জীবদের যদি শুধু জল-পিপাসা নয়, সেই সঙ্গে জ্ঞান-পিপাসা থাক্‌ত ও সেই সঙ্গে তাদের জ্ঞান তরল ভাষায় ব্যক্ত করবার ক্ষমতা থাক্‌ত, তাহলে তারা জিওগ্রাফি না রচনা করে, রচনা করত Hydrography। আর তারা কবিতা লিখত "আমার জন্মজলের" উপর। আর আমরা যাকে বলি মধুর রস, তার নাম তারা দিত লবণ রস। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ যে, আমাদের কল্পনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা কতটা মাটিগত, অর্থাৎ আমরা মনে প্রাণে কতটা জিওগ্রাফির অধীন।

এ সত্ত্বেও মানুষের কৌতূহল ক্রমান্বয় পঞ্চভূতের প্রথম ভূত ক্ষিতিকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের যে মনোভাবকে আমরা ধর্ম্ম-মনোভাব বলি, তার কারবার ত পঞ্চম ভূত ব্যোমকে নিয়ে। তা ছাড়া মানুষে আবহমানকাল এই পঞ্চভূতের কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে, কার পেটে কে জন্মেছে, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে ও বকাবকি করেছে। যা আছে তাকে মূল সত্য বলে সে কখনও মেনে নিতে পারে নি। কোত্থেকে সে জন্মালো, এ প্রশ্ন সে যুগে যুগে জিজ্ঞাসা করে এসেছে। এ পৃথিবী নামক গোলকটির সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা উক্ত প্রশ্নের এই উত্তর দিয়েছিলেন যে, জলই আদি (অপ এব সসর্জাদৌ) সৃষ্টি। জল থেকেই মাটি উদ্ভূত। এ কালের বৈজ্ঞানিকেরাও ঐ একই কথা বলছেন। তাঁদের মতে এ পৃথিবী আগে জলময় অথবা জলমগ্ন ছিল, পরে জল থেকে মাটি উদ্ভূত হয়েছে। ভাগ্যিস হয়েছে, নচেৎ জিওগ্রাফি নামক বিজ্ঞান আমাদের মন থেকে

উদ্ভূত হত না। যখন পৃথিবী জলময় ছিল, তখন পৃথিবী একাকার ছিল। একাকারের কোনরূপ জ্ঞান হতে পারে না, হতে পারে শুধু ধ্যান। এ কথা মনুও বলে গিয়েছেন—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

যেদিন মাটির উদ্ভব হল, সেই দিনই পৃথিবীর নানা আকার ঘটল, সেই দিন থেকেই তা জ্ঞানের বিষয় হল।

পৃথিবীর ভাগ।

এখন শোনো, অপ্ থেকে যখন ক্ষিতির উদ্ভব হল, তখন মাটি একলপ্ত ভাবে উদ্ভূত হল না, হল খণ্ড খণ্ড ভাবে। প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বলেন যে, মেদিনী সপ্তদ্বীপ আকারে ব্যক্ত হয়েছে।

এই দ্বীপ শব্দটার অর্থ তোমরা সবাই জানো। যার চারদিকে জল আর মাঝখানে স্থল, তাকেই আমরা বলি দ্বীপ। এ হিসাবে আজকের দিনে পৃথিবীতে সাতটি নয়, অসংখ্য দ্বীপ আছে। সমুদ্রের মধ্যে থেকে অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ মাথা তুলে রয়েছে।

সুতরাং এ স্থলে সপ্তদ্বীপ অর্থে সাতটি মহাদ্বীপ বুঝতে হবে। এই মহাদ্বীপকে আমরা একালে মহাদেশ বলি। আজকের দিনে আমরা পৃথিবীকে চারটি মহাদেশে ভাগ করি—যথা ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা। অষ্ট্রেলিয়াকে আমরা আজও মহাদ্বীপ বলেই জানি, মহাদেশ বলে মানি নে।

মহাদেশ বলতে যদি মহাদ্বীপ বোঝায়, তাহলে পৃথিবীতে চারটি নয়, তিনটি মাত্র মহাদ্বীপ আছে:—প্রথম ইউ-রেসিয়া, দ্বিতীয় আফ্রিকা, তৃতীয় আমেরিকা। গ্লোবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে

যে, গোটা ইউরোপ ও গোটা এসিয়ার ভিতর কোথাও জলের ব্যবধান নেই। এ দুই দেশের জমি একলক্ত। আর এই আদি মহাদেশটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। এর উত্তরে Arctic S. দক্ষিণে Indian Ocean, পশ্চিমে Atlantic ও পূর্ব্বে Pacific Ocean; আর আফ্রিকার উত্তরে ও পশ্চিমে Atlantic এবং দক্ষিণে ও পূর্ব্বে Indian Ocean। আর আমেরিকার পশ্চিমে Pacific, পূর্ব্বে Atlantic, উত্তরে উত্তর-Arctic ও দক্ষিণে দক্ষিণ-Arctic সাগর। Eurasia-র সঙ্গে অপর দুটি মহাদেশের গড়নেরও একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। Eurasia-র বিস্তার পূব হতে পশ্চিমে, অপর দুটির হচ্ছে উত্তর হতে দক্ষিণে। অর্থাৎ ইউরেসিয়া লম্বার চাইতে চওড়ায় বেশি। আফ্রিকা ও আমেরিকা চওড়ার চাইতে লম্বায় বেশি। এই আকার ভেদ একদেশের সঙ্গে অপর দেশের অনেক প্রভেদ ঘটিয়েছে।

তোমরা সবাই জানো যে Eurasia ও আফ্রিকাকে আমরা প্রাচীন পৃথিবী বলি, ও আমেরিকাকে নবীন। এর প্রধান কারণ প্রাচীন পৃথিবীর লোক পাঁচ শ' বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার অস্তিত্বের কথা জানত না। তবে এ নাম শুধু লৌকিক নয়, বৈজ্ঞানিক হিসেবেও ঠিক। এই নবীন পৃথিবীর জন্ম প্রাচীন পৃথিবীর পরে হয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক বিষয়ে এই নতুন পৃথিবী প্রাচীন পৃথিবীর ঠিক উল্টো। বিলাতে (Greenwich) যখন দিন দুপুর, আমেরিকায় (New Orleans) তখন রাতদুপুর। কেন এরকম হয়, সে কথা আর আজ বলব না; কারণ তা বোঝাতে হলে আমাকে মাটি থেকে আকাশে উঠতে হবে। এ ব্যাপারের ব্যাখ্যার ভিতর শুধু পৃথিবী নয়, সূর্য্যচন্দ্রকেও টেনে আনতে হবে। কেননা জিওগ্রাফি কতক হিসেবে Astronomy-র

অন্তর্ভূত। আর Astronomy তোমরাও জানো না, আমিও জানিনে।

উত্তর খণ্ড দক্ষিণ খণ্ড।

আর একটি কথা শোনো। আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে এই বিশ্ব আদিতে ছিল ব্রহ্মাণ্ড নামে একটি অণ্ড। পরে ভগবান সেই অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করে, তার উর্দ্ধখণ্ড দিয়ে স্বর্গ ও অধঃখণ্ড দিয়ে পৃথিবী রচনা করেন—আর এ দুয়ের মধ্যে আকাশ সৃষ্টি করেন। কিন্তু একালে আমরা পৃথিবীকে আধখানা ডিমের সঙ্গে তুলনা করিনে; আমরা বলি পৃথিবীর চেহারা ঠিক একটি কমলা লেবুর মত।

এই কমলা লেবুটিকে যদি ঠিক মাঝখানে কাটো, তাহলে এই কাটা জায়গাটার নাম হবে Equator; তার উপরের আধখানার নাম হবে উত্তর hemisphere, আর নীচের অংশটির নাম দক্ষিণ hemisphere. পৃথিবীর এই দুই খণ্ডের চরিত্র কোন কোন বিষয়ে ঠিক পরস্পরের বিপরীত। যথা, উত্তরাখণ্ডে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণা-খণ্ডে তখন শীতকাল। তারপর এই দুই খণ্ডের গড়নেও ঢের প্রভেদ আছে। দক্ষিণাখণ্ডে যতখানি মাটি আছে, উত্তরাখণ্ডে প্রায় তার দ্বিগুণ মাটি আছে। এর থাকে অনুমান করতে পার যে, উত্তরা-খণ্ডের জলবায়ুর সঙ্গে দক্ষিণ খণ্ডের জলবায়ুর বিশেষ প্রভেদ আছে। আর জলবায়ুর প্রভেদ থেকেই ভৌগলিক হিসেবে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের প্রভেদ হয়। তোমরা সবাই জানো যে, জল ও বায়ু স্থির পদার্থ নয়,—ও দুইই চঞ্চল, ও দুয়েরই স্রোত আছে। অপ্ ও মরুতের স্রোতের মূল কারণ হচ্ছে সূর্য্যের তেজ; কিন্তু ক্ষিতি এই দুই

স্রোতকে বাধা দিয়ে তাদের গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডে বেশি পরিমাণ মাটি আছে, সে খণ্ডের জলবায়ুর গতি, যে খণ্ডে জল বেশি, সে দেশ হতে বিভিন্ন।

ইউরেসিয়া।

(১)

এখন ইউরেসিয়ার বিশেষত্ব এই যে, এ মহাদেশটি সম্পূর্ণ পৃথিবীর উত্তর খণ্ডের অন্তর্ভূত। অপর পক্ষে আমেরিকা ও আফ্রিকার কতক অংশ উত্তর খণ্ডে ও কতক অংশ দক্ষিণ খণ্ডে অবস্থিত। এর ফলে আমরা যাকে সভ্যতা বলি, সে বস্তু ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোমের কৃপায় ইউরেসিয়াতেই জন্মলাভ করেছে। আমেরিকা ও আফ্রিকা সভ্যতার জন্মভূমি নয়। ও দুই মহাদেশে যে সভ্যতার আমরা সাক্ষাৎ পাই, সে সভ্যতার ইউরেসিয়া হতে আমদানী। সমগ্র আমেরিকা ও আফ্রিকার উত্তর দক্ষিণ ভাগ ত ইউরোপের উপনিবেশ। আর পুরাকালে আফ্রিকার যে অংশে সভ্যতা প্রথম দেখা দেয়, সেই ইজিপ্ট উত্তরাখণ্ডের অন্তর্ভূত ও এসিয়ার সংলগ্ন। সুতরাং এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, সে সভ্যতার জন্মভূমি হচ্ছে এসিয়া, আর সেকালে ইজিপ্ট ছিল এসিয়ার একটি উপনিবেশ।

(২)

এর থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে, কোনো দেশের ইতিহাস বুঝতে হলে সে দেশের জিওগ্রাফিও আমাদের জানা চাই। এ যুগের মানুষ জিওগ্রাফির তাদৃশ অধীন না হলেও, আদিতে যে বিশেষ অধীন ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস

জানতে আমরা সবাই উৎসুক। সে ইতিহাস ভারতবর্ষের জমির উপরেই গড়ে উঠেছে, সেই জন্যই সেই জমির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে আমি উদ্যত হয়েছি। এখন এই কটি কথা তোমরা মনে রেখো যে, এ পৃথিবী সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভূত ও তার সঙ্গে নানা রূপ যোগসূত্রে আবদ্ধ। তারপর এই পৃথিবীর উত্তরাখণ্ডে ইউরেসিয়া অবস্থিত। আর এই মহাদেশের যে অংশকে আমরা এসিয়া বলি, ভারতবর্ষ তারই একটি ভূভাগ। আর এই ভূভাগের রূপগুণ বর্ণনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রথমে সৌরমণ্ডল থেকে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তারপর পৃথিবী থেকে তার উত্তরাখণ্ডকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তারপর তার উত্তরাখণ্ড থেকে ইউরেসিয়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তারপর ইউরেসিয়া থেকে এসিয়াকে পৃথক করে নিয়ে, তারপর এসিয়া থেকে অপরাপর দেশকে বাদ দিলে তবে আমরা ভারতবর্ষ পাই। এ দেশ অপরাপর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। সুতরাং একে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে ধরে নিয়ে তার বর্ণনা করা যায়। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, বিদেশের সামান্য জ্ঞান না থাকলে স্বদেশেরও বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কথা সত্য। কিন্তু অপর পক্ষে এ কথাও সমান সত্য যে, স্বদেশের বিশেষ জ্ঞান না থাকলে বিদেশের সামান্য জ্ঞান লাভ করা কঠিন। ও ক্ষেত্রে আমরা নাম শিখি—কিন্তু দেশ চিনতে শিখি নে। এই কারণে আজকাল এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলেন যে, প্রথমে বাড়ীর জিওগ্রাফি শিখে তার পর দেশের জিওগ্রাফি শেখাই কর্ত্তব্য। কারণ ছোটর জ্ঞান থেকেই মানুষকে বড়র জ্ঞানে অগ্রসর হতে হয়, ঘর থেকেই বাইরে যেতে হয়। আমি যে এ প্রবন্ধে তার উল্টো পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, বড় থেকে ছোটতে,

বাইরে থেকে ঘরে আস্‌ছি, তার প্রথম কারণ আমি বৈজ্ঞানিক নই—সাহিত্যিক; আর তার দ্বিতীয় কারণ, আমি তোমাদের মনে এই সত্যটি বসিয়ে দিতে চাই যে, ভারতবর্ষ একটা সৃষ্টিছাড়া দেশ নয়।

এসিয়া।

(১)

এসিয়া ব'লে ইউরোপ থেকে কোন পৃথক্ মহাদেশ নেই, এ কথা তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু বহুকাল থেকে মানুষ এই এক মহাদেশকে দুই মহাদেশ বলে আস্‌ছে। ভৌগলিক হিসাবে না হোক্ লৌকিক মতে এসিয়া একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলে যখন গ্রাহ্য, তখন এ ভূভাগকে একটি পৃথক মহাদেশ বলে মেনে নেওয়া যাক্।

ভারতবর্ষ এই মহাদেশের অন্তর্ভূত, অতএব এসিয়ার চেহারাটা এক নজর দেখে নেওয়া যাক্।

এ যুগের জাপানের একজন বড় কলাবিদ্ ও সাহিত্যিক কাকুজো ওকাকুরা, তাঁর Ideals of the East নামক গ্রন্থের আদিতেই বলেছেন যে, Asia is one। এ কথাটা East-এর ideal হতে পারে, কিন্তু বস্তুগত্যা সত্য নয়।

ভৌগলিক হিসেবে এসিয়া চারটি উপ-মহাদেশে (sub-continent) বিভক্ত। কি হিসাবে এসিয়াকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়, তা এখন শোনো।

মনুভাষ্যকার মেধাতিথি বলেছেন যে, "জগৎ সরিৎ সমুদ্রা শৈলাত্মকম্" অর্থাৎ এ জগৎ নদী, সমুদ্র ও পাহাড় দিয়ে গড়া। জগৎ সম্বন্ধে এ কথাটা যে কতদূর সত্য, তা বলতে পারিনে—তবে

একেবারে যে বাজে নয়, তার প্রমাণ চন্দ্র উপগ্রহে পাহাড় আছে, Mars গ্রহে নদী আছে এবং সম্ভবত অপর কোন গ্রহে সমুদ্রও থাকতে পারে। সে যাই হোক্, পৃথিবী সম্বন্ধে মেধাতিথির উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আর এই তিন বস্তুই পৃথিবীকে নানাদেশে বিভক্ত করে রেখেছে।

সমুদ্রের ব্যবধানেই যে মহাদেশ হয়, তার কারণ সমুদ্র আগে ছিল অলঙ্ঘ্য আর এখন হয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য। শৈলমালা সমুদ্রের চাইতে কিছু কম অলঙ্ঘ্য বা দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সুতরাং পর্ব্বতের ব্যবধানও এক ভূভাগকে অপর ভূভাগ থেকে পৃথক করে রাখে।

কালিদাস বলেছেন যে, "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি-দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধ্যবগাহ্য স্থিত পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ"। ভারতবর্ষের উত্তরে স্থিত যে পর্ব্বতশ্রেণীর স্বদেশী অংশকে আমরা হিমালয় বলি, তা অবশ্য এসিয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করছে না। কিন্তু হিমালয় বলতে আমরা যদি সেই শৈলমালা বুঝি, যে পর্ব্বতশ্রেণী সমগ্র এসিয়ার মেরুদণ্ড, আর যাকে এ যুগের ভৌগোলিকরা Central Mountains আখ্যা দিয়েছেন—তাহলে আমরা কালিদাসের উক্তি সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য। এ নগাধিরাজ সত্যসত্যই এসিয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তোয়নিধিতে অবগাহন করে অবস্থিতি করছে। পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর ও পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এ পর্ব্বতশ্রেণী বিস্তৃত। আর পৃথিবী বলতে যদি আমরা সুধু প্রাচীন পৃথিবী বুঝি, তাহলেও কালিদাসের উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। কারণ এসিয়ার এই Central Mountains হচ্ছে প্রাচীন পৃথিবীর mid-world mountains-এরই অংশ। তারপর এ সমগ্র

পর্ব্বত শ্রেণীকে হিমালয় বলা যেতে পারে; কেননা এ পর্ব্বতের অধিকাংশই চির হিমের আলয়।

এই হিমালয়, ভাষান্তরে Central Mountains-এর মত বিরাট প্রাচীর পৃথিবীর আর কোনও মহাদেশকে দু' ভাগে বিভক্ত করে নি। এ প্রাচীরের উত্তরদেশকে এসিয়ার উত্তরাপথ বলা যেতে পারে, এবং দক্ষিণদেশকে দক্ষিণাপথ বলা যেতে পারে। এই প্রাচীর যে কত উঁচু তা ত তোমরা সবাই জানো। এই ভারতবর্ষের উত্তরেই এর পাঁচটি শৃঙ্গ আছে, যার প্রতিটির উচ্চতা হচ্ছে পঁচিশ হাজার ফুটের চাইতেও বেশি। কাশ্মীরে নাংঘা পর্ব্বত উঁচুতে ২৬,৬০০ ফিট, তিব্বতে নন্দদেবী ২৫,৬০০, নেপালে ধবলাগিরি ২৬,৫০০ ফিট, Everest ২৯,০০০, কিন্‌চিন্‌জঙ্গা ২৮,০০০। এখন এ পর্ব্বত প্রস্থে কত বড় তা শোনো।

ভারতবর্ষের পশ্চিমে যে দেশ আছে, সে দেশকে আমরা ইরাণ বলি; আর উত্তরপশ্চিমে যে দেশ আছে, তাকে তুরাণ বলি। ইরাণ ও তুরাণে এই পর্ব্বত কোথাও চার শ' মাইল, কোথাও আট শ' মাইল চওড়া। এ মহাপর্ব্বতের অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। তাদের মিলন ভূমি হচ্ছে Pamir অধিত্যকা। এ অধিত্যকাও প্রায় চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু। এই পামিরের উত্তরে এ পর্ব্বতের প্রস্থ হচ্ছে ১২০০ মাইল, এবং এর সঙ্গে এ পর্ব্বতের নিম্নাংশ অর্থাৎ উপত্যকাগুলি যদি যোগ দেওয়া যায়, তাহলে এ ব্যবধানের প্রস্থ হয় দু' হাজার মাইল—অর্থাৎ হিমালয় হতে কন্যা কুমারিকা যতদূর, ততদূর। এর থেকে দেখতে পাচ্ছ যে, এসিয়ার উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথকে এক দেশ বলা কতদূর সঙ্গত।

এই কারণে এসিয়ার উত্তরাখণ্ডকে একটি উপমহাদেশ বলা হয়। আর তার দক্ষিণাপথের পশ্চিম ভাগকে দ্বিতীয়, পূর্ব্ব ভাগকে তৃতীয়, তার মধ্য ভাগকে চতুর্থ উপমহাদেশ বলা যায়।

এই মধ্যদেশই ভারতবর্ষ। ভূমধ্য পর্ব্বত থেকে এই চারটি উপ-মহাদেশ ঢাল হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে এসেছে। ফলে উত্তর ভাগের সকল নদী উত্তরবাহিনী, ও তারা সব গিয়ে পড়ে Arctic সমুদ্রে; পশ্চিম ভাগের জল গড়িয়ে পড়ে ভূমধ্য সাগরে, পূর্ব্ব ভাগের জল প্রশান্ত মহাসাগরে ও মধ্যদেশের জল ভারত মহাসাগরে। মধ্য এসিয়া পর্ব্বতময়। আর এ পর্ব্বত অর্দ্ধেক এসিয়া জুড়ে বসে আছে। আর তার চারপাশের চার ভাগের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উত্তর দেশ অর্থাৎ Siberia সমতল ভূমি কিন্তু জলবায়ুর গুণে মানুষের বাসের পক্ষে অনুকূল নয়। পশ্চিম একে পাহাড়ে উপরন্তু নির্জ্জলা দেশ। সে দেশের জমিতে ফসল একরকম হয় না বল্‌লেই চলে। ইরাণ তুরাণের অধিকাংশ লোক গৃহস্থ নয়—তারা অন্নের সন্ধানে তাঁবু ঘাড়ে করে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। বাকী দুটি ভূভাগ, ভারতবর্ষ ও চীনদেশ মানুষের বাসের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এ দুটি দেশ মুখ্যতঃ সমতল ভূমি, আর সে ভূমি কর্ষণ করে অন্ন বস্ত্র দুই লাভ করা যায়; অতএব এ দুই দেশের লোকই গৃহস্থ হয়েছে। আর শাস্ত্রে বলে মানুষের সকল আশ্রম গার্হস্থ্য আশ্রমেরই বিকল্প মাত্র।

(২)

এসিয়াকে ত্যাগ করবার পূর্ব্বে সে মহাদেশ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলছি, যা শুনে তোমরা একটু চম্‌কে যাবে। এ মহাদেশের

ম্যাপে একটি দেশ ভুলক্রমে ঢুকে পড়েছে, যেটি ভৌগোলিক হিসেবে এসিয়ার নয়, আফ্রিকার অঙ্গ। সে দেশের নাম আরব দেশ। এই আরব দেশ প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিরই একটি অংশ। তোমরা বোধহয় জানো যে, মরুভূমির একটি ধর্ম্ম হচ্ছে পার্শ্ববর্ত্তী দেশকে আক্রমণ করা। হাওয়ায় তার তপ্ত বালি উড়ে এসে পার্শ্ববর্ত্তী দেশকে চাপা দেয়। তার স্পর্শে গাছপালা তৃণ পুষ্প সবই মারা যায়। মরুভূমির স্থধু বালুকা নয়—তার বায়ুও সমান মারাত্মক। যে দেশের উপর দিয়ে সে বাতাস বয়ে যায়, সে দেশের রসকস্ একেবারে শুকিয়ে যায়। সাহারার এই নিজস্ব বাতাসের নাম Trade winds। একবার Globe-এর দিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে যে, এই Trade winds চলার পথটি হচ্ছে আগাগোড়া পোড়ামাটি।

সাহারামরুভূমি আরব দেশের ভিতর দিয়ে এসে প্রথমে পারসিয়ার দক্ষিণ ভাগকে, তারপর আরও এগিয়ে ভারতবর্ষের সিন্ধু দেশকে আক্রমণ করে। ফলে আরব থেকে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। এ আক্রমণে বাধা দিয়েছে রাজপুতানা। রাজপুতানার চিরগৌরব এই যে, এই রাজপুতানাই হিন্দুস্থানকে এই ক্রমবর্দ্ধমান আফ্রিকার মরুভূমির কবল থেকে রক্ষা করেছে।

এই আরব দেশ যে ভুলক্রমে এসিয়ার ম্যাপে ঢুকে গেছে, তার কারণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মানচিত্রকাররা লোহিত সমুদ্রকে আফ্রিকা ও এসিয়ার মধ্যে পরিখা বলে ধরে নিয়েছিলেন। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায়, এ সমুদ্রও আসলে মরুভূমি। এর উপরে যেটুকু জল আছে, তা ভারত-মহাসাগরের দান।

(৩)

ভারতবর্ষকে যদি এসিয়াখণ্ডের একটি উপ-মহাদেশ না বলে, একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ বলা যায়, তাহলেও কথাটা অসঙ্গত হয় না।

ভারতবর্ষ মাপে ১,৫০০০,০০০ বর্গ মাইল। এক চীন ব্যতীত এত বড় দেশ এসিয়ায় আর কোথাও নেই। এসিয়ার রুসিয়া, ম্যাপে দেখতে প্রকাণ্ড দেশ; কিন্তু এর দক্ষিণাংশে এত বড় বড় হ্রদ মরুভূমি তৃণ কান্তার ও পর্ব্বত আছে যে, সে অংশটিকে একটি দেশ বলা যায় না। কারণ সে ভুভাগ মানুষের বাসের অযোগ্য। আর এর উত্তরাংশের জমি সমতল হলেও আজও জমাট মাটি হয়ে ওঠে নি। এ দেশে গাছপালা অতি বিরল, যে দুটি চারটি আছে তারা সব বামন। এ রকম দেশ যে কৃষীকার্য্যের জন্য অনুপযোগী, সে কথা বলাই বাহুল্য। ফলে সাইবিরিয়া একরকম জনশূন্য বললেই হয়।

ভারতবর্ষ যে আকারে বিপুল, সুধু তাই নয়! এ দেশ এসিয়ার অপরাপর দেশ থেকে একরকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এর উত্তরে হিমালয়ের গগনস্পর্শী প্রাচীর; আর তিন দিকে ভারত মহাসাগরের অতলস্পর্শী পরিখা। তোমরা ভেবো না যে আমি ভুল করছি। আরব সাগর, বঙ্গ উপসাগর প্রভৃতি নাম আমিও জানি; কিন্তু ও-সব সাগর উপসাগর ভারত মহাসাগরেরই অংশ মাত্র। ভারতবর্ষ তার উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব কোণে সুধু অপর দেশের সঙ্গে সংলগ্ন। তার উত্তরপশ্চিমে আফগানিস্থান, এবং উত্তরপূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। কিন্তু এ দুই দিকেই আবার অতি দুর্গম পর্ব্বতের ব্যবধান আছে। যে পর্ব্বতশ্রেণী আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানকে হিন্দুস্থান

থেকে পৃথক করে রেখেছে, সে পর্ব্বতশ্রেণীর অবশ্য দুটি দুয়োর আছে — Khyber Pass ও Bolan Pass, যার ভিতর দিয়ে এ দুই দেশে মানুষে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে যাবার পথ আজও বঙ্গোপসাগরের জলপথ।

(৪)

দেখতে পাচ্ছ স্বয়ং প্রকৃতিই ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ করে গড়েছেন।

এখন দেখা যাক্, এই সমগ্র দেশটার আকার কিরকম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমগ্র পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলতেন। সম্ভবত পৃথিবী বলতে তাঁরা ভারতবর্ষ বুঝতেন। কেননা ভারতবর্ষ সত্য সত্যই ত্রিকোণ।

মানুষে যতক্ষণ জ্যামিতির কোনও মূর্ত্তির সঙ্গে কোনও দেশকে মেলাতে না পারে, ততক্ষণ তার মনস্তুষ্টি হয় না; যদিও জ্যামিতির কোন আকারের সঙ্গে কোন দেশই হুবহু মিলে যায় না। পৃথিবীকে আমরা বলি গোলাকার। কথাটা মোটামুটি সত্য। কিন্তু জ্যামিতির বৃত্তের উত্তরদক্ষিণ চাপা নয়। ইউক্লিডের তৃতীয় অধ্যায়ে কমলালেবুর কোনও স্থান নেই। এই কথাটা মনে রাখলে, মহাভারতে ভারতবর্ষকে যে একটি সমভুজ ত্রিকোণ দেশ বলা হয়েছে, সে উক্তিকে গ্রাহ্য করে নিতে আমাদের কোনও আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

পৃথিবীতে এমন কোনই দেশ নেই, যা সম্পূর্ণ একাকার। ভারতবর্ষও একাকার নয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষকেও নানা খণ্ডে বিভক্ত করা যায়। এখানে একটি কথা বলে রাখি। রাজ্যের ভাগের

সঙ্গে ভৌগোলিক ভাগের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। অর্দ্ধেক পৃথিবী আজ ব্রিটীশরাজের অধীন; কিন্তু তাই বলে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষকে পাগল ছাড়া আর কেউ এক দেশ বলবে না। আমি যে ভাগের কথা বলছি, সে ভৌগোলিক ভাগ।

আমাদের শাস্ত্রে ভারতবর্ষকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পুরাণকারদের মতে ভারতবর্ষ নবখণ্ড। বরাহমিহির প্রভৃতি গণিৎ-শাস্ত্রীরা পৌরাণিকদের সঙ্গে একমত। যদিচ এ দুয়ের বর্ণিত নবখণ্ডের মিল নেই। মহাভারতের মতে এ দেশ চার খণ্ডে বিভক্ত। চারটি Equilateral triangle-এর সমষ্টি হচ্ছে ভারতবর্ষ নামক বড় Equilateral triangle! জ্যামিতির হিসেব থেকে যদিও এ বর্ণনা সত্যের কাছ ঘেঁসে যায়, কিন্তু ভৌগোলিক হিসেব থেকে অনেক দূরে থাকে। সে যাই হোক্, সংস্কৃত সাহিত্যে আর একরকম ভাগের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষ মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের নাম উত্তরাপথ, অপরটির দক্ষিণাপথ। এই লৌকিক ভাগটিই প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক। উত্তরাপথ ভৌগোলিক হিসেবে দক্ষিণাপথ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন।

হিমালয় যেমন সমস্ত এসিয়ার মেরুদণ্ড, বিন্ধ্যপর্ব্বত তেমনি ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড। এ স্থলে আমি সাতপুরা ও আরাবলি পর্ব্বতকে বিন্ধ্য নামে অভিহিত করছি। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যের দেশকে উত্তরাপথ বলা যায়—আর দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত থেকে ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী দেশকে দক্ষিণাপথ বলা যায়। কিন্তু তোমরা ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখতে পাবে, আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিমে ও রাজমহলের পূর্ব্বেও অনেকখানি

জমি পড়ে রয়েছে। এই পশ্চিম অংশের নাম পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশ, আর পূর্ব্ব অংশের নাম বঙ্গদেশ ও আসাম। এ দুটিকেও উত্তরাপথের অন্তর্ভূত করে নিতে হবে।

উত্তরাপথ।

প্রথম জিনিষ যা চোখে পড়ে সে হচ্ছে এই যে, এই বিস্তৃত ভূভাগের ভিতর কোনরূপ পাহাড় পর্ব্বত নেই—সমস্ত উত্তরাপথ সমতল ভূমি। এর ভিতর এক জায়গায় সুধু একটু অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি আছে। পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের মিলনস্থল হচ্ছে সেই উচ্চ ভাগ। উত্তরাপথের এই জায়গাটার গড়ন কাছিমের পিঠের মত। ফলে এ স্থানের পশ্চিমের যত নদী সব পশ্চিমবাহিনী ও পূর্ব্বের যত নদী সব পূর্ব্ববাহিনী।

এই পশ্চিম ভাগের নদী পাঁচটির নাম ঝিলম, চেনাব, রাবি, বিয়াস ও সৎলেজ। এ পাঁচটিরও জন্মভূমি হচ্ছে হিমালয়, আর এ পাঁচটিই পথিমধ্যে এ ওর সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষটা ভারতবর্ষের সব চাইতে পশ্চিমের নদী সিন্ধুনদের সঙ্গে মিশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। তোমরা বোধহয় জানো যে, পাহাড় থেকে নদী যে মাটি কেটে নিয়ে আসে সেই মাটি দিয়েই সমতল ভূমি তৈরী হয়। এই পঞ্চ নদের কৃপায় পঞ্চনদ দেশ ওরফে পাঞ্জাব তৈরী হয়েছে। আর এই দেশটাকে Indus Valley বলা হয়। কারণ সিন্ধুই হচ্ছে এই পঞ্চ নদের ভিতর মহানদ।

(১)

উত্তরাপথের পূর্ব্ব ভাগের প্রধান নদীগুলির নাম যমুনা, গঙ্গা, গোমতী, গোগরা, গণ্ডক ও কুশি। এ সকল নদীরই উৎপত্তি

হিমালয়ে, আর এদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে গঙ্গা। অপর পাঁচটি একে একে গঙ্গায় মিশে গিয়েছে। সিন্ধুনদের সঙ্গে গঙ্গার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সিন্ধুনদ তার আগাগোড়া জল হিমালয়ের কাছ থেকে পায়। গঙ্গা কিন্তু কিছু জল বিন্ধ্যপর্ব্বতের কাছ থেকেও পায়। চম্বাল ও সোন এই দুই নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে বিন্ধ্যপর্ব্বত। আর এই দুই নদীই উত্তরাহিনী হয়ে এসে গঙ্গায় পড়েছে। সংস্কৃত ভাষায় জলের আর এক নাম জীবন। তাই বলছি গঙ্গাই হচ্ছে উত্তরাপথের জীবন। ও দেশের বুকের ভিতর দিয়ে গঙ্গা যদি রক্তের মত বয়ে না যেত, তাহলে উত্তরাপথের প্রাণবিয়োগ হত। এই গাঙ্গেয় দেশই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দুস্থান।

আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিমে ও দক্ষিণে হচ্ছে মরুভূমি। সিন্ধুনদ দক্ষিণাংশে এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই সিন্ধুনদীর দু' পাশের দেশের নাম সিন্ধুদেশ।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের একরকম গা ঘেঁসে পূর্ব্বে অনেক দূর এসে গঙ্গা রাজমহলের কাছে পর্ব্বতের বাধা হতে অব্যাহতি লাভ করে', দক্ষিণ বাহিনী হয়ে সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তারপর দক্ষিণে অনেক দূর এসে গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়েছেন। এই ব্রহ্মপুত্রেরও জন্মস্থান হিমালয়। ব্রহ্মপুত্র লক্ষ্ণৌয়ের উত্তরে হিমালয়ে থেকে বেরিয়ে পূর্ব্বমুখে বহুদূর পর্য্যন্ত হিমালয়ের ভিতর দিয়েই প্রবাহিত হয়ে, ভুটানের পূর্ব্বে এসে দক্ষিণবাহিনী হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশে গেছেন। তারপর এই মিলিত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র আরও দক্ষিণে এসে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়লেন।

মেঘনার জন্মভূমি হচ্ছে গারো লুসাই পর্ব্বত। এই তিন নদীতে মিলে বাঙলা দেশ গড়েছে।

উত্তরাপথের পশ্চিম দেশ সিন্ধুদেশ যেমন শুক্‌নো, তার পূর্ব্বদেশ বাঙলা তেমনি ভিজে। সিন্ধুদেশের সক্কর নামক স্থানের মত গরম জায়গা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তার পাশে রোড়ি নামক স্থানে গত বারো বৎসরে মোটে ছ'পসলা বৃষ্টি হয়েছে। অপর পক্ষে বাঙলার মত ভিজে দেশও ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই।

দক্ষিণাপথ।

(১)

এখন দক্ষিণাপথে যাওয়া যাক্।

এ ভুভাগ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এটি উত্তরাপথ থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন।

অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের মাথা নীচু করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে মাথাকে ভূমিলুণ্ঠিত করতে পারেন নি। ফলে এই দুই ভাগের ভিতর যাতায়াতের সুগম পথ নেই। উত্তরাপথ থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে এমন কোনও নদী নেই, সুতরাং এ দুই দেশের ভিতর জলপথ নেই। গঙ্গানদী বিন্ধ্যপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করে ও সিন্ধুনদ সে পর্ব্বতকে বাঁয়ে ফেলে রেখে তারপর সমুদ্রে এসে পড়েছে।

তারপর এ দুয়ের ভিতর কোনও স্থল পথও নেই। এক রেলের গাড়ী ছাড়া আর কোনওরকম গাড়ী—গরুর ঘোড়ার কি উটের বিন্ধ্যপর্ব্বতের এক পাশ থেকে অপর পাশে যেতে পারে না।

মানুষে পায়ে হেঁটে যখন হিমালয় পার হয়ে যায়, তখন বিন্ধ্যপর্ব্বত তার চলাচলের পথ বন্ধ করতে পারে নি। মানুষের অবশ্য অগম্য স্থান ভূ-ভারতে নেই—কিন্তু দুর্গম স্থান আছে। এই বিন্ধ্য অতিক্রম করবার পথ সেকালে অত্যন্ত দুর্গম ছিল। রামচন্দ্র পায়ে হেঁটে বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হয়ে দক্ষিণাপথে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফিরতি বেলায় তিনি বিমানে চড়ে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করাই বেশি আরামজনক অতএব সুযুক্তির কাজ মনে করেছিলেন।

সেকালে বিন্ধ্যপর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে আসবারও বিশেষ অসুবিধা ছিল। আরাবলি পর্ব্বতের পশ্চিম দিয়ে আসতে হলে মরুভূমি অতিক্রম করে আসতে হত। অপর পক্ষে রাজমহলের পূর্ব্ব দিয়ে বাঙলায় এসে সমুদ্রের ধার দিয়ে মাদ্রাজ পৌঁছতে অনেক দিন নয়, অনেক বছর লাগত। এক রাজা ও সন্ন্যাসী ছাড়া ও রকম দেশভ্রমণ বোধহয় সেকালে অপর কেউ করত না। সমগ্র ভারতবর্ষকে এ ভাবে প্রদক্ষিণ করতেন রাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে, আর সন্ন্যাসী তীর্থভ্রমণে।

এই বিন্ধ্যপর্ব্বতের ভিতর একটি ফাঁক আছে—খাণ্ডোয়া নামক স্থানে। এলাহাবাদ থেকে বম্বে যাবার রেল পথ এই খাণ্ডোয়ার ফাঁক দিয়েই যায়। এবং সেকালে এই দুয়োর দিয়েই বোধহয় উত্তরাপথের লোক দক্ষিণাপথে প্রবেশ করত। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি বড় কৌটোর মধ্যে আর একটি ছোট কৌটো।

(২)

দক্ষিণাপথ উত্তরাপথ থেকে সুধু বিচ্ছিন্ন নয়—বিভিন্ন, আকৃতিতেও, প্রকৃতিতেও।

উত্তরাপথকে একটি চতুর্ভূর্জ হিসেবে ধরা যায়, কিন্তু দক্ষিণাপথ হচ্ছে একটি স্পষ্ট ত্রিভুজ। একটি উল্টো পিরামিড, যার base হচ্ছে বিন্ধ্য, আর apex কুমারিকা অন্তরীপ। এর উভয় পাশই পাহাড় দিয়ে বাঁধানো। পশ্চিম দিকের পর্ব্বতের নাম পশ্চিমঘাট, পূর্ব্বদিকের পূর্ব্বঘাট। এই দুই পর্ব্বত এসে মিলিত হয়েছে কুমারিকা অন্তরীপের একটু উত্তরে। এর দক্ষিণে যে জায়গাটুকু আছে, তার পূর্ব্বে আর পাহাড় নেই, কিন্তু পশ্চিমে আছে Cardamom Hills।

উত্তরাপথ হচ্ছে সমতল ভূমি, কিন্তু দক্ষিণাপথ মালভূমি। অর্থাৎ ইরাণ দেশের মত এ দেশও হচ্ছে পর্ব্বতের উপত্যকা; সুধু ইরাণের উপত্যকা হচ্ছে প্রায় তিন হাজার ফিট উঁচু, ও দক্ষিণাপথের হাজার ফিট। সুতরাং এ পিরামিডকে পাথরে-গড়া বলা যেতে পারে। এ ভুভাগে সমতল ভূমি আছে সুধু পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে ও সমুদ্রের উপকুলে, যে দেশকে আমরা মালবার দেশ বলি; ও পূর্ব্ব সমুদ্রের উপকুলে, যে দেশকে আমরা করমণ্ডল বলি। দক্ষিণাপথের অন্তরেও কিছু কিছু সমতল ভূমি আছে, তার পরিচয় পরে দেব।

এই মালাবার দেশটি অতি সঙ্কীর্ণ, করমণ্ডল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। যদি একটি বিমানে চড়ে দূর থেকে দেখা যায় ত দেখা যাবে যে, দক্ষিণাপথের পশ্চিম পাড় বেজায় মাথা উঁচু করে রয়েছে—পশ্চিমঘাট যেন সমুদ্র থেকে ঝাঁপিয়ে উঠেছে আর করমণ্ডল একেবারে সমুদ্রের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। এ অংশের তালিবন যেন সমুদ্র থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কালিদাস যে বলেছেন—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী, তমালতালী বনরাজি নীলা।
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশে ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥
সে বেলা হচ্ছে Coromandel Coast।

(৩)

দক্ষিণাপথের উত্তরে দুটি অপূর্ব্ব নদী আছে, নর্ম্মদা ও তাপ্তি। নর্ম্মদা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপত্যকার ভিতর দিয়ে, ও তাপ্তি সাতপুরা পর্ব্বতের দক্ষিণ পাদদেশ ঘেঁসে পশ্চিমবাহিনী হয়ে Gulf of Cambay-তে গিয়ে পড়ছে।

এ দুই নদী মানুষের বিশেষ কোনও কাজে লাগে না। এ নদী দুটি মানুষের যাতায়াতের জলপথ নয়। তারপর এদের পলিতে কোনও সমতল দেশ গড়ে ওঠে নি। এরা দুটিতে মিলে সাগর-সঙ্গমের মুখে খালি একটুখানি মাটি তৈরী করেছে।

এ দেশের দক্ষিণের নদী কটি সবই পূর্ব্ববাহিনী। প্রথম গোদাবরী, দ্বিতীয় কৃষ্ণা, তৃতীয় কাবেরী। এ তিনটি নদীরই জন্মভূমি হচ্ছে পশ্চিম ঘাট, আর এ তিনটিই এসে পড়ছে বঙ্গ-উপসাগরে।

এই তিনটি নদীর উভয় কূলে অল্পস্বল্প সমভূমি আছে, যেখানে ফসল জন্মায়। এই তিনটি নদীর হাতে করমণ্ডল দেশ গড়ে উঠেছে। দক্ষিণাপথের ভিতর থেকে মালাবার ও কোঙ্কন যাবার কোনও পথ থাকৃত না, যদি না পশ্চিম ঘাটের ভিতর তিনটি ফাঁক থাকৃত— উত্তরে থালঘাট ও বোরঘাট, দক্ষিণে পালঘাট। এইখানেই Coimbatore নামক সহর। এই Coimbatore-এর দুয়োরই দক্ষিণাপথের অন্তরের সঙ্গে তার পশ্চিম উপকূলের যোগ রক্ষা

করেছে। দক্ষিণাপথ ও বাঙলার ভিতর আর দুটি দেশ আছে—উত্তরে Central Provinces ও দক্ষিণে উড়িষ্যা।

Central Provinces পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা—উড়িষ্যার অনেকটাই সমভূমি। মহানদী এই সমভূমি গড়েছে। এ দুটি দেশ সম্ভবত কখনই দক্ষিণাভুক্ত হয় নি বলে একে উত্তরাপথের ভিতর টেনে আনা যায়। আজকাল আমরা যাকে Bombay Presidency ও Madras Presidency বলি, সে দুই এই দক্ষিণাপথেরই অন্তর্ভূত। সুধু সিন্ধু দেশটি বম্বের গভর্ণরের অধীন হলেও দক্ষিণাপথের অন্তর্ভূত নয়।

(৪)

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের উপরে চারটি দেশ আছে, যেগুলি ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত। পশ্চিমে কাশ্মীর, তার পূর্ব্বে নেপাল, তার পূর্ব্বে সিকিম ও পূর্ব্বপ্রান্তে ভুটান।

কাশ্মীরের লোকের ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, নেপালেরও তাই; অপর পক্ষে সিকিম ভুটানের ভাষা চীন বংশীয়। এই নেপালেই পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে আগত আর্য্যজাতি এবং পূর্ব্ব ও উত্তর থেকে আগত চীন জাতি মিলেমিশে একজাতি হয়ে গিয়েছে। এদেশে সুধু দুই জাতির নয়, দুই সভ্যতারও মিলন ঘটেছে। তাই নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম পাশাপাশি বাস করছে। কাশ্মীরে অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম পাশাপাশি বাস করছে, কিন্তু এই দুই ধর্ম্ম পরস্পরের অস্পৃশ্য, ফলে উভয় ধর্ম্মই নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রক্ষা করে চলেছে। অপর পক্ষে নেপালের বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের বিকার অথবা নেপালের হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকার বললেও অত্যুক্তি হয় না। সিকিম,

ভুটানের সংস্রব আসলে বাঙলা দেশের সঙ্গে। শুনতে পাই, বাঙলার লোকের দেহে চীনের রক্ত আছে। সেই সঙ্গে বাঙালীর মনেও কিঞ্চিৎ চৈনিক ধর্ম্ম আছে কিনা বলতে পারিনে।

দেশের পণ্ডিত লোক সব আজকাল বেদের পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দেশে মহা খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ করেছেন। বেদ উদ্ধারের পর আমাদের পণ্ডিতরা যদি তন্ত্রের সন্ধানে বেরন, তাহলে আমার বিশ্বাস তাঁদের উত্তর-পশ্চিম দেশকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্বে আসতে হবে। তখন r search work-এর পীঠস্থান হবে প্রথমে ভুটান, পরে সিকিম। তন্ত্র-শাস্ত্রের পুঁথি খুললেই পাতায় পাতায় মহাচীনের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। সে যাই হোক্, ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরাণ ও উত্তরে তুরাণের মত তার পূর্ব্বে মহাচীনকেও পুরাতত্ত্ববিৎ, ভাষাতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎরা উপেক্ষা করতে পারেন না। সম্প্রতি অবগত হয়েছি যে, পণ্ডিতরা আজকাল Tarim দেশ নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছেন। Tarim অবশ্য চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত তুর্কস্থানে। সুতরাং আশা করা যায় যে, তাঁরা খোটান থেকে ভুটানে অচিরে নেবে পড়বেন।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি।

(১)

এতক্ষণে তোমরা ভারতবর্ষ নামক মহাদেশটির আর তার অন্তর্ভূত খণ্ড দেশগুলির আকৃতির মোটামুটি পরিচয় পেলে। এখন তার প্রকৃতির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাক্।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষ হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তবে উত্তরাপথের সঙ্গে দক্ষিণাপথের এ বিষয়েও একটু প্রভেদ আছে। তোমরা বোধ-হয় গ্লোবে লক্ষ্য করেছ যে পিপের গায়ে লোহার পৎরার বাঁধনের মত কতকগুলি কালো কালো রেখা এই গোলকটির দেহ বেষ্টন করে আছে। এই রেখাগুলির ভিতর দুটি রেখার একটু বিশেষত্ব আছে। সে দুটি একটানা নয়, কাটা কাটা। এ উভয়ের মধ্যে Equator-এর উত্তরে যে রেখাটি আছে, সেটির নাম Tropic of Cancer; আর Equator-এর দক্ষিণে যেটি আছে, তার নাম Tropic of Capricorn।

সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর কি যোগাযোগ আছে, তাই দেখাবার জন্য এ দুটি রেখা আঁকা হয়েছে। এই রেখাঙ্কিত জায়গাতেই সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর উপর ঠিক খাড়া হয়ে পড়ে—অপর সব স্থানে তেরচা ভাবে। এই Tropic of Cancer-এর উত্তর দেশ শীতের দেশ, আর Tropic of Capricorn-এর দক্ষিণদেশও শীতের দেশ।

আর এই রেখাদ্বয়ের মধ্যের দেশ সব দারুণ গরম দেশ। ভারত-বর্ষের উত্তরাপথ প্রায় সমস্তটাই Tropic of Cancer-এর উত্তরে ও দক্ষিণাপথ আগাগোড়া তার নীচে। ফলে দক্ষিণাপথে শীত ঋতু বলে কোনও ঋতু নেই। জনৈক ইংরাজ বলেছেন যে, দক্ষিণাপথ হচ্ছে Nine months hot and three months hotter। কথাটা Kipling-এর মুখ থেকে বেরলেও মিথ্যে নয়। উত্তরাপথে কিন্তু শীতগ্রীষ্ম দুই বেশি। দক্ষিণাপথে গ্রীষ্মকালে গরম যে উত্তরাপথের মত অসহ্য হয় না, তার কারণ দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে প্রথমত উঁচু, দ্বিতীয়তঃ তার তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা।

মাটি।

(১)

. তারপর ভারতবর্ষের এ দুই ভূভাগের মাটিও এক জাতের নয়, এবং তাদের গুণাগুণও পৃথক। মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কারবার প্রধানতঃ মাটি নিয়ে। গাছপালা তৃণ শস্য সব মাটিতেই জন্মায়। এবং অনেক পণ্ডিতের মতে সব জীবজন্তুর ন্যায় মানুষের আদি মাতা হচ্ছে ভূমি। এ মতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা কোন্ জমিতে কে জন্মেছে তার থেকেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব নির্ণয় করেন।

এ সত্ত্বেও আমাদের জানা উচিত যে, মাটি হচ্ছে পৃথিবীর চামড়া মাত্র। ও চামড়ার নীচে পাথর আছে, যে পাথর থেকে কিছুই জন্মায় না,—জীবজন্তুও নয়, গাছপালাও নয়। মা বসুন্ধরা আসলে পাষাণী।

এই মাটিও পাথরের বিকার মাত্র। অর্থাৎ হয় পাথরকে পুড়িয়ে না হয় গলিয়ে মাটি তৈরী করতে হয়। জলের কাজ হচ্ছে পাথরকে চূর্ণ করা, ও অগ্নির কাজ হচ্ছে তাকে দ্রব করা।

নদ নদী পাহাড় থেকে বেরয়, পাহাড় ভেঙে। আর তারা যে চূর্ণ পাষাণ বয়ে নিয়ে আসে, তাই দিয়ে যে মাটি গড়ে, সেই মাটিকে আমরা পলি মাটি বলি। সেই মাটিই প্রধানতঃ গাছপালার জন্মভূমি। আর সমগ্র উত্তরাপথ প্রায় এই মাটিতেই তৈরী।

আমরা ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ, Peninsula বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ত্রিকোণ দক্ষিণাংশই একটি উপদ্বীপ। এ অংশ অতি পুরাকালে একটি দ্বীপ মাত্র ছিল। হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যের দেশ তখন জলমগ্ন ছিল। তারপর সেই জলমগ্ন দেশ যখন হিমালয়ের নদ নদীর কৃপায় উত্তরাপথ হয়ে উঠল, তখন তার দক্ষিণ দ্বীপ উত্তরা-

পথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ সৃষ্টি করলে। দক্ষিণাপথ উত্তরাপথের চাইতে ঢের প্রাচীন দেশ। তোমরা যখন Geology পড়্‌বে, তখন এ দেশের বয়সের গাছপাথরের অথবা গাছ পাথরের বয়েসের হিসেব পাবে।

(২)

দক্ষিণাপথের বেশির ভাগ মাটি পলি মাটি নয়, অর্থাৎ নদ-নদীর দান নয়; সে মাটি চূর্ণ পাথর নয়, গলা পাথর। আগ্নেয়গিরি হতে এ মাটি বহির্গত হয়েছে। আগ্নেয়গিরি হতে যে গলা পাথরের (lava) উদ্গম হয়েছে, তাই হচ্ছে দক্ষিণাপথের মাটি। উত্তরাপথ বরুণ দেবতার সৃষ্টি, দক্ষিণাপথ অগ্নিদেবতার। এ দুই মাটি এক জাতেরও নয়, এবং এ দুয়ের ধর্ম্মও এক নয়।

এ দুই দেশের জলবায়ুও বিভিন্ন। মেঘ আসে সমুদ্র থেকে, আর পবনদেবই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে আসেন। সুতরাং কোন দেশে কত বৃষ্টি হয় তা নির্ভর করে কোন দেশে, কোন দিক্ থেকে কি বাতাস বয়, তার উপর। তোমাদের পূর্ব্বে বলেছি যে, সিন্ধুদেশ হচ্ছে অনাবৃষ্টির ও আসাম অতিবৃষ্টির দেশ। এর মধ্যবর্ত্তী দেশ অল্পবৃষ্টির দেশ। অপর পক্ষে দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূল অতিবৃষ্টির দেশ, ও তার পূর্ব্ব অংশই অনাবৃষ্টির দেশ।

যে বায়ুকে আমরা monsoon নামে আখ্যাত করি, তার চলবার পথ হচ্ছে ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিম কোণ থেকে উত্তরপূর্ব্ব কোণে। এ বাতাস প্রথমে মালাবার দেশকে জলে ভাসিয়ে দেয়, তারপর

হয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব থেকে উত্তরপশ্চিমে। এই বাতাস বাঙলা ও আসামের গায়ে প্রচুর জল ঢেলে দিয়ে তারপর উত্তরাপথের অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানেই এ দেশে বর্ষা ঋতু দেখা দেয়। Monsoon কিন্তু পঞ্চনদ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠতে পারে না। এ জন্য বাঙলায় যখন বৃষ্টি হয়, পাঞ্জাব তখন শুখনো। পাঞ্জাবে শীত-কালই বর্ষাকাল।

(৩)

ভারতবর্ষের লোক শতকরা ৯০ জন হচ্ছে কৃষিজীবী। এই কারণে ভারতবর্ষ নাগরিক দেশ নয়, গ্রাম্য দেশ। এ দেশে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাম আছে, আর পঁচাত্তরটিও নগর নেই। নগরেও একরকম সভ্যতার সৃষ্টি হয়, যেমন হয়েছিল পুরাকালে গ্রীসের আথেন্স ও ইতালির রোম নগরীতে। আর সেই সভ্যতাই কতক অংশে বর্ত্তমান ইউরোপের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। এই সহুরে মনোভাব থেকে নিস্কৃতি না পেলে মানুষের মন ভারতবর্ষ ও চীন দেশের সভ্যতার প্রতি অনুকুল হয় না। এই কারণেই ইউরোপের সাধারণ লোক ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অসাধারণ লোকে—অর্থাৎ যারা শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বিলেতের সাধারণ লোকের সামিল হয়ে গিয়েছে,—তারা ভারতবর্ষের সভ্যতাকে অসভ্যতা মনে করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা জন্ম লাভ করেছে সহরে ও সেইখানেই লালিত পালিত হয়েছে; অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে বনে, অর্থাৎ ঋষির আশ্রমে, ও সেইখানেই লালিত পালিত হয়েছে।

এ দেশ যদি ঋষিক্ষেত্র হয়, তার কারণ এ দেশ মূলে কৃষিক্ষেত্র। বন গ্রামেরই অপর পৃষ্ঠা। আশ্রম মাটির নয়, মনেরই কৃষিক্ষেত্র।*

আজকাল অনেক ইংরাজীশিক্ষিত সদাশয় লোক village organisation করবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মানুষ কৃষিকর্ম্মের জন্য যুগ যুগ ধরে যে organisation করেছে, তারই নাম কি village নয়? Village জিনিষটে সুধু Organised নয়, কালবশে প্রতি গ্রাম এক একটি organism হয়ে উঠেছে। Organism কে Organise করবার প্রবৃত্তিটি যেমন উচ্চ তেমনি নিরর্থক। Organismsও ব্যাধিগ্রস্ত হয়; যদি আমাদের দেশের গ্রামসমূহ তাই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের ব্যাধিমুক্ত করবার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু চিকিৎসার নাম Organisation নয়; Organise মানুষে করে শুধু কল-কারখানা। যে ভূভাগকে ভগবান চাষের দেশ করে গড়েছেন, তাকে আমরা পাঁচজনে কল-কারখানার দেশ তৈরী করতে পারব না,—তা চাষার মুখের গ্রাস কেড়ে টাটা কোম্পানীর লোহার-কলের পেট যতই কেন ভরাই নে কেন। ভারতবর্ষ কখন বিলেত হবে না। মনে ভেবো না যে আমি ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে সুরু করেছি। পুরাণকারেরা বলেছেন যে ভারতবর্ষ হচ্ছে আসলে কর্ম্মভূমি, আর এ দেশ সেই কর্ম্মের ভূমি, যে কর্ম্ম দেব-দানবরা করতে পারেন না। এ কর্ম্ম হচ্ছে কৃষিকর্ম্ম। আর এইটিই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির গোড়ার কথা আর অন্তরের কথা। আর এই ভিত্তির উপরেই ভারতবাসীর মনপ্রাণ গড়ে উঠেছে। এ সত্য উপেক্ষা করলে সেকালের ধর্ম্মশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না, একালের অর্থশাস্ত্রেও অধিকার জন্মাবে না।—আর তখন তোমরা ধর্ম্ম বলতে

বুঝবে অর্থ, আর অর্থ বলতে বুঝবে ধর্ম্ম ; যেমন আজকালকার পলিটিসিয়ানরা বোঝেন।

উদ্ভিদ।

(১)

মানুষের জীবন উদ্ভিদের জীবনের অধীন। উদ্ভিদের কাছ থেকে যে আমরা স্থধু অন্ন পাই তাই নয়, বস্ত্রও পাই। ভারতবর্ষের বৃক্ষলতা তৃণশস্য আমাদের এই দুই জিনিষই যোগায়। উত্তরাপথ প্রধানতঃ আমাদের দেয় অন্ন আর দক্ষিণাপথ বস্ত্র।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ রুটির দেশ, পূর্ব্বাংশ ভাতের দেশ। প্রথমতঃ ধান জন্মায় অতিবৃষ্টির দেশে, ও গম জন্মায় অল্পবৃষ্টি এমন কি অনাবৃষ্টির দেশে। তারপর ধানের জন্য চাই নরম মাটি, ও গমের জন্য শক্ত মাটি। বাঙলার মাটিও নরম আর এখানে বৃষ্টিও হয় বেশী, তাই বাঙলা হচ্ছে আসলে ধানের দেশ। পঞ্জাবে বৃষ্টি কম ও মাটি শক্ত, তাই পঞ্জাবে প্রধান ফসল হচ্ছে গম। সিন্ধুদেশেও আজকাল দেদার গম জন্মাচ্ছে। অনেক উদ্ভিদের মাথায়ও জল ঢালতে হয়, গোড়ায়ও জল দিতে হয়। ধান বৃষ্টির জলে স্নান না করতে পেলে বাঁচে না। কিন্তু খেজুর গাছের মাথায় এক ফোঁটাও জল দিতে হয় না। গোড়ায় রস পেলে ও গাছ তেড়ে বেড়ে ওঠে। এ কারণ সাহারা মরুভূমি ও আরবদেশই আসলে খেজুরের দেশ। ও দুই মরুভূমির ভিতর যেখানে একটু জল আছে, সেইখানেই চমৎকার খেজুর জন্মায়। জানোয়ারের ভিতর যেমন উট, গাছের ভিতর তেমনি খেজুর—মরুভূমিরই জীব। গমের মাথায়ও বারিবর্ষণ করবার দরকার

নেই। মরুভূমির ভিতর নালা কেটে যদি জল নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেই সেখানে গম জন্মায়, ও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শস্যের যে স্মধু পিপাসা আছে তাই নয়, ক্ষিধেও আছে। মাটির ভিতর যে রাসায়নিক পদার্থ ওরফে সার থাকে, তাই হচ্ছে শস্যের প্রধান খাদ্য। যে দেশে বেশি বৃষ্টি হয়, সে দেশের মাটি থেকে এই সার ধুয়ে যায়। মরুভূমির অন্তরে কিন্তু এ সার সঞ্চিত থাকে। সেখানে অভাব স্মধু জলের। তাই মরুভূমির অন্তরে জল ঢোকাতে পারলেই যে সব শস্যের স্মধু গোড়ায় জল চাই, সে সব শস্য প্রভূত পরিমাণে জন্মায়! সিন্ধুনদ থেকে খাল কেটে জল নিয়ে গিয়ে সিন্ধু দেশকে এমন শস্য-শ্যামলা করে তোলা হয়েছে।

(২)

দক্ষিণাপথের ভিতরকার মাটি পলি মাটি নয়, আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গত পাথর-গলা মাটি। এ মাটিতে খাবার জিনিষ তেমন জন্মায় না, আর দক্ষিণাপথের অপর মাটিও অতি নিরেস মাটি, তাতে ধান জন্মায় না। গমও জন্মায় না, জন্মায় শুধু বাজরি আর জোয়ারি, আর তারি রুটি খেয়েই এ দেশের লোক জীবন ধারণ করে। এ দু ভাগের দুটি অংশ কিন্তু খুব উর্ব্বর, পশ্চিমে মালাবার ও পূর্ব্বে করমণ্ডল উপকূল। মালাবার নারিকেল গাছের দেশ, আর করমণ্ডল তাল গাছের। তা ছাড়া এই দেশে শস্যও প্রচুর জন্মে। তবুও দক্ষিণাপথ নিজের দেশেরই খোরাক জুগিয়ে উঠিতে পারে না, দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু এই দক্ষিণাপথের আর একটি সম্পদ আছে। আগ্নেয়-গিরির পাথর-গলা মাটিকে Black cotton soil বলা হয়, কারণ ও

মাটির রং কালো ও তাতে কাপাস জন্মায়। এ দেশে এত কাপাস জন্মায় যে, দক্ষিণাপথ সুধু সমগ্র ভারতবর্ষকে নয়, দেশ বিদেশকে তুলো যোগায়। বাঙলা যেমন ধানের দেশ, পঞ্জাব যেমন গমের দেশ, দক্ষিণাপথ তেমনি মূখ্যত তুলোর দেশ। এ দেশ সুধু কাপাসের দেশ নয়, শিমুলেরও দেশ। "অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী-তরু"—এ কথাটা সুধু গল্পের কথা নয়। দক্ষিণাপথের তুল্য বিশাল শাল্মলী তরু পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।

এই থেকে দেখতে পাচ্ছ যে ভারতবর্ষ, কি অন্ন কি বস্ত্র, কিছুরই জন্য অপর কোনও দেশের মুখাপেক্ষী নয়। আজকাল কেউ কেউ বাঙলা দেশে কাপাসের চাষ করতে চান। এ চেষ্টা দক্ষিণাপথে ধানের চাষ চালাবার অনুরূপ। এ ইচ্ছা অবশ্য অতি সদিচ্ছা, কিন্তু এ ইচ্ছা জিওগ্রাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সমগ্র ভারতবর্ষকে ঢেলে সাজবার মহৎ বাধা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রকৃতি।

ভারতবর্ষের ঐক্য।

(১)

ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির পরিচয় দিতে হলে বোধহয় এক বৎসর কাল লাগে। আমি আমার বরাদ্দ এক ঘণ্টার ভিতর সে দেশের আকৃতি ও প্রকৃতির মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। তাতে তোমাদের তরুণ জ্ঞানপিপাসা কতদূর মিটেছে বলতে পারি নে। যদি না মিটে থাকে ত আমার বক্তব্য এই যে—যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

এখন এই কথাটি তোমাদের বলতে চাই যে, এই সমগ্র দেশটি এক দেশ। পৃথিবীতে আর যে সব দেশ এক দেশ বলে গণ্য, সে সব ছোট ছোট দেশ। এক মহাচীন ব্যতীত অপর কোথায়ও এত বড় দেশ এক দেশ বলে গণ্য হয় নি।

প্রথমত এ দেশের চতুঃসীমা এ দেশকে যেমন পরিচ্ছিন্ন করেছে, অন্য কোনও দেশকে তেমন করে নি। চীন দেশে এর তুল্য স্বাভাবিক সীমানা নেই, তাই চীনেরা তাদের দেশ প্রাচীর দিয়ে ঘিরতে চেষ্টা করেছিল, পাশাপাশি অন্যান্য দেশ থেকে স্বদেশকে পৃথক করবার জন্য। এ চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

হিমালয়ই হচ্ছে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির সব চাইতে বড় জিনিষ। পৃথিবীর আর কোনও দেশের অত বড় প্রাচীর নেই। তারপর ঐ হিমালয়ই ভারতবর্ষের সত্য সত্য ভাগ্যবিধাতা ও জলবায়ুর নিয়ন্তা। হিমালয়ের জলই হচ্ছে উত্তরাপথের প্রাণ। আর হিমালয়ই সমগ্র ভারতবর্ষের বায়ুর চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। এর ফলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এমন উর্ব্বর, এমন মানুষের বাসোপযোগী দেশ হয়েছে। তারপর ভারতবর্ষের অন্তরে কোনও সমুদ্র কিম্বা হ্রদ নেই, আর তার মধ্যস্থ একমাত্র পর্ব্বতশ্রেণী বিন্ধ্যশ্রেণী এত উচ্চ নয় যে, ভারতবর্ষের উত্তরদক্ষিণকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে। তারপর এই এক দেশ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে এক হিসেবে একে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত সার বলা যেতে পারে।

(২)

ভারতবর্ষ মহাদেশটি অতি সুরক্ষিত দেশ। প্রকৃতি নিজ হাতেই এ দুর্গের পর্ব্বতের প্রাকার ও সাগরের পরিখা গড়ে দিয়েছেন। তবে

এ দেশ এসিয়ার অপরাপর দেশ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের সঙ্গে একেবারে যোগাযোগশূন্য নয়। পূর্ব্বেই বলেছি যে উত্তরাপথের পশ্চিমে দুটি প্রবেশদ্বার আছে—উত্তরে Khyber pass ও দক্ষিণে Bolan pass। অতীতে এই দুই রন্ধ্র দিয়ে ইরাণী তুরাণী শক হুন যবন বাহ্লিক মোগল পাঠান প্রভৃতি জাতিরা এদেশে প্রবেশ করেছে—কিন্তু সহজে নয়। Khyber pass দিয়ে ঢুকলে পাঞ্জাবের পঞ্চ নদ পার হয়ে এসে গঙ্গা-যমুনার দেশে পৌঁছতে হত, আর Bolan pass দিয়ে এলে বিদেশীদের বুকে মরুভূমি ঠেকত।

ভারতবর্ষের অন্তরে প্রবেশ করবার আসল দ্বার হচ্ছে দিল্লি নামক সহর। কারণ যেখানে মরুভূমি ও আরাবলি পর্ব্বত শেষ হয়ে শস্য-শ্যামল সমভূমি আরম্ভ হয়েছে। সেই মিলনস্থানেই মোগল পাঠানরা দিল্লি নগর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর্য্যদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরও এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর দিল্লির উপকণ্ঠেই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান রণক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, পানিপথ এ সবই প্রায় এক জায়গায়। পুরাকালে দিল্লির গেট্ না ভেঙ্গে কোনও বিদেশী জাতি ভারতবর্ষের ভিতর প্রবেশ করতে পারে নি। ফলে যে সকল জাত ও দ্বার খুলতে পারে নি, তারা হয় দেশে ফিরে গিয়েছে, নয় সিন্ধু ও পঞ্চনদ দেশ অধিকার করে বসেছে।

ভারতবর্ষের সমুদ্রকুলেও দুটি চারিটি ছাড়া আর প্রবেশদ্বার ছিল না, আর সে কটি বন্দর দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকুলে; উপরে ভৃগুকচ্ছ ও শূরপারগ এবং নীচে কালিকট ও কোচিন।

এই কটি দ্বার দিয়েই ইউরোপীয় জাতিরা জাহাজে করে সমুদ্র পার হয়ে এদেশে প্রবেশ করেছে। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও

ফরাসীরা এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষে ঢুকেছে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার স্থলপথ এখন বন্ধ। Khyber pass এবং Bolan pass এই দুই দুয়োরই এখন দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত, কিন্তু জলপথ এখন পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তিন দিকে খোলা। এখন ভারতবর্ষের সঙ্গে এসিয়ার যোগ ছিন্ন হয়েছে, তার পরিবর্ত্তে নূতন যোগ স্থাপিত হয়েছে ইউরোপের সঙ্গে; সে যোগ অবশ্য দৈহিক নয়, মানসিক।

(৩)

এই এক ঘণ্টা ধরে তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের যে মোটামুটি বর্ণনা করলুম, সে বর্ণনার ভিতর থেকে তার একটা অঙ্গ বাদ পড়ে গেল। দেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। সুতরাং ভারতবাসীদের কথা বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তবে যে ভারতবর্ষের নানা দেশের নানা জাতীয় লোকের রূপগুণের পরিচয় দিতে চেষ্টা মাত্র করি নি, তার কারণ সে পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। Anthropology নামক বিজ্ঞান আমি জানি নে, আর Anthropology নামক বিজ্ঞানেরও এ বিষয়ে বিশেষ কোনও জ্ঞান নেই। Anthropology এ বিষয়ে সত্য খুঁজছে, কিন্তু আজও তাঁর সাক্ষাৎ পায় নি। আজ এক anthropologist যা বলেন, কাল অপর anthropologist তার খণ্ডন করেন। সুতরাং ও শাস্ত্রের মনগড়া কথা সব তোমাদের শুনিয়ে কোনও লাভ নেই, বরং সে সব কথা শোনায় তোমাদের ক্ষতি আছে। বিজ্ঞানের নাম শুনলেই আমরা অজ্ঞান হই। অর্থাৎ ঐ নামে যে সব কথা চলে,

বয়স্ক লোকদেরই যখন মনের চরিত্র এ হেন, তখন তোমাদের পক্ষে এ-সব অনিশ্চিত বিজ্ঞানের সুনিশ্চিত কথা শোনায় ভয়ের কারণ আছে। তোমাদের মন স্বভাবতঃই বিশ্বাসপ্রবণ। বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দেও, খবরের কাগজের কথাতেও তোমরা বিশ্বাস করো। বুজরুক শব্দটার মানে শুনতে পাই জ্ঞানী। বুজরুক নামক জ্ঞান নিয়েই কাগজ ওয়ালাদের কারবার। আর নিত্য দেখতে পাই যে, সেই সব বুজরুকী কথা তোমাদের নরম মনে এমনি বসে যায় যে, সে সব কথার কালির ছাপ অনেকের মনে চিরজীবন থেকে যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ব অথবা জাতিতত্ত্ব নিয়ে তোমাদের সুস্থ মনকে ব্যস্ত করবার কোনও প্রয়োজন নেই।

ভারতবর্ষের সকল লোক যে এক জাতির লোক নয়, এ সত্য ত সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ। এ দেশে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের রূপের ও বর্ণের ভিতর কতটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেরই চোখে পড়ে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন। আমি পূর্ব্বে তোমাদের বলেছি যে, পৃথিবীর জিওগ্রাফিকাল ভাগ ও পলিটিকাল ভাগ এক নয়। এ দেশের লোক পলিটিকাল হিসেবে এক জাত হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে এক জাত নয়। জিওগ্রাফির ভাগের হিসেবে তাদের জাতেরও স্পষ্ট ভাগ আছে। পলিটিক্সের হিসেবে কাশ্মিরী পণ্ডিত অবশ্য তামিল নাইডুর সহোদর, কিন্তু জিওগ্রাফির হিসেবে এঁরা পরস্পরকে কিছুতেই দেশকা ভাই বলতে পারেন না। আজ আমি তোমাদের কাছে যতদূর সংক্ষেপে পারি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জিওগ্রাফির বর্ণনা করলুম, যারা-

জিওগ্রাফির কথা শোনাব। পুরাকালেও স্ব দেশের জিওগ্রাফি জানবার কৌতূহল লোকের ছিল এবং এ বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন তা তাঁরা লিখে রেখে গিয়েছেন, আর তার থেকেই জানা যায় যে, কালক্রমে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

তোমাদের ভরসা দিচ্ছি যে সে বর্ণনা এ বর্ণনার চাইতে ঢের ছোট হবে, আর আশা করি ঢের বেশী সরস হবে। যে সব দেশের, যে সব সহরের, যে সব পাহাড়ের, যে সব নদীর নাম আমরা রামায়ণ মহাভারতে পড়ি, তারা কোথায় ছিল আর তাদের ভিতর কোনটি স্বনামে না হোক, স্বরূপে বিরাজ করছে, সে সব কথা শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সেকালের ভারতের পরিচয় দিতে কষ্ট করতে হবে আমাকে, কিন্তু শুনতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বংশীধারী।

ভোরের বেলায় বংশীধারী তাঁর মোহন বাঁশীতে ফুঁক দিয়ে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত আলাপ করতে করতে চলেছেন, এক প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে।

বসন্তের এলোমেলো বাতাসে মধুর বংশীধ্বনি দশ দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

বাঁশগাছগুলোর আর সহ্য হলো না। তারা পরস্পরের গায়ে ঠ্যালাঠেলি করে যে সঙ্গীত সৃষ্টি করলে, তা' তাদের নিজের কানেই কর্কশ বলে' মনে হ'ল।

তখন তারা কানাকানি করে বলতে লাগল—একি! আমাদেরই অতি ক্ষুদ্র এক খণ্ড এমন সুন্দর সঙ্গীত করছে, আর আমরা এত প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী হয়েও তার কিছুই করতে পারছি না? এর মানে কি!

বাঁশগুলোর মধ্যে যেটা সবার চেয়ে বিজ্ঞ, সে বল্লে—মূর্খ তোমরা! বাদক না হলে কি বাজে? ডাকো ঐ বংশীধারীকে। ও নিশ্চয়ই আমাদের বাজিয়ে দিয়ে যাবে।

তখন সেই বংশীধারীকে ডাকা' হলো এবং বলা হলো—যখন আমাদের ঐটুকু নিয়ে অমন সুন্দর সঙ্গীত করছ, তখন আমাদের সবটা নিয়ে নিশ্চয়ই তুমি আরও, মধুর ধ্বনি বের করতে পারবে। দেখ—কত বড় আমরা! কত উচ্চ শির আমাদের!

বংশীধারী বল্লেন—তোমাদের কিছুই হবে না। তোমরা বেজায় সংস্কারপুষ্ট হয়ে পড়েছ, আর তোমাদের অন্তরটাকে প্রবৃত্তির মশলায়

বেঙ্গায় নিরেট করে' ফেলেছ। যদি তোমাদের নিয়ে কিছু করতেই হয়, তবে আগে তোমাদের উচ্চ শির নত করে' ফেলতে হবে।

বাঁশগাছগুলো যেন সবাই চম্‌কে উঠ্‌লো। পাতাগুলো সব হাওয়ায় কাঁপতে সুরু করে দিলে। নেহাৎ কোমলপ্রাণ যারা, তাদের চোখ হতে শিশিরের অশ্রুবিন্দু বংশীধারীর অঙ্গে ঝরে' পড়তে লাগ্‌ল।

বংশীধারী তাদের অভয় দিয়ে বল্লেন—বাজতে আর তোমাদের হবে না। তোমরা যেমন আছ তেমনি থাক। সঙ্গীতের সঙ্গতি তোমাদের নেই।

তাদের মধ্যে যে সব চেয়ে সাহসী, সে জিজ্ঞাসা করলে—সে সঙ্গতি কি?

বংশীধারী বল্লেন—দুঃখ। সব প্রথমে তোমাদের কেটে ফেলে উচ্চ শির নত করতে হবে। তারপর যে অংশটুকু ফোঁপ্‌রা, অর্থাৎ প্রবৃত্তির মশলায় নিরেট হয়ে যায় নি—সেইটুকু নিয়ে তার উপরে লোহার শলা পুড়িয়ে স্থানে স্থানে বিঁধ করতে হবে। তবেই তোমাদের ভিতর থেকে আনন্দসঙ্গীত বার হতে পারবে। কিন্তু এত দুঃখ সইতে পারবে কি?

একটা ঝড় উঠ্‌লো। বাঁশগাছগুলো সমস্বরে বলে' উঠ্‌লো—না, না, যাও, যাও তুমি। চাইনা আমরা তোমার আনন্দের সঙ্গীত।

বংশীধারী মুচ্‌কি হেসে বাঁশী বাজাতে বাজাতে আপন মনে নিরুদ্দেশের পথে চলে' গেলেন।

শ্রীপ্রমথ নাথ যশ-চৌধুরী।

কবি সুরেশচন্দ্র

ও

"ঐন্দ্রজালিক।"

A greater era of man's living seems to be in promise. * * * * The reason and observing intellect is a most necessary and serviceable instrument, but an excess of reason or intellectuality does not create an atmosphere favourable to moved vision and the uplifting breath of life; and for all its great stir of progress and discovery, this age, the carnival of industry and science, gives us who are in search of more living, inner and potent things, the impression of a brazen flavour, a heavy air, an inhibition of the greater creative movements, a level spirit of utility and prose. .... The Future Poetry (Aurobindo)

আমাদের দেশের তরুণ গদ্য-কবি সুরেশচন্দ্রের লেখা পড়তে পড়তে উপরোক্ত কথাগুলি বেশি ক'রেই মনে পড়ে—বিশেষতঃ তাঁর নূতন অপরূপ রূপক-কাব্য "ঐন্দ্রজালিকের" ইন্দ্রধনু'র রঙফলানো উপভোগ করতে করতে।

আমাদের দেশের মধ্যে কবি-প্রাণ সুরেশচন্দ্রের মতন প্রতিভাবান্, শক্তিশালী ও চিন্তাশীল লেখকের অভ্যাগমে বাংলার সাহিত্য-জগতে যে যথোচিত সাড়া পড়ে নি, এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। য়ুরোপে এরূপ অনন্যসাধারণ কল্পনাকুশলতা, রঙীণ ভঙ্গী ও স্বতঃ-প্রবাহিত উৎসধারা নিয়ে কোনও লেখক জন্মগ্রহণ করলে, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা, প্রশস্তি, এমন কি ছোটখাটো জীবনীও বা'র হ'য়ে যেত। সুরেশচন্দ্রের চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী কবির ক্ষেত্রে বর্ত্তমান য়ুরোপে এটা ঘটেছে। উদাহরণতঃ ইংলণ্ডের যুগকবি Rupert Brook বা জার্ম্মানের বন্দী-কবি Ernst Toller-এর নাম করা যেতে পারে। এঁদের লেখার সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত তাঁরাই জানেন যে, বর্ত্তমান ইংলণ্ড ও জার্ম্মানিতে এঁদের কতখানি নাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের চতুর্গুণ কবিশক্তি ও সাহিত্যপ্রতিভা নিয়ে জন্মানো সত্বেও বর্ত্তমান সাহিত্যজগতে সুরেশচন্দ্রের দামের গরিমা সম্বন্ধে অতি অল্প লোকেই যথোচিত সচেতন।

বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র যে একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী লেখক ও কবি, এ কথা উপলব্ধি করবার আমাদের সময় এসেছে। তাঁর "ঐন্দ্রজালিকের" ভাব ও ভাষার ইন্দ্রজাল পড়তে পড়তে এ কথাটা বোধহয় মনে বেশি ক'রেই না হ'য়ে পারে না। সুরেশচন্দ্রের "ঐন্দ্রজালিকের" বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় মুগ্ধ হবার সময় মনে হয় যে, ইতিমধ্যেই তাঁর লেখার উচ্ছ্বাসের সুষমা, বর্ণের দ্যুতি ও ভাষার উদ্দাম প্রবাহ অনেকটা সংহত ও মূর্ত্ত হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অরবিন্দের পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী—"মানুষের জীবনে একটা বৃহত্তর যুগের চলা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে।"

বৃহত্তর যুগটি কি?—না মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে বুদ্ধির (intellect) স্থলে সহজানুভূতির (intuition) উত্তরোত্তর প্রভাববৃদ্ধি। এই কথাটি আজ সাধ্যমত একটু বিশদ ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা পাব।

সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে একবার মাত্র আমার দেখা হয়েছিল, সে গত বৎসর পণ্ডিচেরীতে। তখন বাংলার একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে ব'লেছিলেন যে, সে লেখক-টির লেখা বিশুদ্ধ intellectual স্তরের জিনিষ, intuition-এর সঙ্গে তাঁর বড় বিশেষ সম্বন্ধ নেই। সুরেশচন্দ্রের নিজের লেখার প্রেরণা সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করাতে তিনি অকপটভাবে বলেছিলেন যে, সে-সব তাঁর কেমন যেন আপ্‌না থেকেই এসে যায়।

আপ্‌না থেকেই যে এসে যায় এ কথা তাঁর সুসম্বদ্ধ লেখার সঙ্গে যাঁরই পরিচয়লাভের সুযোগ ঘটেছে, তাঁর কাছেই বোধহয় স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে বাধ্য। সুরেশচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর মধ্যে যেন কোথাও ফাঁক নেই, কোথাও অন্যমনস্কতা বা সযত্ন চিন্তাসুমার্জ্জিত পরিচ্ছন্নতা নেই। তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থলে উচ্ছ্বাসের হয়ত একটু বাড়াবাড়ি থাক্‌তে পারে, কিন্তু কৃত্রিমতার আমেজ একেবারেই নেই; তাঁর লেখার মধ্যে হয়ত বর্ণগাঢ়তার একটু বেশি স্ফূর্ত্তি থাক্‌তে পারে, কিন্তু চেষ্টা ক'রে রঙের সুষমা আন্‌বার প্রয়াস নেই; তাঁর নানা রূপকের মধ্যে হয়ত অন্য কোনও কবির ভাষার ও ভাবের সাদৃশ্য বা পুনরুক্তি থাক্‌তে পারে, কিন্তু ভেবেচিন্তে আত্মসাৎ করবার চিহ্নমাত্রও নেই। এক কথায় তাঁর রচনা এক স্বতঃউৎসারিত নির্ঝরের মতনই উচ্ছ্বলিত, যার কলনাদ ধারাসারের অভ্যাগমে হয়ত একটু বেশি উদ্বেল হ'য়ে পড়তে পারে;—কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজের কলতানে

নিজেই আত্মহারা, নিজের গতির ছন্দে নিজেই মাতোয়ারা, নিজের স্বরূপটিকে ফুটিয়ে তোল্‌বার আগ্রহে বাধাবন্ধহারা। দু' একটি উদাহরণ দেব।

"কিন্তু হরিৎ দ্বীপের ব্যাপার উল্‌টো; ক্ষয়বৃদ্ধির চাঞ্চল্যে এর আকাশপাতাল আকুলিত, হাসি-কান্নার হিল্লোলে এর গিরি, কান্তার, উপত্যকা, অধিত্যকা—সব উদ্বেলিত। ঊষার নীলিমায়, সন্ধ্যার রঙিমায় এর জলস্থল রঞ্জিত। দখিনা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে এর বুকে কত কত ফুল মোহন হাসি নিয়ে জেগে ওঠে, আবার উত্তুরে বাতাসের স্পর্শে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধূলোয় ঝ'রে যায়; বসন্তের স্পর্শে এখানে সব শ্যামল হ'য়ে ওঠে, পাখীর কণ্ঠে গান জাগে, অলির পক্ষস্পন্দনে গুঞ্জন তোলে, আবার প্রসূনপল্লব সব স্থবির হ'য়ে ওঠে, পাখীর কণ্ঠ নীরব হ'য়ে যায়, অলির গুঞ্জন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। প্রাণের এখানে হিসেব নেই, তাই মৃত্যু এখানে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু চিরন্তনের বেদনা রেখে যেতে পারে না। হরিৎদ্বীপের একদিনের রিক্ততা আর একদিনের ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভ'রে যায়, আক্ষেপের পাছে পাছে এখানে আনন্দের আয়োজন চল্‌তে থাকে।"

(হরিৎদ্বীপে—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৩২)

অথবা—"এই অনুভবসাধনা মানবজাতির কেন্দ্রগত গোপন রহস্য ব'লে শাস্ত্রবাক্যের চাইতে মানুষের জীবনকাব্য বড় হ'য়ে রইল। মানুষ জীবন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি পাদক্ষেপটি কি করে ফেল্‌বে, শাস্ত্রবাক্য তারই বিধি কঠিন করে' বসে' আছে। কিন্তু জীবনকাব্য হঠাৎ একদিন নবীন ঊষায় পুলক-কম্পিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে—আমি নতুন পথের অনুভব পেয়েছি, নতুন পথের নবীন রাগিণী

আমাকে ডাক দিয়েছে, আমার অন্তরাত্মা স্পর্শ করেছে, সেই স্পর্শ আমাকে সঞ্জীবিত করছে, আনন্দাপ্লুত করছে। ওই পথেই আমাকে চল্‌তে হবে, কারণ ওইখানেই আমার জীবন-অনুভব সত্য হ'য়ে উঠেছে, ওইখানেই আমি সত্য হ'য়ে উঠ্‌ছি। ও পথে কি আছে জানি নে। হয়ত সুখ আছে, দুঃখ আছে, হাসি আছে, অশ্রু আছে, আঘাত আছে, আশীর্ব্বাদ আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে—ওখানে নির্ব্বিঘ্নতা নেই, নিশ্চিন্ততা নেই, প্রতিদিনের পরিচিত সহজ গতিভঙ্গী নেই; কিন্তু ওই সুখদুঃখ হাসি-অশ্রুতে আঘাত-আশীর্ব্বাদে আছে জীবনের উচ্ছ্বসিত রস-ধারা, যা আমার সঞ্জীবনী সুধা। ওর ছন্দ ও স্বর, বর্ণ ও গন্ধ আমার কার্পণ্য দূর করে আমাকে লীলায়িত করবে, অভ্যাসচক্র থেকে মুক্তি দিয়ে আমার মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুল্‌বে, আমার সামর্থ্যকে সাকার করে' তুল্‌বে; তাই শাস্ত্রের অনুশাসন আমার মানবার উপায় নেই। শাস্ত্রবাক্য যেখানে সমাপ্তি টেনে শেষ হয়ে যাবে, মানুষের অনুভব সেখানে আবার নবীন আরম্ভের সুর তুলে নব যাত্রার আয়োজনে জীবনের অন্তরবাহির গতিশীলতার লক্ষ্মীশ্রীতে পূর্ণ করে' তোলে, বৃহৎ করে তোলে, স্বরাট করে' তোলে, যুগে যুগে লোকে লোকে।"

উদ্ধৃত অংশ দুটি একটু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না, প্রধানতঃ দুটি কারণে:—(১) সুরেশ চন্দ্রের লীলায়িত বিশিষ্ট ভঙ্গিমার সঙ্গে অনেক বাঙালী পাঠকই পরিচিত ন'ন বলে, তাঁর ভাষার ও রচনাভঙ্গীর স্বচ্ছ লালিত্যের সঙ্গে তাঁদের একটু সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়া আবশ্যক মনে করি; ও (২) এ দুটি উদ্ধৃতাংশ থেকে সুরেশচন্দ্রের লেখার দুটো দিক্—অর্থাৎ কবিত্বের রঞ্জিতচ্ছটা ও চিন্তাশক্তির গাঢ়তার বড় সুন্দর সমন্বয় মেলে।

সুরেশচন্দ্রের রচনা-ভঙ্গীর উপর দুটি রচনা-ভঙ্গীর প্রভাব বেশ পরিলক্ষিত হয় :—(১) কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ও (২) সুরসিক বীরবলের।

এতে অবশ্য দোষের বিশেষ কিছু নেই। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতি পদে মানুষ যখন অপরের ভাব, ভাষা, চাহনি ও সংস্পর্শের দ্বারা প্রত্যক্ষ লাভ করে থাকে, তখন সাহিত্য-ক্ষেত্রেই বা এরূপ প্রভাব না হবে কেন? কেবল একটা কথা।—সব মঙ্গল প্রভাবই শুভ হয় এক তখন, যখন মানুষ তাকে আত্মসাৎ (assimilate) ক'রে নিয়ে তার দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বকে মহনীয়তর ক'রে তুল্‌তে পারে। এক মাছি-মারা অনুকরণই আক্ষেপজনক—অপরের চিন্তা, লেখা বা সংস্পর্শ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া নয়। অবশ্য অনেক সময়ে দেখা যায় বটে যে, সুধীজনও প্রতিভার দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত হ'য়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যটি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সত্য প্রতিভা বিশ্বের প্রতিকূল ও অনুকূল প্রভাবসমষ্টির কেন্দ্রে বাস করলেও—হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ—তা থেকে যেটুকু লাভ করা যেতে পারে, সেইটুকুই আহরণ ক'রে এক সমৃদ্ধতর বিকাশে গরীয়ান্ হ'য়ে ওঠে। কেননা এই-ই হচ্ছে প্রতিভার সংজ্ঞা বা চরিত্র-লক্ষণ (characteristic)। সুরেশচন্দ্রের "সবুজ কথা"র রচনার সঙ্গে তাঁর আজকালকার রচনার তুলনা করলে এ কথা যথাযথ ভাবে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। বাহুল্যভয়ে তাঁর আগেকার লেখা থেকে উদ্ধৃত ক'রে তাঁর আজকালকার লেখার সঙ্গে তুলনা করতে সাহসী হ'লাম না। কিন্তু যে কেউ তাঁর "বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা," "অবরোধের কথা" প্রভৃতি আগেকার রচনার পাতা একবার উল্‌টে দেখেছেন, তিনিই বোধহয় লক্ষ্য করেছেন যে, সে সব লেখার ধারা রবীন্দ্রনাথের

বাক্যযোজনা-ভঙ্গী ও বীরবলের রসিকতাভঙ্গীর দ্বারা কতখানি প্রভাবিত ছিল। আজও তিনি যে সে প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পেরেছেন তা নয়, কিন্তু তবু তাঁর আজকালকার লেখার মধ্যে তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্যটি যে ক্রমেই বেশি ক'রে ফুটে উঠছে, এ কথা পূর্ব্বোক্ত দুটি উদাহরণ থেকেই যথেষ্ট প্রতীয়মান হতে পার্‌ত। তবে তা সত্ত্বেও যে আমি তাঁর নূতন বই "ঐন্দ্রজালিকের" দু-একটি স্থল থেকে উদ্ধৃত করতে অগ্রসর হচ্ছি, সেটা শুধু এই কথাটিরই উপর জোর দেবার জন্যে যে, সত্য প্রতিভা সব প্রভাবকেই গ্রহণ করে—তা থেকে নিজের মানসলোকের ও অন্তরজগতের সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্যে।

"বছর ঘুরে গেল, আবার ফাল্গুনের সাড়া পড়ল। আমবনের বুকে বসন্তের বাতাস শিহরণ তুল্‌ল। সেই শিহরণে ভিড় ক'রে সব আমের মুকুল জেগে উঠ্‌ল—তারই মিষ্টি গন্ধে দিক্ উদাস, আকাশ উদাস, বাতাস উদাস, মন উদাস। (ঐন্দ্রজালিক)

এইরকম ভঙ্গিমায় পুনরুক্তির মধ্যে একটা সুন্দর ব্যঞ্জনা সুরেশ-চন্দ্র প্রায়ই মূর্ত্ত ক'রে তোলেন। তাঁর "ইরাণী উপকথায়" ও অন্যান্য লেখার সঙ্গে যিনিই পরিচিত, তিনিই এ কথা জানেন। পূর্ব্বোক্ত গল্পটিতে প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এইরকম পুনরুক্তি পাওয়া যায়। এ কেমন?—না, গানে নানা স্বরবিন্যাসের পরে প্রথম পংক্তিতে ফিরে আসা। এর ধ্বনিলালিত্যের পরিচিত সুরটির পুনঃপুনঃ ফিরে ফিরে ভেসে আসার মধ্যে মেলে—অনেকটা ধুয়া বা refrain-এর সুষমা। "ঐন্দ্রজালিক" গল্পটিতে বিশেষ ক'রে এ পুনরুক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রতি পাণিপ্রার্থী আসেন আর বিফল হ'য়ে ফিরে যান, আর রাজকুমারীর মনের কোণে সুর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে :—

মৌন কথায় বাসুক ভাল গোপনে
নেহারি যেন নেহারি তারে স্বপনে।

সুরেশচন্দ্র বর্ণের মাদকতায় মাতোয়ারা হ'য়ে চলেন, কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণোজ্জ্বলতাকে তুলি দিয়ে সযত্নে পরিস্ফুট করবার প্রয়াস পান না। কারণ বর্ণের ঝরনা তাঁর কল্পনাজগতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চলেছে ব'লে চেষ্টা করে সে উৎসের ধারাকে উজ্জ্বল করবার তাঁর দরকার হয় না। যেমন,—

"চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে—সে অশ্রুতে যে মুক্তা গড়ে—সেই মুক্তা দিয়ে গাঁথা আমার মালা—এ মালা আমি ধনীর হাতে দিতে পারি নে—দরিদ্রের ঘরে রাখতে পারি নে—হায়! এ মালা নিয়ে আমি কি করব.........

"চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে—সে অশ্রুতে যে মুক্তা গড়ে—সেই মুক্তা দিয়ে গাঁথা আমার মালা—এ মালা আমি রূপসীর হাতে দিতে পারব না—কুৎসিতার কাছে রাখতে পারব না—হায়! এ মালা নিয়ে আমি কি করব......

"চোখ থেকে যে অশ্রু ঝরে—সে অশ্রুতে যে মুক্তা গড়ে—সেই মুক্তা দিয়ে গাঁথা আমার মালা—হায়! এ মালা নিয়ে আমি কি করব? —এ যে নিজের কাছে রেখে তৃপ্তি পাইনে—পরের হাতে দিয়ে শান্তি পাইনে—হায়! এই আমার মালা—আমার মালা—আমা........."

(বাঁশী ও বেহালা)

পুনরুক্তির এই ঢঙটির প্রেরণা সুরেশচন্দ্র পেয়েছেন অনেকটা আমাদের প্রচলিত রূপকথাদি থেকে, ও বর্ণোজ্জ্বলতার প্রেরণা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। রূপকথার পুনরুক্তির ঢঙকে

কিন্তু তিনি তাঁর কবিত্বের পরশমণিতে মুহূর্ত্তে স্বর্ণবর্ণ ক'রে তুলতে চেয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথের বর্ণাঢ্যতাকে তিনি তাঁর নিজস্ব তরুণ মনের আবেগ দিয়ে একটু বেশি উৎসারিত ক'রে তোল্‌বার প্রয়াস পেয়েছেন। বলা বাহুল্য যে এ উভয় চেষ্টায়ই তিনি সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়েছেন, ও সেটা এই জন্যে যে, তাঁর মধ্যের মৌলিকতাটি এ সব প্রভাবকে যথাযথ ভাবে আত্মসাৎ ক'রে নিতে পেরেছে। নইলে তাঁর লিখনভঙ্গীর মধ্যে জড়তা ও কৃত্রিমতাই বড় হ'য়ে উঠ্‌ত,—যেমন রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের প্রভাবিতদের মধ্যে প্রায় সকলেরই হ'য়ে উঠেছে—এক প্রতিভাবান্ শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে ছাড়া। কারণ শরৎচন্দ্রের নিজস্ব সম্পৎ ছিল। সুরেশচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সুরেশচন্দ্রের ও শরৎচন্দ্রের লেখা যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও মনস্তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটনের ভঙ্গী দিয়ে অনুপ্রাণিত। কিন্তু এঁদের দুজনের ক্ষেত্রেই এ প্রভাবে কিছু যায় আসে নি। কারণ এঁদের দুজনের কারুরই লেখা কবীন্দ্রের অনুকরণ নয়—তাঁর প্রভাব আত্মসাৎ ক'রে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের গরিমায় ফুটে ওঠা মাত্র।

সুরেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে বর্ণাঢ্যতার গরিমাই যেন তাঁর তারুণ্যের গৌরব নিয়ে বেশি ক'রে প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বর্ণতুলিকার সংযমকে তিনি পরিহার ক'রে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছেন এই বর্ণপাতকেই গাঢ়তর ক'রে তুল্‌তে। এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্যটি বিশেষ ক'রে ফুটে উঠেছে। যেমন ঃ—

"প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা গোপন গ্রন্থি আছে, জীবন ভ'রে যার চারপাশে তার সুখদুঃখের পশরা সজ্জিত হ'তে থাকে—যার চারপাশে তার জীবনের আলোছায়া, আশা নিরাশা, অনুরাগ

বিরাগের লুকোচুরি খেলা চল্‌তে থাকে—যে রহস্যগ্রন্থিকে ঘিরে তার জীবনের তপস্যা ও সাধনা মূর্ত্তি হ'য়ে ওঠে।" (পরম আত্মহত্যা দ্রষ্টব্য, ২৮ পৃষ্ঠা)

অথবা—"রাজকুমারীর দেহের উপর দিয়ে ষোলটা বসন্ত ব'য়ে গিয়েছে। ষোল ষোলটা বসন্ত—তারি নিবিড় সোহাগ—সেই সোহাগের স্পর্শ রাজকুমারীর সারা দেহে মাথায়" ইত্যাদি।

(স্বয়ম্বর দ্রষ্টব্য, ৪৯ পৃষ্ঠা)

অথবা—"অপরূপ এক সুন্দরী রূপসী। * * * যেমন গলিত স্বর্ণের রঙ তেম্‌নি রমণীর গায়ের রঙ * * চোখের তারায় কি যেন একটা অনির্ব্বচনীয় ধরা যায় যায় যায়-না" ইত্যাদি

(মৃতসঞ্জীবনী দ্রষ্টব্য, ৭৮ পৃষ্ঠা)

(এ সব অংশ আদ্যন্ত উদ্ধৃত করলেই ভাল হ'ত, কিন্তু স্থানাভাবে তা করতে পারলাম না।)

অনেকের মতে এত বেশি রঙ ফলানোটা আর্টের দিক্ দিয়ে বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁরা বলেন বর্ণতুলিকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সংযমের সঙ্গে, যেহেতু নৈলে মন সহজেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। ওরূপ আপত্তি ভিত্তিহীন না হ'লেও সব ক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে সমর্থনীয়ও নয়। কারণ সব শিল্পের ধারা, গতি বা প্রেরণা একরকম নয়। রবীন্দ্রনাথের জাপানের পত্রে পড়েছিলাম জাপানী চিত্রকলায় ও কাজে সংযমের নাকি বড় বেশি বাড়াবাড়ি। তাদের কবিতা কেমন? না,

"একটি বনস্পতি, দুটি শাখা, বিহগদম্পতি।" বাকি সবটুকু পাঠক কল্পনা ক'রে নেবেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনা সম্বন্ধে যে কথা, কোনও মনোভাব বা নরনারীর রূপবর্ণনা সম্বন্ধেও তাই। অর্থাৎ খুব কম বলা

দরকার, বাকিটুকু ইঙ্গিতে বলা হোক্। এইটেই হচ্ছে সেখানকার কলাসংযমবাদীদের মত।

এরূপ অত্যধিক সংযমে যে আর্টের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনাই পনেরো আনা, এ কথা বোধহয় কেউ জোর ক'রে অস্বীকার করবেন না। উচ্ছ্বাসের মতন সংযমেরও অতিচার (overdoing) সম্ভব, যার ফলে ললিতকলা নিরাভরণা হ'তে হ'তে শেষটায় রিক্ততায় গিয়ে পৌঁছতে পারে। আর্ট পূরোদস্তুর সারল্যও নয়, বাড়াবাড়ি অলঙ্কারাসুরক্তিও নয়। বড় আর্টের মধ্যে সরলতার সঙ্গে বর্ণগৌরব ও শোভার বিচিত্র শ্রীর একটা সহজ সামঞ্জস্য ফুটিয়ে তোলা দরকার।

কথা উঠ্‌তে পারে বাড়াবাড়ি সংযম কাম্য না হ'লেও, সুষ্ঠু সুসমাহিত সংযম মূলতঃ শিল্পকলার একটা প্রধান আনুষঙ্গিক। এর উত্তর এই যে, এরূপভাবে শিল্প মহনীয় হ'তে পারে মেনে নিয়েও বলা যায় যে, এইটেই উচ্চকলার একমাত্র সংজ্ঞা নয়। শিল্পের গতিভেদ আছে, রূপভেদ আছে, বিকাশভেদ আছে, ও প্রেরণাভেদ আছে। কাজেই শিল্পের একটা বাঁধাধরা সংজ্ঞা নেই। শিল্প একটা জীবন্ত স্রোতে ওতঃপ্রোত সুষমামণ্ডিত জগৎ, যেখানে মানুষের কল্পনার আলোছায়া নিত্যনিয়ত নতুন নতুন পুলকশিহরণের খোরাক যোগায়। তাই শিল্পের একমাত্র কষ্টিপাথর এই যে, তাতে হৃদয়ের কোনও গভীর তৃপ্তিরূপ সার্থকতা বা অন্তরের কোনও গভীর আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা মেলে কি না। মানুষের অন্তর্জগত শান্ত নয়, তাই তার আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বেদনা তৃপ্তি অতৃপ্তিও অনন্ত। শিল্পী এই সবের চর্চ্চায় নিত্য নিজের নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় দেন। তাই সংযমের মধ্য দিয়ে বিকশিত শিল্পকলার এক রূপ, আবার

বাধাবন্ধহারা ভাবের নির্ঝরের মধ্য দিয়ে প্রেরণার প্রবাহের আর এক রূপ। দুই-ই মানুষের হৃদয়ের দুটি চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করে। আত্মসমাহিত, সংক্ষিপ্ত, সংযমগম্ভীর আত্মপ্রকাশের সৌন্দর্য্য একরকম; আবার চলার-টানে-মাতোয়ারা লাস্য, আবেগ কলনাদে মুখরিত রসোচ্ছ্বাস ও অন্তরের খচিত ভাবনিচয়ের উদ্দাম অভিব্যক্তির সৌন্দর্য্য অন্যরকম। সুরেশচন্দ্রের প্রাকৃতিক বর্ণনাদি শেষোক্ত শ্রেণীর, শরৎচন্দ্রের গঙ্গার অন্ধকার রূপের ধ্যানমূর্ত্তিপরিকল্পনা বা শ্মশানে নরকঙ্কালের মধ্য দিয়ে আর্দ্র বায়ুর দীর্ঘশ্বাস বর্ণনের ভঙ্গী প্রথমোক্ত শ্রেণীর। দুইয়ের গতিভঙ্গী, বর্ণপাত ও নৃত্যছন্দ বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু। তাই একের মাপকাঠিতে অপরের বিচার সঙ্গত হ'তে পারে না। Wordsworth-এর প্রকৃতিদেবীর রূপবর্ণনার গাঢ় গাম্ভীর্য্য এক শ্রেণীর জিনিষ, আর Keats-এর Ode to a Nightingale বা Shelley-র Prometheus Unbound কাব্যের সঙ্গীত লহরীর উজ্জ্বল উন্মাদনা অন্য শ্রেণীর জিনিষ।

অবশ্য খানিকটা সংযম নিশ্চয়ই দরকার। সাহিত্যে প্রাকৃতিক বা মানসিক আলোছায়ার বর্ণনের অতিচারে যে মনটা অনেক সময়ে অধীর হ'য়ে ওঠে, এ কথা কে না জানে? কিন্তু শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শিল্পী সে সীমা বা সৌষ্ঠবজ্ঞান নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। কারণ এরূপ শ্রেণীর শিল্পকলার প্রকৃতি একটু অনুধাবন ক'রে দেখলে মনে না হয়েই পারে না যে, তার মধ্যে শিল্পী অনেক ভাবোচ্ছ্বাসকেই নিজে থেকেই সংযত করতে কৃতকার্য্য হ'য়ে থাকেন, ও তাই তাঁর রচনা যথার্থ শিল্পকলার মধ্যে অন্যতম ব'লে গণ্য হ'তে পারে। সুরেশচন্দ্রের "মৃতসঞ্জীবনী" ও "রক্তদ্বীপ" কথিকা দুটির সংহত সৌন্দর্য্য পড়লে

বোধহয় এ কথা বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে; বোঝা যায় যে, সৌষ্ঠব জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বা সীমানির্দ্দেশ করতে পারার মূল্য সম্বন্ধে তিনি মোটেই উদাসীন নন। এ দুটি ছোট গল্পের মধ্যে সুরেশচন্দ্র তাঁর বক্তব্যটি যে কি সুন্দরভাবে ব্যক্ত ক'রেছেন, সেটা একটু ভেবে দেখ্‌লে তাঁর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাবান না হ'য়েই পারা যায় না। বাংলার শিল্পানুরাগীদের প্রত্যেককেই আমি বিশেষ ক'রে এ দুটি গল্প একবার প'ড়ে দেখ্‌তে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ "মৃতসঞ্জীবনী" গল্পটি স্থায়ী সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবে ব'লে খুবই মনে হয়। যেমন তার কল্পনা, তেমনি তার বর্ণোজ্জ্বলতা, তেমনি তার ভাবগাম্ভীর্য্য ও তেমনি তার বিদ্যুৎগতি পরিণতি—আগাগোড়া যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। "রক্তদ্বীপ"ও ভাবে, অভিব্যক্তিতে ও ব্যঞ্জনায় চমৎকার; কিন্তু তার ভিতরকার আইডিয়াটি বিশেষ ক'রে অরবিন্দের। তাই প্রতিভার অভিব্যক্তির পূর্ণ গরিমায় বোধহয় 'মৃতসঞ্জীবনী'ই সুরেশ-চন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প। এ গল্পটির ভাব, ভাষা, দ্যুতি ও ব্যঞ্জনা আদ্যন্ত এই উজ্জ্বল অথচ গভীর তৃপ্তিদায়ক কিরণ বিচ্ছুরিত করছে। তাই তার একটি অংশ উদ্ধৃত না ক'রে থাক্‌তে পারলাম না—তাতে প্রবন্ধের কলেবর সমূহ বর্দ্ধিত হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও:—

মৃত্যু বল্‌লে—"তাই ত আমি ছুটে এসেছি।" "—কেন?"

—"বিশ্বমানবকে ঐ মৃতসঞ্জীবনীর অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে।" —"অভিশাপ!"

—"বৃদ্ধ, অনন্তকালের ধারণা করতে পার?" —"অনন্তকাল?"
—"হাঁ, অনন্তকাল। হাজার বছর, লক্ষ বছর, কোটী বছর নয়—অনন্ত—অনন্ত—অনন্তকাল।"

ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে ভুবন দত্ত উত্তর করলেন—"সুন্দরি! সত্য কথা বল্‌তে কি, মনের ধারণাশক্তি অতদূর পৌঁছয় না। যতদূর পর্য্যন্ত ধারণা করা যাক্ না কেন—তবুও যে অনন্ত শেষ হয় না। অনন্তের অনন্ত অংশ তবুও যে তার বাইরেই থেকে যায়।"

মৃত্যু বল্‌লে—"অথচ এই অনন্তকাল ধরে' একটা মানুষের একটানা জীবন—লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বছরের স্মৃতি নিয়ে—মানুষের জীবনে আর বাল্য আস্‌বে না, কৈশোর আস্‌বে না, যৌবন আস্‌বে না—কেবল একটা অপরিবর্ত্তনীয় একটানা সুর—যার বিরতির কোনও আশা নেই, সম্ভাবনা নেই—যা থেকে মুক্তির আর কোন সম্ভাবনাই থাক্‌বে না—বল্‌তে পার মানুষের পক্ষে এ বর হবে, না অভিশাপ হবে? মৃত্যুর পূর্ণচ্ছেদ যাকে আকাঙ্ক্ষার করে' তুলেছে, সমাপ্তিহীনতার দারুণ বোঝা যে তাকে অসহ্য করে' তুল্‌বে। বৃদ্ধ, মৃত্যু অনিবার্য্য বলে' এখন ধারণা করতে পার না যে, মৃত্যু মানুষের কত বড় মুক্তি—মৃত্যু মানুষের কত বড় বন্ধু।"

বৃদ্ধ উত্তর কর্‌লেন—"সুন্দরি! আমার প্রতি অবিচার কোরো না। মৃত্যু মানুষের পরম বন্ধু আমি জানি। কিন্তু কেন? কারণ জরা আছে বলে'। মানুষকে যদি অনন্ত যৌবনের অধিকারী করে তোলা যায়, তবে মৃত্যু-মুক্তির সার্থকতা কোথায় থাক্‌বে?"

একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাসে সুন্দরীর বক্ষ উন্নত হ'য়ে উঠ্‌ল—সেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে' মৃত্যু বল্‌লে—"হায়! মানুষ কি কল্পনার জগতই না সৃষ্টি করে। চিকিৎসক, জান কি অনন্ত যৌবনের অর্থ? ওর অর্থ মানুষের অনন্ত সুখ, অনন্ত দুঃখ। কিন্তু এই অনন্ত সুখ, অনন্ত দুঃখ ভোগের জন্য মানুষের অনন্ত ভোগসামর্থ্য কোথায়?

মানুষের চোখের তারায় যখন এ পৃথিবীর কোন বস্তু কোন দৃশ্যই নতুনের রহস্য নিয়ে প্রতিফলিত হবে না, যখন তার হৃদয়বীণায় কোনও সুরই আর প্রথম প্রায়-স্পর্শের মতো ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌বে না, যখন তার অন্তরের সহস্র আশা আকাঙ্ক্ষার মদিরা নিঃশেষে পীত হ'য়ে যাবে, তখন যে মানুষের অনন্ত যৌবন একটা অনন্ত মরুভূমির মতো হ'য়ে উঠ্‌বে।”

গদ্যকবি সুরেশচন্দ্র ছন্দকাব্যে এখনও বেশি কিছু দেন নি। কিন্তু তবু যা দু-চারটে কবিতা তিনি লিখেছেন, সে-সম্বন্ধে দু-একটি কথা না লিখে থাক্‌তে পারছি নে, কেননা তাঁর এ প্রারম্ভের মধ্যেও একটা সত্যকার কবিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যে কবিশক্তির মধ্যে চক্ষুধাঁধাকর ক্ষণস্থায়ী দ্যোতনা নেই বটে, কিন্তু আছে—সমাহিত সত্যপ্রেরণার অবিসংবাদিত আভাষ, যেটা সত্যসাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। যদিও অদ্যাবধি তাঁর বর্ণযোজনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একটু বেশি হ'য়ে এসেছে ব'লে তাঁর মৌলিক কবিপ্রেরণা তেমন ক'রে স্বয়ম্প্রকাশ হ'তে পারে নি, কিন্তু তবু ইতিমধ্যেই তাঁর মৌলিক গরিমা যে গতিতে প্রকট হ'য়ে উঠেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে গণ্য হবেন, এ কথা খুবই মনে হয়। এ কথাটি বিশদ ক'রে তোলবার 'জন্যে দু একটি কবিতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করব। তাঁর “রমণী” কবিতাটির মধ্যে তিনি এক অপূর্ব্ব সুর বড় মনোজ্ঞ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ—

বিদ্রোহের কণ্ঠে আজি করি অস্বীকার—
নহ নহ নহ তুমি কামকামনার,
হে রমণী! বক্ষ ঘেরা সৌন্দর্য্য নিবিড়,

নহে নহে নহে কভু দুরন্ত ভোগীর
সুপ্ত পশু জাগাইতে; বলয়-নিক্কণ
আজি মোর চক্ষে আনে সুদূর স্বপন,
যেন কোন্ অতি দূর দূর অতীতের
বিস্মৃত সঙ্গীত সনে; আঁধারের ঘের
মোর রুদ্ধ বক্ষ হ'তে, গ্রীবার হেলন,
চূর্ণিত কুন্তল তব, বাহুর দোলন,
নিমেষে খসায়ে নেয়; মোর মর্ম্মতল
অনন্তের গীত শোনে ধরি' তব ছল।
বিদ্রোহের কণ্ঠে তাই করি অস্বীকার—
নহ নহ হে রমণী! কামকামনার।

কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে বড় বেশি, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কবিতাটির মধ্যে যে ভাবের দিক দিয়ে সুরেশচন্দ্রের একটি নিজস্ব সুর আছে, এ কথা বোধহয় সত্যকার রসগ্রাহীর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্তে বাধ্য। তিনি যে ক্রমেই তাঁর কাব্যে এই নিজস্ব সুরটি ফুটিয়ে তুল্ছেন, এই কথাটি সুস্পষ্ট ক'রে তোলবার জন্যে তাঁর আর দু-একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃত ক'রেই এ প্রবন্ধ সমাপন করব। তাঁর "অনুরোধ" কবিতাটিতে কবিবিরহী চিরপ্রণয়ীর চিরন্তন অতৃপ্ত অধীর আকুলতা তিনি বড় সুন্দর ফুটিয়েছেন :—

বালা! হিয়ার আলো জ্বালো জ্বালো বসন্ত ঐ আসে,
সারা জীবন একটীবার একটী নিশার অভিসার একটী দীর্ঘশ্বাসে

একটী সাঁঝের মাদকতা এক নিমেষের আকুলতা
নিবিড় করি ধর আনি পরম বিশ্বাসে ॥
বালা! হিয়ার আলো জ্বালো জ্বালো বসন্ত ঐ আসে।

বালা বালা বালা! গাঁথ মালা বসন্ত ঐ গেল
নাইরে নিমেষ নাইরে সময় আর কি সাজে জয় পরাজয়
ফেল সরম ফেল।
একটী দৃঢ় আলিঙ্গনে গাঢ় সোহাগ সচুম্বনে
একটি চরম দৃষ্টি হানি হৃদ্‌কমলটি মেল,
বালা বালা বালা! গাঁথ মালা বসন্ত ঐ গেল।

এ কবিতাটিতে সুরেশচন্দ্রের নিজস্ব সুরটি যে কত বেশি স্পষ্ট, সেটা দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাঁর সব চেয়ে স্ব-সুরভরা কবিতা এটিও নয়; সেটি বোধহয় গত মাসের প্রবাসীতে অপর্ণা নদীর উদাসকরা, নিবিড় সৌন্দর্য্যভরা কবিতাটি। কবিতাটি আদ্যন্ত উদ্ধৃত করবার লোভ হচ্ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে দুটি পদ মাত্র উদ্ধৃত ক'রেই ক্ষান্ত হ'তে হ'ল :—

কূলের মায়া করিস্ কে রে অকূলে কার নাইরে টান?
এই অকূলেই সত্য যত, বৃহৎ যত মিল্‌বে দান।
একটুখানি আশার ভাষা, একটু কাঁদা, একটু হাসা,
কূলের দেওয়া আঁক্‌ড়ে-ধরা একটা শুধু দিনের প্রাণ।
কূলের মাটি আঁক্‌ড়ে ধ'রে অস্তিমে সুখ মিল্‌বে না,
বাঁধন যদি আঁক্‌ড়ে থাকিস্ খুল্‌বে না তা খুল্‌বে না,
আমার মতো সকল ছাড়ি দীর্ঘ পথের দীর্ঘ পাড়ি
ধর্‌তে হবে, নইলে কভু বাঞ্ছিত রে টল্‌বে না।
(হরিৎদ্বীপে দ্রষ্টব্য)

এই কবিতাটি পড়তে পড়তে বিশেষ ক'রে মনে হয় যে, সুরেশচন্দ্রের কবিতা প্রেরণালব্ধ, লেখার-জন্য-লেখা নয়। কারণ কবিতাটির মধ্যে একটা নিটোল পূর্ণতা বড় অপূর্ব্বভাবে সংহত হ'য়ে এক অপরূপ ঐক্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। তাই মনে হয় যে, যদিও অদ্যাবধি সুরেশচন্দ্র তাঁর কাব্যে নিজেকে ঠিকমত খুঁজে পান নি, তবু ছন্দকাব্যে আত্মোপলব্ধি মেলার দিনও তাঁর সুদূর নয়।

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

সম্পাদকের দরবার।

শ্রীযুক্তা ভারতী সম্পাদিকা মহাশয়া

মাননীয়াসু—

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীর সম্পাদকের দরবারে যে সব প্রশ্ন পেশ করেছেন, সেগুলি ন্যাসনাল কংগ্রেস ও ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসের যুক্ত-দরবারে পেশ করা উচিত ছিল; কারণ প্রশ্ন ক'টিরই জিজ্ঞাস্য হচ্ছে ethicsএর সঙ্গে politicsএর সম্বন্ধ কি?—এ প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব তিনিই দিতে পারেন, যিনি একাধারে চূড়ান্ত পলিটিসিয়ান ও পরম ধার্ম্মিক। কিন্তু পৃথিবীতে যদি এমন কোনও ক্ষণজন্মা পুরুষ থাকেন ত, তাঁকে কোনও প্রশ্ন করা হয় নি; কেননা এক দেহে ও দুই ব্যক্তি বাস করতে পারেন কি না—এই হচ্ছে প্রশ্ন-কর্ত্তার আসল জিজ্ঞাস্য।

এ প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, এ যুগের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা আবিষ্কার করেছেন যে, একই লোকের ভিতর কখনো কখনো দুই ব্যক্তি বাস করে; এমন কি অনেক সময়ে দেখা যায় যে, সে দুটি পরস্পরের বিপরীত। আর এই যুগল-মিলনের ফল কি হয়, এই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পৃথিবীতে moral politics আর political morals ব'লে দুটি আলাদা আলাদা ধর্ম্ম আছে। এর কোন্‌টি কার কাছে গ্রাহ্য হবে,

তা অবশ্য নির্ভর করে তার প্রকৃতির উপর। যে ধর্ম্মপ্রাণ, সে প্রথমটি অবলম্বন করবে, আর যে রাজনীতিপ্রাণ, সে দ্বিতীয়টি অবলম্বন করবে। তবে যার অন্তরে double personality আছে, সে এ দুটোর ভিতর একরকে আর বলে ভুল করতে পারে।

The end justifies the means, এই হচ্ছে political-morals-এর চূড়ান্ত কথা। যেমন "যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়" নিষ্কাম ধর্ম্মের চূড়ান্ত কথা। ফল নিরপেক্ষ হয়ে কর্ম্ম করার অর্থ—end নিরপেক্ষ হয়ে ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। নিষ্কাম ধর্ম্মের এ যদি অর্থ না হয়, তাহলে তার কোনও অর্থ নেই। কারণ জেনেশুনে নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবার মানে ছেলেখেলায় প্রবৃত্ত হওয়া।

যদি প্রশ্নকর্ত্তার আসল জিজ্ঞাস্য এই হয় যে, ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্সের যোগ কি? তাহলে তার উত্তর আমরা কেউ দিতে পারব না। এর কারণ পলিটিক্স আমরা আজও শিখিনি, অপর পক্ষে ধর্ম্ম ভুলে গিয়েছি।

আমরা ভাবি পলিটিক্স মানে মুক্তি, আর ধর্ম্ম মানে বাধা। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, এই বাধার মধ্যেই জন্মায় শক্তি, আর তার থেকে মুক্তি আনে বিশৃঙ্খলা—অর্থাৎ দুর্ব্বলতা। স্ব পদার্থটি বাদ দিয়ে স্বাধীন শব্দের কোনও অর্থ নেই। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আপনার কাগজের মারফতই আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন যে, অতীতের যোগ-উপনিষদে এই "স্ব"র উন্নতি ও মুক্তির নামই স্বরাজ।

সেই সেকেলে স্বরাজের সঙ্গে অবশ্য একেলে স্বরাজের স্পষ্ট যোগ নেই। আর সেই জন্য সেকাল আর একালকে এক হাঁড়িতে চড়িয়ে

আমরা যে খিচুড়ি পাকাই, তা সকলে গলাধঃকরণ করতে পারে না। এ খিচুড়ির নাম meta-politics—অর্থাৎ তা politics'ও নয়, metaphysics'ও নয়, অথচ নামে ও দুইই।

প্রশ্নকর্ত্তা পলিটিক্স সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করেছেন, সে সবই হচ্ছে এই meta-politics সম্বন্ধে প্রশ্ন। আগেই বলেছি ও-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে শুধু ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ফিলজফিক্যাল কংগ্রেস একত্র বসলে ও একমত হলে। চাণক্যকে এবং বুদ্ধদেবকে বগলদাবা করে দুজনের মুখ এক করে দেবার শক্তি আমাদের নেই, আছে শুধু ক্ষণজন্মা পুরুষদের। শুকদেব পরীক্ষিতকে বলেছিলেন যে, যাঁর ঐশ্বর্য্য আছে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতি আছে, তাঁর চরিত্র যেমন অলৌকিক তেমনি অদ্ভুত; ও চরিত্র ভক্তি করবার জিনিষ, অনুকরণ করবার জিনিষ নয়। আমি সেই সঙ্গে বলি যে, ও চরিত্র আমাদের পক্ষে বোঝবার জিনিষও নয়। লৌকিক মন অলৌকিক মনের সাক্ষাৎ পেলে শুধু "হাঁ" করে থাকতে পারে—রা কাড়তে পারে না।

এই সূত্রে প্রশ্নকর্ত্তার আর একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তিনি জান্‌তে চেয়েছেন যে, মহাপুরুষকে দিবারাত্র পথেঘাটে শঙ্খ ঘণ্টা ধূপ দীপ দিয়ে পূজা করলে তাঁর অহমিকা বাড়ে কি না? মহাপুরুষের মনের উপর কোন্ জিনিষের কি ফল হয়, সে কথা বল্‌তে পারেন শুধু মহাপুরুষ। ওরকম ভক্তির বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়িতে যদি অন্যায় কোন কুফল ফলে, তাহলে তার জন্য দায়ী মহাপুরুষের হুজুগে ভক্তরা।

তারপর প্রশ্ন হচ্ছে—স্বদেশপ্রেম কাকে বলে? এর উত্তর, আপনার দেশের প্রতি যে মমতা মানুষের পক্ষে থাকা স্বাভাবিক তাকে। স্বদেশ-

প্রেম ও পলিটিক্স অবশ্য এক জিনিষ নয়। স্বদেশপ্রেমিক সবাই হতে পারে, কিন্তু পলিটিসিয়ান সবাই হতে পারে না। তাই অনেক স্বদেশ প্রেমিক আছে যারা পলিটিসিয়ান নয়, আবার তেমনি অনেক পলিটিসিয়ান আছে যারা স্বদেশপ্রেমিক নয়। স্বদেশপ্রেম হচ্ছে একটা মনোভাব—আর পলিটিক্স হচ্ছে একটা কাজ। কবি ও কর্ম্মীর ভিতর প্রভেদ কি, সে বিষয়ে ত অনেক লেখালিখি হয়েছে; তার থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, কবি স্বদেশপ্রেমিক হতে পারেন, কিন্তু কর্ম্মীই হচ্ছে একমাত্র পলিটিসিয়ান। পৃথিবীতে ও দুই চাই, কারণ পৃথিবী নামক দেশটা আধখানা ভাবের আর আধখানা কাজের দেশ। কথাটা যে ঠিক, তা বোঝাতে গেলে এমন অনেক কথা বল্‌তে হয় যার উপর অনবরত তর্ক চলে। অতএব সে সব বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়।

আমার বিশ্বাস যে-সব জিনিষ নিয়ে প্রশ্নকর্ত্তার মনে খট্‌কা লেগেছে, সে সব আসলে কথার মানে নিয়ে। ধর্ম্ম শব্দের নানারকম মানে হয়, সুতরাং এ কথা দিয়ে নানারকম মানসিক গোলযোগের সৃষ্টি করা যায়। পলিটিক্স কথার অর্থও স্পষ্ট নয়। কারণ পলিটিক্স বল্‌তে আমরা ইকনমিক্সও বুঝি। রাজনীতির উপর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত, অথবা অর্থনীতির উপর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত, তা নিয়ে আজও তর্ক চলেছে। সুতরাং politicsএর সঙ্গে religionএর বিবাহ দেওয়ার অর্থ ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থের অসবর্ণ বিবাহ দেওয়া। এ মিলনের ভিতর কিছু না কিছু বিরোধ থাকবেই থাক্‌বে, কিন্তু তাই বলে কেউ ধর্ম্মচ্যুত অর্থ ও অনর্থক ধর্ম্মের পক্ষপাতী হতে পারেন না।

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেছেন যে, সাত্ত্বিক লোকে পলিটিসিয়ান হতে পারে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, সাত্ত্বিক শব্দের অর্থ

কি ? এ দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, যা তামসিক তাও সাত্ত্বিক নামে চলে যায়। ইতি *

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

---

* ভারতী-পত্রিকার মারফৎ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায় আমাদের পাঁচজনকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, দু চার কথায় তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। এ সব প্রশ্ন দেশের কত লোকের মনে উদয় হয়েছে তা জানি নে, তবে কারও কারও যে হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং আমার মৎ-করাকা উত্তরগুলি কারও কারও অনুমত হতে পারে, এই বিশ্বাসে সেগুলি সবুজপত্রে প্রকাশ করছি। প্রশ্নগুলি গুরুতর, সুতরাং সেগুলির হাল্‌কা ভাবেই জবাব দেওয়া সঙ্গত মনে করেছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শীত।

——::০::——

শূন্য-শাখা, বিশীর্ণ বনানী—
উত্তর বাতাস মূর্ত্ত হুতাশ্বাস,
বলে গেল বিদায়ের বাণী ॥

ভানু ভোলে জগতের হিত ;
ভোরে কুয়াশায় দিগন্ত ভাসায়,
আলোক সুদূরে সমাহিত ॥

মুছে গেছে চন্দ্রমার হাসি,
গোধূলি লগন তিমির মগন,
তারাদল হ'ল পরবাসী ॥

চারিদিক স্তব্ধ হয়ে আসে,
নয়ন শিশির ঝরিছে নিশির,
শ্লথ তনু ঘেরা শ্বেতবাসে ॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ক্ষণিক স্বপন।

এ দেহ মাটির দেহ, ধূলি দিয়ে গড়া,
ধূলির সহিত ধূলি মিশে হবে লয়,
এই বসন্তের হাসি পত্র-পুষ্পে ভরা—
কে জানে হবে না কাল বিস্মৃত-বিস্ময়!
তাই আজ যত পারো ক'রে নাও পান
ধরার অধর-সুরা-সুধা সমুজ্জল,
কাল যদি শেষ হয় জীবনের গান—
তবু মনে হবে জন্ম হয়নি নিষ্ফল।
পরিপুষ্ট দ্রাক্ষাসম দুঃসহ উচ্ছ্বাসে
যৌবন তন্তুর তটে মেলেছে নয়ন,
নিপীড়িয়া নিঙাড়িয়া নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
তারি মধু করি' লহ নিঃশেষে চয়ন।
কুসুমের দল ঝরে বাতাসে বাতাসে,—
জীবন ধরার বুকে 'ক্ষণিক স্বপন।'

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়।

চাবুক।

—— ৹❀৹ ——

চাবুকের চোটে যখনই বন্ধু, পিঠে ফুটে ওঠে রক্ত,
কোন সংশয় থাকে না যে আমি তোমারই পরম ভক্ত।
দারুণ দুঃসময়,—
অশ্রুর আড়ে তোমার উপরে প্রেমসঞ্চারই হয়।
অসংখ্য কাজে ব্যস্ত যে তুমি,—চাবুক রাখিলে তুলি,
কি জানি কোথায় হারাইয়া যায় নাম জপিবার ঝুলি।
এই সবিরাম-ভক্ত পক্ষে অতএব সিদ্ধান্ত—
চাই অবিরাম-ভক্ত হইতে চাবুক অবিশ্রান্ত।
চলুক্ চাবুক, চলুক্ চাবুক, জ্বলুক্ পিঠের ত্বক্;
কবি হ'তাম ত আজই রচিতাম শুভ চাবুকাষ্টক।

দেবতা আছে কি না-আছে, সে কথা জানা নেই কারো ঠিক,
চাবুক-মহিমা না মানে যে জনা, সেই হ'ল নাস্তিক।
নব চাবুকের প্রেম,—
বিদ্যুৎ হেন তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, নমনীয়, মোলায়েম।
অদৃষ্ট হাতে পশ্চাৎ হ'তে পড়িছে তীব্র কশা,
করিছে পৃথক যত বদ্ ত্বক-রক্ত-মাংস-বসা।
হতাশ হ'য়োনা পিঠের বাহিরে দেখিয়া রক্তারক্তি;
হৃদয়ের মূলে বাড়িছে গোকুলে অহেতুকি পরাভক্তি।

আঁখি না মেলেই যে ভাগ্যবান্ পড়ে আলোকের প্রেমে,
তার জগৎ ত স্বপ্নচিত্র,—বাঁধানো ঘুমের ফ্রেমে।
মোর মত হতভাগা চিরজাগা, শতে নিরানব্বই ;
তাদের তরাতে চাব্‌কানো ছাড়া অন্য উপায় কই ?
সোণা পায় উদ্ধার,—
শিখার চাবুকে জ্বলিয়া পুড়িয়া গড়িয়া অলঙ্কার।
ফুলের বরাত খুলে,—
মাল্য রচনে বেছে বেছে যবে চড়ায় সূচীর শূলে।
বেঁচে যায় চন্দন,—
ক্ষয়রোগ বরি, তিলে তিলে মরি, রচি পরপ্রসাধন।
দেখিয়া শুনিয়া মনে প্রায় আর নাই কোন সংশয়,—
চাবুক-সূত্রে তোমার আমার হবে গূঢ় পরিচয়।
বাণে বাণে কার কাটামাথা কবে লভিল পিতার কোল,—
চাবুকে চাবুকে পরম চরমে চলেছি, মিটিছে গোল।

শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

দু'খানি চিঠি।

——:০:——

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে একখানি পত্র লেখেন। সে পত্রের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করা গেল। তার থেকেই পাঠকেরা দেখতে পাবেন যে, দিলীপকুমার উক্ত পত্রে একটি বড় কথা তোলেন। সে কথাটি হচ্ছে এই যে—to be-র সঙ্গে to do-র সম্বন্ধ কি? ভাষান্তরে কৃ-ধাতুর সঙ্গে ভু-ধাতুর যোগাযোগটিই বা কি, আর পার্থক্যই বা কোথায়?—এ বিচার অবশ্য জীবনব্যাকরণের আলোচনা।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র উক্ত পত্রের যে উত্তর দেন, তা পড়ে' রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারকে একখানি চিঠি লেখেন। সে দু'খানি পত্রই আমি বাঙালী সমাজের নিকট ধরে দিচ্ছি এই বিশ্বাসে যে, উক্ত আলোচনা থেকে আমরা আমাদের স্বজাতির মনের একটা ধারার স্পষ্ট পরিচয় পাব। আর কোথায়ও না হোক্, বাঙলা দেশে যে কবি ও কর্ম্মীর মন এক ছাঁচে ঢালাই হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলা দেশে কর্ম্ম শব্দটা একমাত্র তার ইকনমিক অর্থে আজও গ্রাহ্য হয় নি, আর আশা করি কখনই হবে না।

সুভাষচন্দ্রের পত্র ইংরাজি ভাষায় লিখিত। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র সে পত্র সবুজপত্রের জন্য বাঙলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন।

শ্রী প্রমথ চৌধুরী।

সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বন্ধুবর সুভাষচন্দ্রকে আমি যে পত্রটি লিখেছিলাম, তার ভিতরকার কথাটি ধরতে পারলে সবুজপত্রের পাঠকপাঠিকাদের পক্ষে সুভাষ-চন্দ্রের পত্রটির মর্ম্মকথা বোঝাবার সুবিধা হবে ব'লে আমি আমার মোট কথাটি সংক্ষেপে লিখে দেওয়া দরকার মনে করছি। আমি যা ব'লেছিলাম তার সারমর্ম্ম এই :—

দেশের সেবা অর্থে আমরা অনেক সময়ে বুঝি একটা অশ্রান্ত বিবেচনাহীন কর্ম্মসাধনা। দেশের শ্রেষ্ঠ সেবা তখনই হ'য়ে থাকে, যখন মানুষ তার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশের জন্য উন্মুখ হ'তে পারে। অথচ বাহ্যতঃ একাগ্র আত্মবিকাশের সাধনাকে মানুষ অনেক সময়েই স্বার্থকেন্দ্র (ego-centric) ব'লে ভুল ক'রে বসে। এটা হ'য়ে থাকে প্রায়ই আমাদের এই ভুল ধারণাটির দরুণ, যে ইচ্ছা করলে ও প্রাণপণ পরিশ্রম করলেই বুঝি দেশের যথার্থ সেবা একরকম না একরকম করে হ'য়ে থাকে। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি পাতায় এ ধারণার অসত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য মেলে। মানবহিতৈষী দেশভক্ত কর্ম্মী প্রভৃতিরা কত খ্রীষ্ট, গালিলিও, ব্রুণো, জোয়ান অফ আর্ক, লুথারকেই না উৎপীড়ন ক'রেছে। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, তারা উৎপীড়ন ক'রেছে মূলতঃ সেটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভেবেই। তাই মনে হয় যে, সেবাধর্ম্মে সচলতা লাভ করতে গেলেও শুধু দেশের হিত কর্‌ব এইটে জপ করলেই হয় না; কি উপায়ে স্থায়ী দেশ-সেবা হ'তে পারে, তার জন্য সাধনা দরকার, এবং এ সাধনা অনেক সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালেই সব চেয়ে ভাল উদযাপিত হ'তে পারে। তাই একটু তলিয়ে ভেবে দেখ্‌তে গেলে মনের নিহিত লোকে এ

সত্যটি বোধহয় অবিসংবাদিতভাবে স্পস্ট হ'য়ে না উঠেই পারে না যে, দেশের সব চেয়ে বড় সেবা করে সেই বীর, যে দেশের কথা না ভেবে নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে সব চেয়ে বড় একাগ্র সাধনা করবার শক্তি ধরে। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে প্রাণপাত করে বক্তৃতাদি কর্ম্ম করা, বা কলেজ স্কুল হাঁসপাতাল তৈরি করবার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যাওয়াই দেশের সব চেয়ে বড় কাজ নয়। দেশকে বা সমাজকে মানুষ যাই-দান করুক না কেন, সে দান কখনই তার সাধ্যায়ত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হ'তে পারে না, যদি না সে নিজের সর্ব্বোচ্চ বিকাশে যত্নবান হয়। সেবা তখনই সব চেয়ে সত্য হ'য়ে ওঠে, যখন মানুষ নিজেকে সব চেয়ে পূর্ণভাবে পেয়ে সেবায় ব্রতী হয়।

শ্রী দিলীপকুমার রায়।

পত্র (১)

ম্যাণ্ডেলে জেল।

৯।১০।২৫

এ কথা কিছুতেই মনে কোরোনা যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "Greatest good of the greatest number"-এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "good" আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের সকল কাজ হয় "productive", নয় "unproductive"; তবে কোন্ কাজ যে "productive", তা নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে থাকে। আমি কিন্তু কারুকলা বা সে-সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে "unproductive" মনে করিনে, আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে একজন আর্টিষ্ট না হতে পারি—আর সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সে জন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বল, আমি নই। অবশ্য যদি বল যে আর জন্মের কর্ম্মফল এ জন্মে ভোগ করছি, তাহলে আমি নাচার। সে যাই হোক্, এ জন্মে যে আর্টিষ্ট হলুম না তার কারণ, হতে পারলুম না; আর আমার বিশ্বাস, "শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না," এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিষ্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই; আর কোনও কলার সমঝদার হতে গেলে তা'তে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে' এ আক্ষেপ কোরোনা যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্ষপীয়রের কথায় বলতে গেলে "the time is out of joint।" বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা' আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনও সম্ভব? কার্লাইল বলতেন সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্য্যই নেই। এ কথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্য্যে কখনও মহৎ হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্ত-কণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে?

কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে চলবে, আর সেরকম চর্চ্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগীও করে' তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তা'তে আর্ট নিস্তেজ ও খর্ব্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে

আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি যেন কোন্ অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তাহলে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদায় "গম্ভীরা" গানের সৌন্দর্য্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তা'তে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙলার অন্যত্র ওরূপ জিনিষ কোথাও আছে বলে' ত আমি জানিনে; আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নূতন করে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাঙলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাঙলা দেশে লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই,—তার গুণই এই যে তা সহজ, সাধাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk music ও folk dancing একমাত্র এই মালদাতেই এখনও বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও-প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্ম্মা এক আশ্চর্য্য দেশ। খাঁটি দিশী নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদআহ্লাদের খোরাক জোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চ্চা কর ত মন্দ হয় না। সে

সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও প্রচুর আনন্দ দান করবার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তা'তেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্ম্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চ্চা কোন শ্রেণী বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্ম্মায় আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুণ, ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান অনেক বেশী পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হলে এ বিষয় আরও কথা হবে।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক সময়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোটখাটো ঘটনায় মানুষের মহত্ত্ব ঢের বেশী প্রকাশ পায়। দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলাম বলেই তাঁর প্রতি আমার ওরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি, ভালবাসা জন্মেছিল—দেশনেতারূপে তাঁর অনুগামী ছিলাম বলে নয়। তাঁর বেশীর-ভাগ ভক্তেরও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। বস্তুতঃ তাঁর সহকর্ম্মী ও অনুচর ছাড়া তাঁর অন্য কোন পরিজন ছিলনা বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে জেলে আট মাস একসঙ্গে ছিলাম—দু'মাস পাশাপাশি ঘরে, আর ছ'মাস একই ঘরে। এইরূপে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম,—তাইত তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

তুমি অরবিন্দ সম্বন্ধে যা' লিখেছ, তার সবটা না হলেও বেশীর ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আর আমার মনে হয় বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও

তোমার কথায় সায় দিই যে, "নীরব ভাবনা, কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা" সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘকালের জন্যেও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্ম্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে অতিমানুষ হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু'চার জন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশীর-ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম্ম বা লোকহিতই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্ম্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের "double dose"। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছাশক্তি অসাড় যদি না হয়ে যায়, তাহলে নির্জ্জনে ধ্যান যতদিনের জন্যে তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবনা। কিন্তু আমরা যেন "sicklied o'er with the pale cast of thought" না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়ত নিস্তেজকারী সকল প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে,—কিন্তু তার চেলারা? গুরুর সাধন-পদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোন অনিষ্ট করবেনা?

আমি এ কথা সম্পূর্ণ মানি যে, প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমার্সনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গড়ে উঠতে হবে; তা'তে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোন কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত

করবে। শিল্পীর সাধনা কর্ম্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে সাধনা নয়; কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্ত্তের মধ্যে পূরতে আর যেই চা'ক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্ব-মানবের প্রতি অসত্য কেউ হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র জাতির নব-জীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমন ভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্ব্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে; সুতরাং আত্ম-বিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

পত্র (২)

——:•:——

কল্যাণীয়েষু—

তোমার চিঠিখানি কাল পেয়ে বড় খুসি হলুম। সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর—এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞ-দের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না—সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে—সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্ব্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্ত্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাস চালানো যায়, তাহলেই সর্ব্বনাশ ঘটে। ফরমাস তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফরমাস অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিষ তৈরী করতে পারে, তাহলেই আপনিই তার উপরে সর্ব্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে—ভালো জিনিষ এত সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে সে ফুল তো সকলেরই জন্যে, কিন্তু সকলেই তার মর্য্যাদা সমান বোঝে, এ কথা কেমন করে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলে না বলেই কি তাকে

দোষ দেব? বলব, তুমি কুম্‌ড়ো হলে না কেন? বল্‌ব কি, গরীবের দেশে বকুল ফুল ফোটানো বিড়ম্বনা; সব ফুলেরই বেগুণের ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্ত্তব্য? বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক চেয়ে দেখে না, তার জন্যে যুগযুগান্তর ধরেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা করে থাকে, মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সর্ব্বসাধারণদের জন্যেই সফোক্লীস্ এস্কিলাসের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, কেবল বিশিষ্টসাধারণের জন্যে নয়। সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে তারা কোনো গ্রীসীয় দাস্থরায়ের শরণাপন্ন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভালো জিনিষ দিতে থাক্‌লে ক্রমশই তার মন ভালো জিনিষ গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি—তোমার যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্ব্বিচারে রচনা করতে পারো; কবি যদি সফল হয়, তবে সাধারণকে বলব—যে জিনিষ শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো। যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে—বিশিষ্ট সাধারণের পথ্য ও ইতরসাধারণের পথ্য বলে কোনো ভেদ তাদের সাম্‌নে নেই। শেক্‌স্‌পীয়র সর্ব্বসাধারণের কবি বলে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হ্যাম্‌লেট কি সর্ব্বসাধারণের নাটক? কালিদাস কোন্ শ্রেণীর কবি জানিনে, কিন্তু তাঁকে আপামরসাধারণ সকলেই কবি বলে প্রশংসা করে থাকে। জিজ্ঞাসা করি, যদি মেঘদূত গ্রামের দশজনকে ডেকে শোনানো যায়, তাহলে কি সেই অত্যাচার ফৌজদারী দণ্ডবিধির আমলে আস্‌তে পারে না? সর্ব্বসাধারণের মোক্তার যদি কালিদাসের আমলে বিক্রমাদিত্যের

সিংহাসন বেদখল করে কালিদাসকে ফরমাসে বাধ্য করতেন, তাহলে মেঘদূতের জায়গায় যে পদ্যপাঠ তৈরী হত, মহাকাল কি সেটা সহ্য করতেন? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, এ সমস্যার মীমাংসা কি? আমি বলব মেঘদূত গ্রামের দশজনের জন্যেই, কিন্তু যাতে সেই দশ জনে মেঘদূতে নিজের অধিকার উপলব্ধি করতে পারে, তারই দায়িত্ব দশোত্তরবর্গের লোকের। যে দশজন মেঘদূত বোঝে না, তাদের খাতিরে মেঘদূতের বদলে পদ্মভ্রমরের পাঁচালিতে সস্তা অনুপ্রাসের চকমকি ঠোকা কবির দায়িত্ব নয়। কৃত্রিমতা সকল কবি সকল আর্টিস্টের পক্ষেই দূষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম, আর যা বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম, এটা অশ্রদ্ধেয়। সর্ব্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি বলেই রসের নিমন্ত্রণসভায় আমরা বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড় লোক বলি তাদের জন্যেই। শিশুদের আমরা অশ্রদ্ধা করি বলেই শিশুসাহিত্যের রচনা ভার গোঁয়ার সাহিত্যিকদের উপর। তারা ছেলেমানুষীর ন্যাকামি করাকেই ছেলেদের সাহিত্য বলে মনে করে। আমি ছেলেদের শ্রদ্ধা করি, এই জন্যে আমি আমাদের বিদ্যালয়ে যখন ছেলেদের পড়াই, তখন তাদের জন্যে যথার্থ সাহিত্যেরই আয়োজন করি—এমন সাহিত্য যা আমাদের সকলেরই ভোগের জন্য। অবশ্য আমাকে চেষ্টা করতে হয় যাতে শিশুরা এই সাহিত্যের রস বুঝতে পারে। চেষ্টা করে আমি বিফল হয়েছি, তা বলতে পারি নে।

এত কথা তোমাকে বলবার দরকার ছিল না,—বাচালতা ক্রমে বেশি করে অভ্যস্ত হয়ে আসছে বলে বন্ধুসমাজে কথার মাত্রা রাখতে

পারি নে। যাহোক, সুভাষের চিঠিখানি পাঠিয়ে তুমি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছ—সেই কৃতজ্ঞতাবশতই, আমার ডান হাতের তর্জ্জনী এই খানিক আগে ছুরিতে বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও এতখানি লিখে ফেললুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।